মেজর জেনারেল (অব.) এস এস উবান



ফ্যান্টমস অব চিটাগং

দি ফিফ্‌থ আর্মি ইন বাংলাদেশ

ফ্যান্টমস অব চিটাগং ■ মেজর জেনারেল (অব.) এস এস উবান

ঘাসফুল নদী

ফ্যান্টম্‌স্‌ অব চিটাগং

দি “ফিফ্‌থ্‌ আর্মি” ইন বাংলাদেশ

মেজর জেনারেল (অব.) এস এস উবান
পিভিএসএম, এভিএসএম

অনুবাদ
হোসাইন রিদওয়ান আলী খান

ফ্যান্টম্‌স্‌ অব চিটাগং
দি "ফিফ্‌থ্‌ আর্মি" ইন বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০০৫

সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ
অমর একুশে বইমেলা ২০১৪

প্রকাশক
ঘাস ফুল নদী
৮৪ আজিজ সুপার মার্কেট শাহবাগ ঢাকা ১০০০
সেল ফোন ০১৮১৮ ০০ ৯০ ৪৯

প্রচ্ছদ
সাইম রানা

অক্ষর বিন্যাস
রাশেদুল আলম

মুদ্রণ
মৈত্রী এন্টারপ্রাইজ
৩১৭ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (দোতলা) কাটাবন ঢাকা ১০০০
সেল ফোন ০১৭২০ ২৪ ৩২ ৮৪

মূল্য ২৫০ টাকা

Phantoms of Chittagong
The "Fifth Army" in Bangladesh
Ghas Phul Nadi 84 Aziz Super Market Shahbag
Dhaka 1000 Bangladesh
Price: Tk. 250 US $ 10.00
ISBN 984-8215-15-13

অনুবাদকের ভূমিকা

আমি কৃতজ্ঞ আমার মাতা মিসেস হোসনে আরা খান -এর কাছে। নিছক মা বলে নয়। তিনি আমার মধ্যে বিদ্যাশিক্ষায় ও সাহিত্যে আগ্রহ তৈরি করে দিয়েছিলেন সেই যখন আমি খুব ছোট। আমি কৃতজ্ঞ আমার মরহুম পিতা মোহাম্মদ দরবেশ আলী খান -এর কাছে। তিনি উত্তম অনুবাদক ছিলেন এবং তাঁর কাছে সরাসরি অনুবাদের তালিম নিয়েছিলাম। ইংরেজি ভাষাটিতে, যেমন বাংলা ভাষাটিতেও, দখল ও আগ্রহ সৃষ্টিতে তাঁর অনেক অবদান।

আমার স্ত্রী মিসেস কঙ্কা জামিল -এর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর দাপ্তরিক প্রয়োজনে অনেক অনুবাদের কাজ তিনি আমাকে দিয়ে করিয়ে নেওয়াতে আমার অনুবাদ চর্চা হয়েছে। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। শুধু এজন্য নয়। অন্য অনেক কারণেও আমি তার কাছে ঋণী।

ফ্যান্টম্‌স্ অব চিটাগং বইটি আমি স্বেচ্ছায় সাগ্রহে অনুবাদ করিনি। এটা হয়ে ওঠার পিছনে ছিল জনাব মুনীর মোরশেদ -এর দৃঢ় সিদ্ধান্ত, প্রবল ইচ্ছাশক্তি। তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ, তাঁর জন্য সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা।

এই বঙ্গানুবাদের বানান সম্বন্ধে দু -একটি কথা। এতে ইংরেজি Z ('যেড') -এর মতো উচ্চারণ নির্দেশের জন্য বাংলায় 'য' বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, 'জ' নয়। এবং বিদেশি শব্দ বাংলা বর্ণে লিখতে দীর্ঘস্বর নির্দেশের জন্য ঈ, ঊ, ী এবং ূ ব্যবহার করা হয়েছে। অধুনা ভুলে যাওয়া হয়েছে কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি অতীতে বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার উপলক্ষে গঠিত একটি উপসংঘের অন্তর্গত সৈয়দ আলী আহসান, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল-াহ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, জনাব মুহম্মদ ফিরদৌস খান এবং জনাব মুনীর চৌধুরী সহ নয় জন বিশেষজ্ঞ এই রকমই সুপারিশ করেছিলেন। এই অনুবাদে উচ্চারণ অনুসারে কিছু শব্দে 'স' -এর বদলে 'শ' ব্যবহার করা হল। যেমন 'আপশ'। এটাও ওপরে উলি-খিত বিশেষজ্ঞগণের সুপারিশের সাথে সংগতিপূর্ণ। তাঁরা 'ঙ' -এর স্থলে ং ব্যবহারের আর ণ এবং ন -এর স্থলে শুধু ন ব্যবহারের সুপারিশ করেছিলেন যা গৃহীত হলে বাংলা ভাষার জন্য ভাল হত।

বর্ণাঢ্য জীবন ছিল মেজর জেনারেল এস.এস. উবান -এর। *ফ্যান্টম্‌স্ অব চিটাগং* একটি সুলিখিত গ্রন্থ। এটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। গ্রন্থটির অনুবাদক হতে পেরে আমি আনন্দিত। আমার আগে অন্য দুজন, জনাব আসাদ মুকুল ও জনাব শাফি, বইটির অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন কিন্তু সময়ের অভাবে কাজটি সম্পন্ন করতে পারেননি। *ঘাস ফুল নদী* প্রকাশনার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সাধুবাদ।

আমার এ কাজটি পাঠকদের ভাল লাগলে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে যারা আগ্রহী তাদের উপকারে আসলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

হোসাইন রিদওয়ান আলী খান
জানুয়ারি ২০০৫

ঋণ স্বীকার

আমার সাধুতুল্য পিতা-মাতা, যাঁরা এখন স্বর্গধামে আছেন, আমার আচরণ দেখে সুখী হতেন- কিভাবে আমি এই যুদ্ধে এমনকি সর্বাপেক্ষা ঘোরতরো শত্রুদের মধ্যেও সমঝোতা ঘটানোর জন্য কাজ করেছি। তাঁদের কাছে আমার অজস্র ঋণ। আমাকে আরও বেশি গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে আমার মহান স্ত্রী শ্রীমতী যশোবন্ত কাউর -এর কাছে আমার কার্যব্যপদেশে দূরে থাকার কারণে যিনি আমার কাছ থেকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থেকেছেন এবং সে সময় আমার নিরাপত্তা ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন।

আমি কৃতজ্ঞ বিদেশ মন্ত্রকের প্রাক্তন সচিব শ্রী টিএন কাউল -এর প্রতি এবং মেজর জেনারেল ডিকে পালিত -এর প্রতি, তাঁরা আমার পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছেন, উত্তম পরামর্শ দিয়েছেন এবং তা কাজে লেগেছে। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রাক্তন পরিচালক প্রয়াত শ্রী বিএন মলি-কও পাণ্ডুলিপি পাঠ করে মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। সবশেষে আমি ধন্যবাদ জানাই শ্রীমতী হরিন্দর দুর্গাকে যিনি পাণ্ডুলিপির কিছু ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন।

মেজর জেনারেল এস এস উবান

এই বইটি উৎসর্গীকৃত স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার
ফোর্স -এর সেই সব সাহসী অফিসার ও জওয়ানদের প্রতি
যাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে চরম আত্মত্যাগ করেছেন
শুধু চাকরির কর্তব্যের টানে নয় বরং তারও অতিরিক্ত
বিপদের সামনে নিজেদের ঠেলে দিয়ে
এবং এভাবে নিপীড়নের বিরুদ্ধে ও সমগ্র মানবতার
মুক্তির জন্য সংঘটিত যুদ্ধের ইতিহাসের অক্ষয়
পথরেখাকে আলোকিত করে এগিয়ে গিয়েছেন।

সূচি

অধ্যায়—১

বিদ্রোহের পটভূমি

এটা ধরে নেওয়া হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলি নিয়ে পাকিস্তান নামের একটি নতুন জাতি সৃষ্টির ধারণার মূলে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি কিছু ধর্মান্ধ ও ক্ষমতালোভী মুসলমান নেতার ঘৃণা ও অবিশ্বাস। ধরে নেওয়া এই কথাটা শুধুমাত্র আংশিক সত্য হতে পারে।

চূড়ান্ত বিচারে আমাদের সাধারণ মাতৃভূমির বিভাজনটা সংঘটিত হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদেরই উদগ্র ইচ্ছায়, কারণ তারা একটা স্বাধীন হিন্দু ভারতে নিজেদের অর্থনৈতিক বা অন্য কোনও রকমের অবস্থানের সম্ভাবনাই দেখতে পাচ্ছিল না। পক্ষান্তরে তারা নিশ্চিত বোধ করছিল যে মুসলিম পাকিস্তান সবসময়ই তাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে থাকবে কারণ পাকিস্তান হবে ছোট একটি দেশ এবং ফলে তার প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব থাকবে।

ব্রিটিশদের যে দেশগুলি ত্যাগ করে যেতে হয়েছিল সেই সবগুলি দেশে তারা এই একই রকম পন্থা অবলম্বন করেছে। অন্য আরও অনেক দেশের মতো আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র এর একটি আদর্শ উদাহরণ।

সুতরাং স্বার্থান্বেষী দলগুলি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘৃণার এক বিশাল আন্দোলন গড়ে তুলল এবং নিশ্চিত করল গোটা ভারতকে একত্র রাখার কোনও পরিকল্পনাই যাতে ফলপ্রসূ না হতে পারে। ফলে দেশটি ভাগ হয়ে গেল, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে নয় বরং স্রেফ ধর্মের ভিত্তিতে। যে মুসলমানরা আলাদা একটা জাতি হতে যাচ্ছিল তাদের মধ্যে এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যে একই নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার থেকে আসা এবং একই ভাষায় কথা বলে, এবং তাদের ইতিহাস ও ভৌগোলিক এলাকা এক, তা সত্ত্বেও ওভাবে ভাগ হয়ে গেল। ধর্মের উচিত ছিল ঐক্যের শক্তি হিশাবে কাজ করা কিন্তু ধর্ম হয়ে গেল বিভাজনের একমাত্র যুক্তি এবং একমাত্র নিয়ামক শক্তি আর ঐ ব্যবস্থার একমাত্র সুবিধাভোগী সেই তা গ্রহণ করে নিল। পাকিস্তান নামটাই চিরস্থায়ী শত্রুতা চিহ্নিত করল। পাকিস্তান অর্থ "পবিত্রদের (মুসলমানদের) স্থান," মানে দাঁড়াল তারা যাদের বাদ দিল তারা অপবিত্র (নাপাক)। অনেক দেরিতেই এমনকি পাকিস্তানের স্থপতি জনাব এম এ জিন্নাহ্ বুঝতে পেরেছিলেন যে তারা একটা পোকায় কাটা দেশ পেয়েছে এবং ভাগাভাগিটাতে তারা দারুণ ঠকেছে। অন্যদের তুলনায় বেশি ঠকল পাকিস্তানের আসল ভিত্তি পাঞ্জাবি ও বাঙালি মুসলমানরা।

কিন্তু ধর্মান্ধতা তখনকার মতো সবকিছু গ্রাস করে নিল এবং সাম্প্রদায়িক জোশ এক গুরুতরো মোড় নিয়ে নিল। যথেচ্ছ নির্ধারণসাপেক্ষ বিভাজন রেখার দুইপাশেই সাম্প্রদায়িক জনতাকে উদ্দীপিত করা হল সংখ্যালঘুদের হত্যা করতে, যে বিভাজন রেখা তখনও টানা হয়নি। হাজার হাজার নিরপরাধ পুরুষ, নারী ও শিশু কচুকাটা হয়ে গেল, লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে শরণার্থী শিবিরগুলিতে গিয়ে উঠল। এ পর্ব এমন বেদনাদায়ক যা বর্ণনাতীত। লেখক নিজে শত শত হিন্দুর মৃতদেহ পেশাওয়ার ক্যান্টনমেন্ট পুলিশ স্টেশনে এবং মুসলমানদের মৃতদেহ পশ্চিম পাঞ্জাবের রেল লাইনের পাশে পড়ে থাকতে দেখেছেন। এই অভূতপূর্ব মারণযজ্ঞের ফলে এমনকি জওয়াহর লাল নেহরু এবং সরদার প্যাটেলের মতো মানুষ, যাঁরা কখনও জাতীয়তার ধর্মভিত্তিক তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেননি, তাঁরাও দেশ বিভাজনের পক্ষে নমনীয় হয়ে পড়েন।

হিন্দুরা তুলনামূলকভাবে মোটামুটি সর্বত্র সচ্ছল ছিল। তারা যখন পাকিস্তানে তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটা ত্যাগ করে প্রাণ নিয়ে পালাতে বাধ্য হল তখন তাদের সবকিছু লুট করা হল এবং পরনের কাপড় ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু গরিব মুসলমান যাদের অনেক আশা ছিল হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করার, তারা কিছু পায়নি। আগে থেকেই ধনী খানেরা এবং অফিসার শ্রেণি লুটের অধিকাংশ দখল করে নিল। যা অবশিষ্ট ছিল তা ভারত থেকে আগত মুসলমান শরণার্থীদের দেওয়া হল। তারা ছিল প্রধানত কৃষি ও শিল্প শ্রমিক, এবং পাকিস্তান তাদেরকে সিন্ধুর হিন্দুদের জমিতে বসতি করতে দিল। এতে করে সিন্ধুর গরিব কৃষকদের বঞ্চিত করা হল, তাদের ভাগ্যের উন্নতির সম্ভাবনা ফলপ্রসূ হল না।

এটা কেন্দ্রীয় পাকিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত করতে থাকল। সিন্ধি মুসলমানরা ছিল দেশভাগের কুফলের সর্বপ্রথম ভুক্তভোগী। তারা আরও ক্ষতি ভোগ করল যখন পাক সামরিক একনায়কত্ব অনেক সৈনিককে পুনর্বাসিত করল সিন্ধুর উর্বর জমিতে।

একই রকম পাঞ্জাবি আধিপত্য চলল সামরিক বাহিনীতে, পুলিশ ও এমনকি আধা-সামরিক বাহিনীতেও। অনন্যসাধারণ স্বাধীনতার ঐতিহ্যসম্পন্ন বেলুচিস্তানে পাঞ্জাবি সৈন্যদের তাণ্ডব চলল জেনারেল টিক্কা খানের অধীনে, যিনি কুখ্যাতি পেলেন 'বেলুচিস্তানের কসাই' বলে। বেসামরিক জনগণের উপর নির্যাতনের যেসব পদ্ধতি বেলুচিস্তানে পোক্ত করে তোলা হয়েছিল তা পরে ঐ একই জেনারেল টিক্কা খান বাংলাদেশে ব্যবহার করেছিলেন। তার ফল হয়েছিল ভয়াবহ। আর এমনিতেই সমগ্র দেশের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানোর

কারণে সাহসী পাঠানদের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শাসক জান্তার সুনজরে ছিল না। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে স্বাধীনতা-পূর্ব সময়ের ব্রিটিশদের ধামা-ধরার দল শাসক হয়ে বসল পাক মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে এই প্রপাগান্ডায় যে, খান আব্দুল গাফ্ফার খান, ওয়ালি খান এবং খান আব্দুস সামাদ খান -এর মাপের সাবেক স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছিল হিন্দুদের হাতের পুতুল; সুতরাং মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার কাজে যোগ্য নয়।

বাংলাদেশের দুর্গতি

পাকিস্তানে ইসলাম মানে হচ্ছে পাঞ্জাবি মুসলমানদের (এখন পর্যন্ত ঐ জাতির সামরিক শক্তি) এবং অন্যান্য প্রদেশে তাদের মিত্রদের স্বার্থ। পাকিস্তানের অন্য যে কেউ, যে সমমর্যাদার দাবি তোলে, সে হচ্ছে কাফের। এহেন দর্শন আরও অনেক বেশি প্রচণ্ডভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল বাঙালি মুসলমানদের বিরুদ্ধে। তাদেরকে নৃতাত্ত্বিকভাবে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলে বিবেচনা করা হত এবং তাদের আরেকটা দুর্ভাগ্য ছিল এই যে পাকিস্তানে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। বর্তমান বাংলাদেশ যা ছিল পাকিস্তানের পূর্ব অংশ, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ বা তার পরবর্তী সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ করাচি বন্দরনগরী থেকে এক হাজারের বেশি মাইল দূরে ছিল। এই দূরত্ব পার্থক্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।

পাকিস্তানের অংশ হিশাবে খুব সংগত কারণেই বাঙালি মুসলমানদের উচ্চ আশা ছিল তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের। তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের ঐক্যবদ্ধ সত্তা তাদেরকে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা দান করত। তাদের শিক্ষার মান ও বুদ্ধিমত্তাও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় উচ্চে ছিল। তারা তাদের পাট আর চা -এর মাধ্যমে দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ছিল। যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকত তাহলে সবকিছু তাদের অনুকূলে ছিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক যেমন বাংলাদশের বিহারিরা পশ্চিম পাকিস্তানে শুরু করা হিন্দু হত্যা চালিয়ে গেল, এমনকি সেক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় ছাড়িয়ে গেল, প্রমাণ করার জন্য যে তারা পাকিস্তানের সত্যিকার মুসলমান হিশাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তারা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল যে তাদের স্বার্থ পাঞ্জাবিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। পাঞ্জাবিরাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাদের সেনাবাহিনীর মাধ্যমে।

এক আঘাতে পাঞ্জাবি রাজনীতিবিদরা বিচক্ষণ বাঙালিদের বোকা বানিয়ে দিল। উর্দুকে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা ঘোষণা করা হল। ফলে বাঙালি নিজেকে সর্বক্ষণ অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়তে দেখল। বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিভিন্ন শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলার দ্বারা কমানো হল। শাসনতান্ত্রিক ফর্মুলাগুলি সবই ছিল বাঙালিদের অবস্থানকে

সর্বক্ষেত্রে নুইয়ে দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত। অবশ্য এ সবই করা হচ্ছিল ইসলামাবাদের বিশে-ষণ ও উপলব্ধি অনুযায়ী তথাকথিত ইসলামি স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে। আইনি ঝোঁক সম্পন্ন মনের বাঙালি মুসলমানদের সম্পূর্ণ মোহমুক্তি ঘটে গেল। তারা সকল আকারের শাসনতান্ত্রিক পন্থা ব্যবহার করল। কিন্তু দেখল যে তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে।

পাক স্টাইলের গণতন্ত্র

পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক ফীল্ড মার্শাল আয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র বলে এক শাসনতন্ত্র জারি করলেন। সে ব্যবস্থায় ১০ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৮০ হাজার নির্বাচক বিভিন্ন প্রশাসনিক পর্যায়ে পরিষদ গঠনের জন্য ভোট দিতে পারবে। এ ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী সামরিক একনায়কত্ব প্রায় নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশিরা উলঙ্গ সামরিক শক্তির দ্বারা ভীত হয়ে থাকল না। তারা ১৯৬২-তে প্রতিবাদমুখর হল, সাহসের সাথে মোকাবিলা করল দমন-পীড়ন, যা বিশেষ করে পরিচালিত হয়েছিল ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে; কারণ ছাত্রসমাজই বেসামরিক শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সত্যিকারের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে অগ্রগামী ছিল। ১৯৬৫ সনে যখন বিক্ষোভ খুব জোরদার হয়ে উঠল, আয়ুব জনদৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভারতের উপর খেয়ালের বশে এবং বিনা প্ররোচনায় আক্রমণ চালনোর হুকুম দিলেন। দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানিরা এ যুদ্ধে বেধড়ক মার খেল, যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন আরও বেশি উত্তাল হয়ে উঠল। বাংলাদেশিরা আরও লক্ষ করল যে যুদ্ধের সময় তাদের দেশকে প্রতিরোধহীন ফেলে রাখা হয়েছিল, ভারতীয় সেনাবাহিনী সহজেই তা দখল করে নিতে পারত, কেবলমাত্র তাদের সদিচ্ছার কারণেই তারা তা করেনি।

শেখ মুজিবুর রহমান এ অঞ্চলের ছয় দফা দাবি ঘোষণা করলেন যাতে প্রকৃতপক্ষে নৃগোষ্ঠীভিত্তিক এবং অর্থনৈতিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি করা হয়েছিল। তাঁকে ১৯৬৮ সনে বানোয়াট আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হল এবং তাঁর আওয়ামী লীগের হাজার হাজার অনুসারীকে 'বিশ্বাসঘাতক' হিশাবে কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও পুলিশ এক ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলে বাংলাদেশিদের স্বায়ত্বশাসনের দাবি আরও জোরদার হয়ে উঠল। ফজলুল হক মনি, তোফায়েল, আব্দুর রাজ্জাক, সিরাজ এবং রব আন্দোলনকে দারুণভাবে জোরদার করে তুললেন। তাতে করে পাকিস্ত ান সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল ইয়াহিয়া খান -এর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে আয়ুব পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

ইয়াহিয়া খান একেবারে শুরু থেকে জানতেন সামরিক একনায়কত্বের দিন শেষ হয়ে এসেছে। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও সমানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি তোলা

হচ্ছিল। ইয়াহিয়া খান গণভোটের ভিত্তিতে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ১৯৭০ -এর ৭ ডিসেম্বর দেশের উভয় অংশে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে, নির্বাচন অনুষ্ঠানের আদেশ ঘোষণা করলেন। মুজিবের আওয়ামী লীগ স্বায়ত্বশাসনের ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচনি লড়াই -এ নামল এবং ৩০০ সদস্যের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বি-র পূর্ব পাকিস্তান অংশের ১৬২ টি আসনের মধ্যে ১৬০ টি আসনে জয় লাভ করল। পশ্চিম অংশে পাকিস্তানী পিপ্‌লস্‌ পার্টির নেতা যেড. এ. ভুট্টো ১৩৮ আসনের মধ্যে ৮৭ টি আসন অধিকার করলেন। ফল থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে মুজিব হবেন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল অ্যাসেম্বি-তে বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁর স্বায়ত্বশাসনের কর্মসূচিকে অনুমোদন করিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু ইসলামাবাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য ছিল না।

এখানে জনাব যেড. এ. ভুট্টো তাঁর সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করার অভিপ্রায়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিরাট বাধা হিশাবে দেখতে পেলেন। শেখ মুজিব ছিলেন সবসময়ই এক যুক্তরাষ্ট্রীয় পাকিস্তানের পক্ষে যেখানে উভয় অংশ প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপার ছাড়া আর সবক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ভোগ করবে। শেখ তাকে ইসলামিক রিপাবলিক বলারও বিপক্ষে ছিলেন যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ ও আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। অপরপক্ষে ভুট্টো দেখলেন শক্তিশালী কেন্দ্রই তাঁর জন্য সুবিধাজনক এবং যে কোনও প্রতিযোগীকে শায়েস্তা করার মোক্ষম অস্ত্র হিশাবে ইসলামকে পেয়ে গেলেন। মুজিব ছয় দফা থেকে সরে না আসলে ভুট্টো অ্যাসেম্বি- বয়কট করবেন বলে হুমকি দিলেন। অতএব অ্যাসেম্বি- সেশন স্থগিত করা হল। পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না বলে বাঙালির মনে যে বিশ্বাস জন্মেছিল সেটাই আরও দৃঢ় হয়ে গেল। ■

অধ্যায়—২

অগ্নিগিরির উদ্গিরণ

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের উদ্দেশে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। তাতে সম্পূর্ণ সাড়া পাওয়া গেল। শেখ তখন একটা নাগরিক প্রশাসন পরিষদ মনোনীত করে দিলেন। ১ মার্চ ১৯৭১ থেকে তা কাজ শুরু করল।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমান -এর সাথে ব্যক্তিগতভাবে বোঝাপড়া করার উদ্দেশ্যে ঢাকা আসলেন। আলোচনা শুরু হল ১৬ মার্চ ১৯৭১ তারিখে এবং চলল বেশ কিছুদিন। জনাব ভুট্টোও আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য এসে হাজির হলেন। এই বোঝাপড়ার আলোচনার আড়ালে জাহাজভর্তি সৈন্য নামাল চট্টগ্রামে ও চালনায়। তা আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত ৬০ হাজার সৈন্যের দুর্দান্ত বাহিনীকে তা আরও শক্তিশালী করে তুলল। যেই মাত্র সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সৈন্য সমাবেশ ও যথাযথভাবে সৈন্যদের ছড়িয়ে যাওয়া সম্পন্ন হল ঠিক তখনই ১৯৭১ -এর ২৫ মার্চ আলোচনা হঠাৎ করে ভেঙে দেওয়া হল। ইয়াহিয়া খানের বিমানযোগে করাচি ফিরে যাওয়াটা ছিল জেনারেল টিক্কা খানের অধীনে সৈন্যবাহিনীর জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গণআন্দোলন গুড়িয়ে দেওয়ার সংকেত। টিক্কা খান ঠিক এই লাইনেই তালেবর হয়ে ওঠেন বেলুচিস্তানে। বেলুচিস্তানের কসাই কাজটা শুরু করল বিরামহীন ও অনুশোচনাহীন ধর্মান্ধের চরম চণ্ডরূপ নিয়ে। চট্টগ্রামে সৈন্যবাহিনীর সরবরাহ বহনে অস্বীকৃত হাজার হাজার বাঙালি শ্রমিককে ইয়াহিয়ার ঢাকা ত্যাগের একদিন আগেই মেশিনগানের গুলি চালিয়ে শেষ করে দেওয়া হল।

এই পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবর রহমান ২৫ মার্চ ১৯৭১ থেকে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিশাবে ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা দেখলেন না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবকে দেশদ্রোহিতার জন্য অভিযুক্ত করলেন, সামরিক আইন জারি করলেন ও সব রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করলেন।

তাদের শেষ করে দেওয়ার লক্ষ্য ছিল ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শত শত ছাত্র ও অধ্যাপককে গুলি করে মারা হল। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে পাক সেনারা অনেক ছাত্রীকে অপহরণ করল। ১৩ এপ্রিল যশোরের সেন্ট ফ্রান্সিস যেভিয়ার স্কুলের ৩০০ ছাত্রকে লাইন করিয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করা হল। প্যারিশের যাজককেও হত্যা করা হল।

আন্তর্জাতিক মতামত

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস -এর প্রেস করেসপন্ডেন্ট শ্রী মর্ট রোযেনব-ুম এই সময়কালে পূর্ব

পাকিস্তান ভ্রমণ করে রিপোর্ট করলেন যে অত্যন্ত ভয়াবহ পাইকারি হত্যা এবং ঘৃণা সহযোগে এক গৃহযুদ্ধ চলছে। হিশাব করে বলা হয়েছিল যে এই গৃহযুদ্ধের মৃত্যুসংখ্যা ২৫ মার্চ থেকে (১৯৭০ এর) নভেম্বরের এক ভয়াবহ ঘুর্ণিঝড়ের মৃত্যুসংখ্যা ৪ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

এর আগে ব্যাংকক থেকে এক ডেসপ্যাচ -এ শ্রী রোযেনব-ুম লিখেছিলেন– "পেট ভর্তি হওয়ার কারণে শুকুনেরা উড়তে পারছে না। গঙ্গা নদীর পাড় ধরে তারা বসে আছে, ভয়ানকভাবে তৃপ্ত তার, মার্চ থেকে সম্ভবত ৫ লাখের বেশি খুন হওয়া পাকিস্তানিকে খাওয়ার ভাগ্য তাদের হয়েছে।"

লন্ডনের *দি সানডে টেলিগ্রাফ* বলেছিল,–"যাই হোক না কেন পুরনো পাকিস্তান এখন মৃত। শাসকেরা চেষ্টা করছে অস্ত্রের জোরে সত্যকে অস্বীকার করতে কিন্তু সে চেষ্টা দুঃখজনক বোকামি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।"

২ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে *প্রাভদা* বলেছিল–"এই (পাকিস্তানি) আর্মি অ্যাকশনগুলি হচ্ছে চরম বাছবিচারহীন গোঁয়ার্তুমি ও হিংস্রতা যা সোভিয়েত জনগণকে নিদারুণভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।"

দি গার্ডিয়ান (২৭ মার্চ ১৯৭১) বলে–"প্রেসিডেন্টের নেওয়া অবস্থান বাংলার পক্ষে স্বাধীনতার যে ঘোষণা শেখ মুজিব দিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে তাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। বাংলার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অর্থ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ থেকে শুরু হওয়া ভক্তিপূর্ণ ইসলামি ঐতিহ্যের– অবিভক্ত পাকিস্তানের– অযৌক্তিকতা আবার প্রকাশিত হওয়া। আঞ্চলিকতার উত্তেজনা মাঝে মাঝে ফেটে পড়া সত্ত্বেও যে এতদিন (পাকিস্তান) টিকে ছিল সেটাই এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার।"

দি ডেইলি টেলিগ্রাফ (২৭ মার্চ ১৯৭১) বলে– "পরম দুঃখের বিষয় এই যে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে যত ভয়াবহ পন্থায় যা-ই করুক না কেন, একটা স্থিতিশীল টেকসই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা কোনও মতেই সম্ভব হবে না।" পরে পত্রিকাটি ২৯ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বলল– "পশ্চিম পাঞ্জাবের সবগুলি বেয়োনেট বাঙালি জাতীয়তাবাদের জিনকে আর বোতলে ঢোকাতে পারবে না।"

দি গার্ডিয়ান (১৪ এপ্রিল ১৯৭১) বলে– "কাশ্মির ইস্যু আবার এলে জাতিসংঘ নিশ্চয়ই তিক্ত হাসিতে ভেঙে পড়বে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মতো ঐ ইস্যুটিও এখন মৃত।"

২৮ মার্চ ১৯৭১ -এর *দি নিউইয়র্ক টাইমস* রক্তাক্ত দমন নীতির বদলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংযোগের পরামর্শ দেয়।

২৮ মার্চ ১৯৭১ -এর *দি ওয়াশিংটন ইভিনিং স্টার* পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধাবস্থার কথা স্বীকার করে এবং সেখানে এক জনযুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে।

একজন জ্যেষ্ঠ রিপাবলিকান সিনেটর শ্রী উইলিয়াম বি স্যাক্সবি বলেন– "অনেক মানুষের, যারা বেশির ভাগ ছিল নিরস্ত্র, হত্যা ও অঙ্গচ্ছেদের অনেক খবর পেয়েছি এবং তা সত্য এবং সেখানকার (বাংলাদেশ) মনোভাব দমন করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার যে কঠোরতা, তাতে আমি বেদনাহত।" তিনি বেদনাহত হন এজন্যও যে "পাকিস্তানিরা তাদেরকে আত্মরক্ষার্থে ব্যবহারের জন্য দেওয়া আমেরিকান অস্ত্র নিজেদের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে।"

ফরাসি পত্রিকা *ল. অরোরে* (২৮ মার্চ ১৯৭১) বলে– "সেই সাইক্লোনটার সময় থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ আশা করা যেত। সাইক্লোনটা বিশ্বকে এক দুঃখময় উদাহরণের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছিল দেশটার দ্বন্দ্বগুলি।" পত্রিকাটি আরও মনে করে যে হাজার হাজার মানুষকে হয়তো জীবন দিয়ে ১৯৪৭ সালের ভুলের জন্য এবং পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের একগুঁয়েমির জন্য মূল্য দিতে হবে।

সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি পূর্ব বাংলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব তুলে ধরে বলেন যে "আমাদেরই সামরিক সরঞ্জামাদি, আমাদের বন্দুক, ট্যাংক ও উড়োজাহাজ সেখানকার মানুষদের দুর্দশা ঘটাতে সাহায্য করছে এবং এসব করা হচ্ছে আমেরিকান সামরিক সাহায্যের ব্যবহার সংক্রান্ত আপশ -এীমাংসা পূর্বক কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে।"

কুয়ালালামপুরের *দি উহুসান মালয়েশিয়া* বলে– "পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের দোষারোপ করাটা আমরা উপভোগ করি না কিন্তু আমরা পরিষ্কার পর্যবেক্ষণ করেছি যে পূর্ব পাকিস্তান আসলে একটি স্বাধীন দেশের অংশ নয় বরং স্রেফ পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ। আমরা ইয়াহিয়া খানের বর্তমান কার্যব্যবস্থাকে একটা আহম্মকি বলে মনে করি।"

কাঠমান্ডুর *রাইযিং নেপাল* এবং *নিউ হেরাল্ড* বলে, এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে আর আগের অবস্থায় ফেরা যাবে না। হাজার হাজার পূর্ব পাকিস্তানি প্রাণ উৎসর্গ করছে; তার ফলে ভাঙ্গন আসবেই।

টোকিও'র এক বহুল প্রচারিত খবরের কাগজ *মাইনিচি শিম্বুন* বলে–"সামরিক নির্যাতন সমস্যার সমধান করতে পারে না। যে কেউ দেখতে পারবে যে পূর্ব পাকিস্তানের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দারিদ্র্য মুক্তির দাবি বন্দুক আর তলোয়ার দিয়ে ধ্বংস করা যাবে না।"

যাম্বিয়ার লুসাকার *ডেইলি মেইল* বলে–"প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বোঝানো দরকার তিনি যেন না ভাবেন যে বন্দুকের নল থেকে কোনও স্থায়ী সমাধান বেরিয়ে আসবে।"

ইস্তাম্বুলের এক দৈনিক *ইয়েনি গেযেট* -এ কিকমত বিল বলেন–"পাকিস্তান কখনওই

একটি দেশ ছিল না। অনাহুত পশ্চিমি ট্যাংক, পে-ন, হেলিকপ্টার এবং সেনাবাহিনী এখন বাংলায়। এই অনাহুত সেনাবাহিনী পূর্বকে বেঁধে নিজের হাতে রাখার চেষ্টায় আছে। এটা আর কতদিন সম্ভব।"

ইয়েনি ইস্তাম্বুল, গুনায়দি, গুমহুরিয়েত, উলুস–তুরস্কের এই সব পত্রিকা পাকিস্তানের ভাঙনের আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং সামরিক দমন অভিযানের নিন্দা করে।

তেহরানের *কায়হান ইন্টারন্যাশনাল* লেখে–"আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবর রহমান এবং তার প্রধান প্রধান অনুসারীরা আরও এক দফার জন্য কারাগারে গেলেন, মনে হচ্ছে ব্যাপক হারে ভ্রাতৃহত্যার জন্য পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গিয়েছে। এটা স্পষ্ট যে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধান করা যাবে না।"

এমনকি তুর্কি ও ইরানি মিত্রদের মতামতও পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর কোনও কাজ করল না। বিশ্বের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হল।

অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে চীন ছিল গোটা বিশ্বের একমাত্র দেশ যে কিনা পাক বাহিনীর কার্যব্যবস্থাকে সমর্থন করল। ১৪ এপ্রিলে *পিপলস ডেইলি*'র একটি ধারাভাষ্য পিকিং রেডিও থেকে প্রচারিত হল। ধারাভাষ্যটা ছিল জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই -এর পাঠানো একটি বার্তার ওপরে। তাতে বলা হয়–

পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়া খান যে প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। চীনা সরকার ও জনগণ সবসময়ই জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ন্যায্য সংগ্রামে পাকিস্তান সরকারকে জোর সমর্থন দিয়ে যাবে।

তদুপরি চীন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য অভিযুক্ত করে ভারতকে একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠাল।

ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড. কেনেথ বি. কীটিং ১৫ এপ্রিল বোম্বাইতে বললেন–"অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কথাটার অপব্যবহার করা হয়েছে। এটা নিশ্চিত যে এই ঘটনাপ্রবাহকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলা যেতে পারে শুধুমাত্র এই সীমিত পরিসরে যে ঘটনাগুলি ঘটছে পাকিস্তানের মধ্যে।"

ভারতে নিযুক্ত এক প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রী চেস্টার বাইল্‌স্‌ তাঁর সরকারকে বললেন বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহকে এশিয়ার শান্তির প্রতি হুমকি হিশাবে বিবেচনা করার জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক সভা আহ্বান করতে। তিনি খাদ্য ও অষুধের সরবরাহ ছাড়া পাকিস্তানকে আর কোনও প্রকার মার্কিন সাহায্য দেওয়া বন্ধ করার জন্যও বললেন।

বিশ্ব যখন বাংলাদেশ পরিস্থিতি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করছে, তখন হাজার হাজার বাস্তুহারা পুরুষ নারী ও শিশু আন্তর্জাতিক সীমারেখা পেরিয়ে ভারতে এসে জড়ো হচ্ছিল। তারা কিছুই সাথে করে আনছিল না। এমনকি কাপড়চোপড়ও না। তাদের মধ্যে শত শত ছিল অসুস্থ, অনেকে দারুণভাবে আহত ছিল এবং শোকাভিভূত ছিল। তারা এমন ত্রাসের গল্প সাথে করে আনছিল যা ছিল ইতিহাসে অজানা। এ সব ব্যাপার ভারতীয় জনগণের মনে বিশেষত ভারতের বাঙালিদের মনে গভীর ও স্থায়ী দাগ কেটে যাচ্ছিল। লাঞ্ছিত ও বলপূর্বক তাড়িয়ে দেওয়া মানুষদের জন্য সাহায্য দেওয়ার বহু-প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য এখানে কাজ করল এবং নিদারুণ মর্মাঘাতের মধ্যে ভারতীয় জনমত গড়ে উঠল।

ভারতীয় প্রতিক্রিয়া

মার্চ ১৯৭১ -এর সম্পাদকীয়তে *দি টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া* বলল– "ন্যাশনাল অ্যাসেমবি-অধিবেশন শেষ মুহূর্তে স্থগিত করে দেওয়ায় জনাব ভুট্টো শাসনতন্ত্র প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় ভেটো দেওয়ার অধিকার পেয়ে যান। এ আত্মসমর্পণ অতটা জনাব ভুট্টোর হুমকি ও ব-াকমেইলিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে নয় যতটা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের চাপের পরিপ্রেক্ষিতে। ঐ সামরিক আমলাতন্ত্র শেখ মুজিবর রহমানের ছয় দফা কর্মসূচির মধ্যে স্বীয় প্রাধান্যের প্রতি হুমকি দেখতে পায়।"

১৬ মার্চ ১৯৭১ In the Brink of Disaster শিরোনামের এক সম্পাদকীয়তে *দি টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া* লেখে– "কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিজের কাছে দায়বদ্ধতা আছে পূর্ব বাংলার জনগণকে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক যন্ত্রের হত্যাযজ্ঞ থেকে রক্ষা করার সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর। পূর্ব বাংলার জনগণ শুধু চেয়েছে নিজেদের ব্যাপার নিজেদেরই নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার। এখানে বিশেষভাবে গভীর দায়িত্ব আছে দুটি পরাশক্তির। শেখ কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদী নন। তিনি আসলে একজন মধ্যপন্থী। পূর্ব বাংলার জনগণ ও সৈন্যদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ এড়াতে তাঁর চেয়ে বেশি চেষ্টা কেউ করেনি।"

একই পত্রিকা ১৯ মার্চ লেখে–" কিন্তু বিশ্ব কখনও এমন সর্বাত্মক ও শক্তিশালী শান্তিপূর্ণ বিপ-ব দেখেনি যেমন আজ পূর্ব বাংলায় হচ্ছে। শেখের পিছনে সমগ্র জনগণ ঐক্যবদ্ধ। ইতিহাসে এমন আর ঘটেনি যেখানে সকল জ্যেষ্ঠ বিচারক সামরিক গভর্নরকে শপথবাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করেন এবং সিভিল সার্ভেন্টরা স্বেচ্ছায় বিপ-বী নেতার নির্দেশাবলি পালন করেন।"

২৭ মার্চ ১৯৭১ The Unmaking of Pakistan নামের এক সম্পাদকীয়তে *দি হিন্দুস্তান টাইমস* বলে–"ভারত কখনও পাকিস্তানের ভাঙনের ইচ্ছা পোষণ করেনি। কিন্তু ভারত

বাংলার অপর অর্ধেকে অনুষ্ঠিত সামরিক শক্তির দমনপীড়নে নির্বিকার থাকতে পারে না।"

মান্‌কেকার *দি মাদারল্যান্ড* -এ লেখেন–"পাকিস্তান বলতে যা আমরা জেনেছি তা এখন আর নেই। পিন্ডিও ঘটা করেই বলতে পারত যে তার পূর্ব অংশ আর নেই। ইতিহাস জুলফিকার আলী ভুট্টোর ও ইয়াহিয়া খানের নাম লিখবে তেইশ বছরের পুরনো রাষ্ট্রটির ছেদনকারী হিশাবে।" ফ্রাংক মোরএস *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* -এ (৯ এপ্রিল ১৯৭১) এক সম্পাদকীয়তে বললেন–"পূর্ব বাংলায় পাশবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান শুধু একটি আগুনই জ্বালায়নি, তা পাকিস্তানকে যে দ্বিজাতি তত্ত্ব আকাশসমান উচ্চে স্থাপন করেছে তাকেও ফুকে দিয়েছে। পাকিস্তান নিজেকে যে থিওক্রাসির কল্পকাহিনির উপর গড়ে তুলতে চেয়েছে তা ভারত ধ্বংস করেনি। পূর্ব বাংলার স্বধর্মীয়দের পায়ের নিচে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে পাকিস্তান নিজেই সে কল্পকাহিনি বিস্ফোরিত করে দিয়েছে।"

প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি সভাপতি শ্রী এন. জি. গোরেই বলেন (*দি টাইম্‌স্ অব ইন্ডিয়া*, ২৭ মার্চ ১৯৭১)–এহেন প্রকৃতির এক সংঘর্ষ শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্যই বদলাবে না, বরং সমগ্র অঞ্চলেই নৈরাজ্যের বন্যা বইয়ে দেবে যাতে বৈদেশিক শক্তিসমূহের পক্ষে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার সহজ হয়ে যাবে।"

সংসদ সদস্য এবং প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, যে বৈধ এবং সংগতভাবে সংগঠিত বাংলাদেশ সরকারের বৈধতা ইয়াহিয়া খানের চেয়ে বেশিই ছিল।

সর্বোদয় নেতা শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর গতিশীল নেতৃত্বের অধীন ভারতীয় পার্লামেন্ট ৩১ মার্চ ১৯৭১ একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পাশ করে। তাতে বলা হল–

এই সংসদ পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে গভীর বেদনা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাঠানো বাহিনী এক বিপুল আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পূর্ব বাংলার সমগ্র জনগণের ওপর তাদের প্রাণের দাবি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহকে দমন করার অভিপ্রায়ে।

১৯৭০ -এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের নির্বাচনে সন্দেহাতীতভাবে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান করার বদলে পাকিস্তান সরকার গণদাবিকে অবজ্ঞা করার পথ অবলম্বন করেছে।

পাকিস্তান সরকার শুধু আইনত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরেই অস্বীকৃতি জানায়নি, ন্যাশনাল অ্যাসেমবি-কে তার ন্যায়সংগত ও সার্বভৌম ভূমিকা গ্রহণেও বিরত

রেখেছে। পূর্ব বাংলার জনগণকে তারা দমন করতে চাইছে উলঙ্গ শক্তি প্রয়োগ দ্বারা বেয়োনেট, মেশিনগান, ট্যাংক, কামান আর বিমান দ্বারা। ভারতীয় সরকার ও জনগণ সবসময় পাকিস্তানের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক ও ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কের জন্য চেষ্টা করে এসেছে। কিন্তু ভারত যেখানে অবস্থিত আর উপমহাদেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যেভাবে বহু শতাব্দি প্রাচীন ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক বন্ধনে আবদ্ধ তাতে এই সংসদ আমাদের সীমান্তের কাছে যে ভয়াবহ, রক্তাক্ত, বিষাদময় নাটক অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে নির্বিকার থাকতে পারে না। আমাদের দেশের সমগ্র বিস্তার জুড়ে আমাদের জনগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এক নিরস্ত্র ও নির্দোষ জনগণের ওপর অভূতপূর্ব মাত্রায় চালিয়ে যাওয়া নৃশংসতার নিন্দা করছে।

পূর্ব বাংলার জনগণ এক গণতান্ত্রিক জীবনব্যবস্থার জন্য যে সংগ্রাম করে চলেছে তার প্রতি এই সংসদ গভীর সহমর্মিতা ও একাত্মতা প্রকাশ করছে। শান্তির ব্যাপারে ভারতের যে স্থায়ী আগ্রহ আছে এবং আমরা মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ও রক্ষায় যেভাবে সংকল্পবদ্ধ তা মনে রেখে এই সংসদ প্রতিরোধহীন জনগণের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত শক্তিপ্রয়োগ ও ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানাচ্ছে।

জনগণের ওপর প্রণালীবদ্ধভাবে চালিয়ে যাওয়া, যা গণহত্যার শামিল, এই হত্যাকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করায় পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ দিতে জরুরি এবং গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এ সংসদ বিশ্বের সকল জাতি ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

এই সংসদ এই মর্মে গভীর বিশ্বাস প্রকাশ করছে যে, পূর্ব বাংলায় সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। সংসদ তাদেরকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে তাদের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ ভারতীয় জনগণের সর্বাত্মক সহমর্মিতা ও সমর্থন লাভ করবে।

শ্রীমতী গান্ধী সম্পূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়ান। ২৭ মার্চ ১৯৭১ রাজ্যসভায় তিনি বললেন–

"আমরা নির্বাচনের ঘটনাপ্রবাহ সপ্রশংস দৃষ্টিতে লক্ষ করেছি। তা এই আশা জাগ্রত করেছিল যে গোটা দেশটার জন্য একটা নতুন ভবিষ্যতের শুরু হতে যাচ্ছে, এমন ভবিষ্যৎ যা তাদেরকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করবে। কিন্তু তা এক দীর্ঘ কালো পথে, যা গোটা জনগণের জন্য দুর্ভোগ বয়ে নিয়ে এসেছে, এক বিষাদময় পথে ঘুরে গিয়েছে।

এ শুধু আন্দোলন দমন করা নয়। এ হচ্ছে ট্যাংকের সাহায্যে নিরস্ত্র মানুষের মোকাবিলা করা... আমরা পরিস্থিতির প্রতি সম্পূর্ণ জাগ্রত এবং যা ঘটছে ও যা আমাদের করা

দরকার তার সাথে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রেখে যাব।"

বাংলাদেশে পাক সামরিক দমন অভিযানের প্রতিক্রিয়া তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন সরকারকে বুঝিয়ে বলার জন্য এক বিশ্বভ্রমণ শুরু করলেন। শান্তির সপক্ষে তাঁর সেই সমর্থন ছিল শক্তিশালী, কিন্তু কিছু কিছু সরকারের স্বার্থপর সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁকসমূহ ছিল আরও বেশি শক্তিশালী। এ অবস্থায় মানবিক বিবেচনাবলির কোনও স্থান ছিল না। এমন সব উৎস থেকে হুমকি আসতে লাগল যা এরকম প্রতিক্রিয়া দেখাবে বলে আশঙ্কা ছিল সবচেয়ে কম। দিগন্ত অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল। সারা বিশ্বের মুসলমান জাতিগুলি ট্রাজেডিটাকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করছিল। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক একটা-ভাঙতে-বসা মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতি মিথ্যা সহানুভূতিবোধের অজুহাতে তা করছিল এবং অন্যেরা সে ট্রাজেডির দ্বারা অভিভূত হয়েছে মনে হল কিন্তু নিজেদেরই সীমান্তের মধ্যকার ধর্মান্ধদের সেন্টিমেন্টে আঘাত করার ভয়ে সত্য বলার জন্য যথেষ্ট নৈতিক সাহস সঞ্চয় করতে পারছিল না। সাধারণভাবে বিশ্ববিবেক এবং বিশেষ করে মুসলিমবিবেক পরীক্ষার সম্মুখীন হল এবং তা ব্যর্থ হল। প্রতিটি দেশের মধ্যেই এখানে ওখানে উলে-খযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল। তারা হতভাগ্য বাংলাদেশিদের দুঃখজনক দুর্দশায় আহাজারি করছিল, তারা তার মধ্যে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের এবং তার সাথে অবিচ্ছেদ্য মানবিক অধিকারের মৃত্যু দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু তারা মোটেই পাত্তা পাচ্ছিল না।

চীন সুবিধাবাদের স্বার্থে তার বৈপ-বিক ঐতিহ্য জলাঞ্জলি দিল। ঐ দেশটা বাংলাদেশে পাক সামরিক দমন অভিযানকে পুরাপুরি সমর্থন করল। বলল, এটা পাকিস্তানের একটা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এবং তদদ্বারা দেশটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের খোলা দৃষ্টির সামনে উলঙ্গ হয়ে পড়ল, যে মানুষেরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের পক্ষ সমর্থনে চীনের ওপর নির্ভর করত। চীনারা অবশ্য এই অধিকার দিতে অস্বীকার করেছিল নিজেদেরই দেশের এথ্নিক সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীদেরকে, যেমন মোঙ্গলদের, তিব্বতিদের এবং সিংকিয়াং জনগণকে। বিশেষত তিব্বত চীনাদের বিশেষ ক্রোধ আকর্ষণ করেছিল তাদের বিশ্বাসঘাতকতা সারা বিশ্বে উম্মোচিত করে দেওয়ার কারণে। হাজার হাজার অনুসারী সহ দালাই লামা ভারতের কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছিলেন যখন কিনা তাঁকে একটি সম্প্রদায়ের নিছক ধর্মীয় প্রধান হিশাবে কাজ করতে দেওয়া হল না, যে সম্প্রদায় নিজের সমস্ত সময়টা বৌদ্ধ সাহিত্যের ধ্যানে এবং গবেষণায় নিয়োজিত করত। দলে দলে চীনারা তিব্বতকে আক্ষরিক অর্থেই বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল। আধ্যাত্মিক-ঝোঁকসম্পন্ন তিব্বতীয় জাতির আক্রমণকারী চীনা সেনাবাহিনীগুলিকে দেওয়ার মতো বৌদ্ধ সাহিত্য ছাড়া আর ছিল তাদের মন্দিরসমূহ ও তার মূর্তিগুলি যার কিছু ছিল সোনা ও মূল্যবান পাথরে অলংকৃত। মন্দিরগুলি লুণ্ঠন করার পর অপবিত্র করা হয়েছিল।

মূর্তিগুলি ভেঙে মূল্যবান পাথর ও সোনা লুট করে ও যুদ্ধেজেতা মালামাল হিশাবে নেওয়া হয়েছিল।

তারপর এল সামরিক-প্রাধান্যগ্রস্ত পার্টি যন্ত্র যা দারিদ্র্য এবং নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে একটা রেখা টানতে চাইল। যেহেতু তিব্বতীয় সমাজে কোনও পুঁজিপতি ছিল না, মঠগুলির প্রধান লামাদেরকে নতুন সৃষ্ট এই শ্রেণির মধ্যে ফেলা হল। কম্যুনিস্ট দর্শনের ভিত্তি শ্রেণি সংগ্রাম হওয়ায়, শ্রেণি ভেদ যদি না থাকে তো, তা সৃষ্টি করতে হবে "সংগ্রাম"-কে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য, কারণ সেটাই বিপ-বী আদর্শ। তিব্বতের উপজাতীয় সমাজ ১৪ হাজার ফুটের বেশি উচ্চতায়, যেখানে ঘাস ছাড়া আর কিছু গজায় না, প্রকৃতির খেয়ালের সম্মুখীন হতে অভ্যস্ত ছিল, এবার তাদের সম্মুখীন হতে হল বিদেশিদের খামখেয়াল আর অসার কল্পনার। আক্রমণকারী বাহিনীগুলি যাতে স্থানীয়ভাবে সরবরাহ পায় সেইজন্য খাদ্যদ্রব্যের রেশন করা হল, আর সেখানকার গরিব অধিবাসীরা তাদের ইতিহাসের সর্বপ্রথম মানুষের তৈরি দুর্ভিক্ষাবস্থার সম্মুখীন হল। স্থানীয় ভোগের জন্য বণ্টন করা রেশনে জনগণের প্রয়োজনের অর্ধেক মিটল না। তারা বুঝল না কম্যুনিস্ট শাসকদের অধীনে তাদের রেশন কেন এত কমে গেল। চীনা আক্রমণের আগে লোকে প্রচুর রেশন পেত এবং এমনকি সাধারণ কৃষকদের গোলায়ও অনেক বছরের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ভরতি থাকত। তারা বুঝল না চীনারা কেন তাদের ওপর শাসন চালাবে এবং তাদের স্বাধীনতা নির্মমভাবে দমন করবে, যে স্বাধীনতা তারা বহু শতাব্দি ধরে ভোগ করেছে এবং সকল উপজাতীয় জনগণ যাকে মূল্য দিত এমনকি নিজেদের জীবিকার চেয়ে বেশি।

দারিদ্র্য বহুগুণ বেড়ে গেল। ভূমিদাসরা এখন আর মঠগুলির জন্য স্বেচ্ছা শ্রম নয় বরং বিদেশি প্রভুদের জন্য বাধতামূলক শ্রম দিতে লাগল। সত্যিকারের আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে দালাই লামা-কে বন্দি করা হবে এবং কোনও না কোনও অজুহাতে তাকে শেষ করে দেওয়া হবে। এমনকি পাঞ্চেন লামা, যিনি কম্যুনিস্ট পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন, পরে এক অদ্ভুত পরিণতি ভোগ করেছিলেন। এমনকি তিনি কোথায় গেলেন তাও আর জানা যায়নি।

দালাই লামা, যিনি দীর্ঘকালের ঐতিহ্য ও সংবিধান অনুযায়ী সরকারের প্রতীক স্বরূপ, অনুভব কলেন যে বিদেশি কম্যুনিস্ট একনায়কত্বের অধীনে তিনি আর তাঁর জনগণের কল্যাণের ব্যাপার দেখাশোনা করতে পারবেন না। অনেক কষ্টে তিনি পার্শ্ববর্তী ভারতে পলায়ন করতে সক্ষম হলেন– যে ভারতে তাঁর আধ্যাত্মিক বাড়ি (বুদ্ধের নিজ ভূমি)। যখন থেকে চীনা সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী তাঁকে অবিরাম খুঁজে ফিরছিল তখন থেকে বিশ্বের সংবাদ প্রতিনিধিরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিল এই গুরুত্বপূর্ণ পলাতকের

নিরাপদে ভারতে পৌঁছার জন্য। ভারতে পৌঁছে তিব্বতে যা ঘটছিল বলে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন তার বর্ণনা দিলেন। বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে তিনি মধুর ন্যায়পরায়ণতার সাথে বললেন সব কথা। চীনা কম্যুনিস্ট আগ্রাসনকারীদের উদ্ধত স্বেচ্ছাচারী নির্মম আচরণ তিনি ইচ্ছা করেই কমিয়ে বললেন। তিনি এমনকি মাও সেতুঙ -এর প্রশংসা করলেন এবং তিব্বতে কর্মরত চীনা ক্যাডারদের মধ্যে কেবলমাত্র অতি-উৎসাহীদের ওপর দোষারোপ করলেন। তাঁর এই মানবিক আচরণের বিপরীতে চীনা কম্যুনিস্ট সরকার তাঁকে ডাকাত হিশাবে অভিহিত করল এবং এমন ইঙ্গিতও দিল যে সি.আই.এ. -এর সহযোগিতায় তাঁকে অপহরণ করার ব্যাপারে ভারতীয় সরকারের হাত আছে এবং ভারত সরকার তাঁকে বলপূর্বক আটকে রেখেছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ঘটনা-প্রবাহের ব্যাপারে চীনা প্রতিক্রিয়া বুঝতে হবে। পাকিস্তান তার চীনা বন্ধুরা তিব্বতে যা করছিল, বাংলাদেশে তাই করছিল সেটা ছিল একটা অগ্রহণযোগ্য নৃগোষ্ঠীর উপর গণহত্যা। পাকিস্তান এক কদম বেশি অগ্রসর হয়েছিল এবং বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নিছক অস্ত্রের জোরে সংখ্যালঘিষ্ঠতায় নামিয়ে এনেছিল। তারা ভাল করে বুঝেছিল যে শক্তি আসে বন্দুকের নল থেকে এবং সব বন্দুক ছিল পাঞ্জাবিদের হাতে, যারা ছিল সত্যিকারের পাকিস্তানি। সিন্ধি, বেলুচ ও পাঠানদের কিছু বলার অধিকার ছিল না। বাংলাদেশের অবস্থা ছিল প্রায় ঠিক তিব্বতের মতো।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের দমনপীড়নকে সমর্থন করে চীনা কম্যুনিস্টরা মানুষের চোখে নতুন পোশাকে সাম্রাজ্যবাদী হঠকারী জুয়াড়ি রূপে দেখা দিল এবং অনেক কাল যাবৎ তাদের ঐভাবেই প্রতিভাত হতে হবে। ■

অধ্যায়–৩

বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধারা

শেখ মুজিবুর রহমান বিপুল আত্মত্যাগের দ্বারা সকল বাংলাদেশির হৃদয়ে একটা স্থান অধিকার করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের মুকুটহীন রাজা এবং তারা তাঁর জন্য তাদের ভালবাসা প্রকাশ করেছিলেন নিশ্চিতভাবে– প্রথমত তাঁর সব মনোনীত ব্যক্তিকে ন্যাশনাল অ্যাসেমবি-তে নির্বাচিত করার মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত সামরিক আইনের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক মনোনীত সামরিক গভর্নরের শপথ পাঠ করানোয় সকল বিচারকের অস্বীকৃতি জানানোর দ্বারা এবং তৃতীয়ত সকল সিভিল সার্ভেন্ট কর্তৃক শুধুমাত্র তাঁর আদেশ পালনের সিদ্ধান্ত দ্বারা। তারা সবাই তাঁকে একবাক্যে 'বঙ্গবন্ধু' বলে ঘোষণা করেছিল।

শেখ সাহেব সামরিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা তাঁর নিজ বাসভবন থেকে গ্রেফতার হলেন। সেখানেই তাঁর বৈঠকখানায় সর্বপ্রথম মেশিনগান গর্জে ওঠে। তিনি তাঁর অননুকরণীয় শক্তিশালী কণ্ঠে গর্জন করে সামরিক ব্যক্তিদের বললেন গোলাগুলি খরচ না করে তাঁকে এসে গ্রেফতার করতে, যার জন্য তিনি প্রস্তুত। এখানেই নিশ্চয়ই সবকিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি কারণ পাক সৈন্যরা এমন সব লক্ষণই দেখিয়েছিল যে তারা তাঁকে হত্যা করতেই এসেছিল, যিনি কিনা বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষিত হয়েছিলেন। অজস্র গুলিবর্ষণের মধ্যে তাঁর বের হয়ে আসার সাহস দেখে তারা মনে হয় সংকুচিত হয়ে পড়েছিল, হত্যার বদলে তাঁকে গ্রেফতার করা ছাড়া গত্যন্তর দেখতে পায়নি, কারণ তিনি অস্ত্রধারী ছিলেন না, তাঁর পালানোর বা কোনও সশস্ত্র প্রতিরোধের কোনও ইচ্ছা ছিল না। যখন তিনি গ্রেফতারের জন্য নিজেকে সোপর্দ করলেন তখন তারা হতচকিত হয়ে গেল, তাঁর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে সোজাসুজি হত্যা করার মতো কোনও অজুহাত তাদের থাকল না। তাঁর নিকটতম সহকর্মী শেখ সাহেবকে পালিয়ে যাওয়ার ও বাংলাদেশের বাইরে কোনও নিরাপদ ঘাঁটিতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। তবে জনগণের জন্য তাঁর ভালবাসা এত গভীর ছিল যে তিনি বলেছিলেন তাঁর জনগণকে ভয়াবহতম বিপদের মধ্যে রেখে তিনি পালাবেন না এবং তাদের সঙ্গে একই পরিণতি তিনি ভোগ করবেন। তাঁকে যে পশ্চিম পাকিস্তানে উড়িয়ে নিয়ে জেলে রাখা হবে এবং স্বদেশি মানুষদের ওপর যা করা হচ্ছে তার কিছুই যে তিনি জানতে পারবেন না সে সম্বন্ধে তিনি খুব কমই ধারণা করতে পেরেছিলেন।

তাঁর গ্রেফতার সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা গিয়েছে যুদ্ধ-শেষের আগে নয়। তখন পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি তাঁর ভবিষ্যৎ কী হতে যাচ্ছে বা তিনি কোথায় আছেন। গুজব ছিল যে

তিনি ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন। যুবকরা ক্রুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠল। তাঁর বোনপো শেখ ফজলুল হক মনি এবং তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম, আব্দুর রাজ্জাক, রব প্রমুখ যুবনেতা এবং আরও অনেক জানা-অজানা শত শত নেতা সীমান্ত পাড়ি দিলেন এবং এমন কারও খোঁজ করলেন যারা পাক সামরিক বাহিনীগুলিকে বের করে দেওয়ার জন্য তাঁদের সশস্ত্র বিদ্রোহে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করতে হাত বাড়িয়ে দেবে।

বেঙ্গল রাইফেল্‌স্ (বাঙালিদের দ্বারা গঠিত পাক সামরিক ইউনিটসমূহ) বিদ্রোহ করল এবং কিছু ক্ষেত্রে বলা হল যে তারা তাদের পাঞ্জাবি অফিসারদেরকে হত্যাও করেছে। এদের কিছু জওয়ান বাঙালি নেতৃত্বে গোলাগুলি শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে গেল এবং শেষে ভারতে পাড়ি দিল। মেজর জিয়া বলে একজন নিজেকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান বলে অভিহিত করলেন এবং ২৮ মার্চ ১৯৭১ তারিখে মুক্ত বাংলা রেডিও থেকে একটি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠনের ঘোষণা করলেন। তিনি নির্দিষ্টভাবে বললেন যে সরকার চলবে শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় যিনি মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব দিচ্ছেন চট্টগ্রামে গোপন সদর দফতর থেকে। পরে আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম করা হল সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিশাবে। প্রধানমন্ত্রী হলেন জনাব তাজউদ্দিন এবং খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব কামরুজ্জামান ও জনাব মনসুর আলী হলেন অন্যান্য মন্ত্রী। এই অস্থায়ী সরকার মুজিবনগর থেকে কাজ করতে লাগল। এতে কিছু মেধাবী লোক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা গোড়াতে ভয়ঙ্কর ঘটনাপ্রবাহের দ্বারা হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু ধীরে ধীরে যুবকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছিলেন, যে যুবকরা কিনা পুরানো অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র সংঘাতের আকাঙ্ক্ষার তাড়ানায় অস্থির ছিল। আমি পরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। দেখেছিলাম তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যাপারে গুণমুগ্ধ ও সশ্রদ্ধ ছিলেন।

তিনি আমাকে বলেছিলেন যে এমনকি শেখ যদি বাংলাদেশের ধার্মিক লোকদের বলতেন যে 'খোদা নেই' তাহলে তাও তারা বিশ্বাস করত। তিনি আরও বলেছিলেন যে স্বাধীনতা ও মুজিবের মুক্তির মধ্যে একটা বেছে নিতে হলে জনগণ স্বাধীনতা ছেড়ে খুশি মনে শেখের মুক্তিকে গ্রহণ করত। তার এসব কথা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে গিয়েছিল। অবশ্য, একজন পরিপক্ক রাজনীতিবিদ হিশাবে তিনি গরম -এাথার যুবনেতাদের উৎসাহে কিছু বাদ সাধেন। সেজন্য তাদের মধ্যে কতক নেতা তাঁকে অপছন্দ করতেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে বেশ কতগুলি উপলক্ষে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি এমন ধারণা দিলেন যে তিনি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সর্বাপেক্ষা একনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি তখন অস্থায়ী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি। যদিও তাঁরই

হওয়ার কথা অস্থায়ী সরকারের প্রধান, তবু তিনি কিন্তু পুরোভাগে ছিলেন না। তাজউদ্দীন সাহেবকেই মনে হত ক্ষমতায় আছেন এবং সব সমস্যার দেখাশুনা করছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামের একমাত্র ছেলে আশরাফ একটা ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল, তাকে আমার মনে হয়েছিল একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক (তার বয়স ছিল বড় জোর ১৮) যার আছে জ্বলন্ত দেশপ্রেম। তার এমনকি বাবা -এাকে দেখতে আসারও অবকাশ ছিল না। তার বাবা -এা তার এই পরম আত্মত্যাগকে মেনে নিয়েছিলেন।

মুক্তিবাহিনী

কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ, এবং সে সূত্রে সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধান। অস্থায়ী সরকারকে তিনি বাংলাদেশে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের মোতায়েনের ব্যাপার ছাড়াও প্রশিক্ষণের সকল ব্যবস্থার ব্যাপারেও পরামর্শ দিতেন। পরে, যখন ভারত সরকার প্রশিক্ষণে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন কর্নেল ওসমানী পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জিওসি-ইন সি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জে. এস. অরোরার সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন এবং প্রশিক্ষণ শিবিরগুলির তদারকি করতেন। তিনি তাঁর পদের মর্যাদা বজায় রাখতেন এবং তাঁর একজন ভারি সতর্ক এবং চৌকষ এইড-ডি-ক্যাম্প ছিলেন। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের পাক আর্মি থেকে পালিয়ে আসা একজন বাঙালি ক্যাপ্টেন। তিনি মহাবিপদের মধ্য দিয়ে ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছাক্রমে প্রশিক্ষণ নিতে এগিয়ে এসেছিলেন অবিলম্বে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারার লক্ষ্যে।

কর্নেল ওসমানী ভারতীয় সামরিক পরিমণ্ডলে অনুকূল ধারণার সৃষ্টি করেছিলেন; তাঁর উচ্চ দেশপ্রেম বোধ, শেখ মুজিবের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং সমগ্রের প্রতি ও খণ্ড খণ্ড অবস্থার প্রতি তার সঠিক মনোভাবের কারণে। আমি তাঁর অসম্পূর্ণ আসবাবপত্র সংবলিত অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে চা খেতে খেতে কথা বলেছিলাম। তাঁর চৌকষ এডিসি, যাঁর কিছু প্রাথমিক প্রশিক্ষণ হয়েছিল আমাদের সঙ্গে, আমাকে চিনতেন এবং আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। আমরা অপ্রচলিত যুদ্ধের যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলাম, কর্নেল ওসমানী তার ভূয়সী প্রশংসা করলেন। মুক্তির পরে ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া এক পার্টিতে। কর্নেল ওসমানী তখন আর্মি চীফ, বাংলাদেশ আর্মির পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চালাচ্ছেন এবং পাকিস্তান থেকে আরও বাঙালি জ্যেষ্ঠ অফিসারের ফেরত আসার অপেক্ষায় আছেন।

হাজার হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, যার মধ্যে বেঙ্গল রাইফেল্‌স্ -এর মতো নিয়মিত ইউনিটগুলিও অন্তর্ভুক্ত, মুক্তিবাহিনী নামে কোম্পানি ও ব্যাটালিয়ন -এ

বিভক্ত হচ্ছিল এবং ভারতীয় আর্মির পাশাপাশি কিন্তু নিজেদেরই নেতৃত্বে যুদ্ধ করছিল। তাদের নেতৃত্ব যেসব ক্ষেত্রে ভাল ছিল সেসব ক্ষেত্রে তারা ভাল যুদ্ধ চালাচ্ছিল। সীমান্তের কাছাকাছি লক্ষ্যবস্তুতে তারা হানা দিচ্ছিল, সাধারণত কম্যান্ডো কায়দায় আক্রমণ চালাচ্ছিল যদিও তারা তার জন্য তারা যথেষ্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্তও ছিল না বা যথেষ্টভাবে সজ্জিতও ছিল না। প্রায়ই তাদের হতাহতের সংখ্যা এতটা হত যা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও সাজসজ্জা থাকলে এড়ানো যেত।

তাদেরকে দেশের আরও ভিতরে পাঠানোর কিছু প্রচেষ্টা নেওয়া হল কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার এই যে দুইশ' সংখ্যা পর্যন্ত বড় বড় ব্যাচে পাঠানো হয়েছিল। ছোট ছোট গ্রামগুলির এত বেশি সংখ্যার ব্যাচের খাওয়া-দাওয়ার ভার নিতে বেগ পেতে হত এবং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এত বড় বড় ব্যাচের উপস্থিতি সহজেই টের পেয়ে যেত। তারা সরে গেলে তাদেরকে যে গ্রামে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তা পাকবাহিনীর অত্যাচারে নরক হয়ে উঠত। এতে করে তাদের উপস্থিতি অ-জনপ্রিয়, অ-ফলপ্রসূ হয়ে উঠল। ফলাফল গ্রাহ্য না করে উচ্চতর কমান্ড কিন্তু তদেরকে ঠেলে দিতেই লাগল। সামরিক পরিকল্পনা সময় ও কার্যকরণের ব্যাপারে অনমনীয় হয়ে থাকে। সংশি-ষ্ট সর্বোচ্চ কম্যান্ডারকে অভ্রান্ত বিচক্ষণতার ভাণ্ডার হিশাবে ধরা হয়ে থাকে এবং তিনি অধস্তনদের কোনও পরামর্শ সহ্যই করতে পারেন না, এমনকি তা যদি অপ্রচলিত যুদ্ধের কৌশলের ব্যাপারেও হয়, যে সম্পর্কে তিনি হয়তো প্রায় কিছুই জানেন না।

হাজার হাজার যুবক স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণ নিতে আসছিল। সকল প্রশিক্ষণার্থীর উদ্দেশ্য ও সদিচ্ছা পরীক্ষার কোনও সন্তোষজনক ব্যবস্থাদি ছিল না। প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি নির্ভর করছিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত ন্যাশনাল অ্যাসেমবি- সদস্যদের (এমএনএদের) দ্বারা প্রশিক্ষণার্থীর খাঁটিত্ব সম্বন্ধে প্রদত্ত সত্যায়নের ওপর। এমএনএ-গণ চোখ বুজে বাঙালি অফিসারদের আনা তালিকায় সত্যায়ন করে দিচ্ছিলেন। সেইসব অফিসারদের মধ্যে কিছু ছিল যাদের স্বীয় রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। এই কারণে কোনও কোনও ব্যাচ দেশের ভিতরে অস্ত্রসহ উধাও হয়ে গিয়েছে আবার কোনও দল অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখে ফিরে এসে বলেছে যে শত্রুদের অ্যাকশনের কারণে অস্ত্র খোয়া গিয়েছে। এই নষ্টামি দূর করার জন্য নিশ্চিত ব্যবস্থার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা কাজে আসল না, সেইসব লোকদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়ায়, যাঁদের উচ্চ র‌্যাংক তাঁদেরকে উঁচু মানের বিচক্ষণতার দাবিদারও করে তুলেছিল।

বাংলাদেশ এই ভুলের মাশুল দিয়ে চলেছে। এই সমস্যা থেকে উৎক্রমণে তাদের দীর্ঘ সময় লেগে যাবে কারণ সমস্যাটা ব্যাপক এবং এর পিছনে যথেষ্ট উচ্চ মাপের পৃষ্ঠপোষকতা বিদ্যমান।

মুজিববাহিনী

গোলযোগের অশান্ত দিনগুলিতে আমরা একদল নিবেদিতপ্রাণ যুবনেতার কথা জানতে পারি যাঁদের নাম বাংলাদেশে বহুল পরিচিত ছিল। তাঁরা ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি (শেখ মুজিবের এক বোনপো), তোফায়েল আহমদ, সিরাজ, আব্দুর রাজ্জাক। তাঁদের সাথে আমার প্রথম সংস্পর্শেই আমার এই ধারণা জন্মাল যে তাঁরা শাঁসালো লোক। তাঁদেরকে মনে হল অত্যন্ত অনুপ্রাণিত, করতে অথবা মরতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং বাংলাদেশের ভিতরকার ও বাইরের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে তাঁদের নেতৃত্বের গ্রহণযোগ্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল, অস্থায়ী সরকার এঁদেরকে তেমন মর্যাদা দিতে প্রস্তুত ছিল না। তাঁরা চাইছিলেন এঁরা মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে ও যুদ্ধে অংশ নেবে। কিন্তু এই যুবনেতাদের তাতে দৃঢ় আপত্তি ছিল। মুজিবের প্রতি তাঁদের গভীরতর আনুগত্যের এবং মুজিবের সঙ্গে তাঁদের নৈকট্যের কারণে (তাঁরা সকলে পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জেল খেটেছেন মুজিবের সঙ্গে) তাঁরা মুজিববাহিনী নামে অভিহিত হতে পছন্দ করলেন। তাঁরা তাদের পুরনো সহকর্মীদের ক্যাডার হিশাবে বেছে বেছে সত্যায়িত করলেন।

তাঁরা বাছাই করে প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসলেন অতিশয় নিবেদিতপ্রাণ মজবুত ও নির্ভরযোগ্য লোকদের এবং দাবি করলেন তাদেরকে আলাদা অপ্রচলিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে, মুক্তিবাহিনী যে কম্যান্ডো প্রশিক্ষণ পাচ্ছিল সেই প্রশিক্ষণ নয়। প্রতিভাত হল যে তারা এমন এক রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন যার 'সেল' ছিল প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহর, তহশিল ও থানায়। আর্মির কাছে প্রশিক্ষণ পাচ্ছিল এমন হাজার হাজার যুবক মুক্তিযোদ্ধার খাঁটিত্ব সম্বন্ধে তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন না কারণ তারা তাঁদের সঙ্গে কখনও আওয়ামী লীগের যুব সংগঠনে কাজ করেনি। তাদের কাছে তাঁরা নিজেদের সংগঠন ও গোপন 'সেল'গুলিকে প্রকাশ করতে সংযত ও সতর্ক ছিলেন।

কর্নেল ওসমানী কমান্ডের ঐক্যের ওপর জোর দিয়েছিলেন। যে কোনও যুদ্ধে কমান্ডের ঐক্য অবশ্যই এক সর্বাপেক্ষা ঈপ্সিত ব্যাপার। যাঁরা অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিলেন এমন কতক জ্যেষ্ঠ আওয়ামী লীগ নেতা উপরে উলে-খিত নেতাদের দ্বারা সংগঠিত আওয়ামী লীগের যুব সংগঠনের পৃথক কর্মকাণ্ডে খুশি ছিলেন না। এ প্রশ্নে কোনও পক্ষই আপশ করতে চাইল না। ভারতীয় আর্মি কেবল অস্থায়ী সরকারের মতামত গ্রহণ করত যদিও তার প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন অন্য কোনও কর্তৃপক্ষকে স্বীকার করতেন না তা যতই কার্যকারী ও দেশপ্রেমিক হোক না কেন।

আমি এমন অবস্থায় একটি সুসংগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, নিবেদিতপ্রাণ ও উচ্চ মাত্রায় অনুপ্রাণিত যুবক দলের গুরুত্ব পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। এরকম একটা

দলের যে কী কারণে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হয়, যেখানে কিনা যে কেউ মুক্তিবাহিনীর উর্দি পরিধান করে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র নিয়ে মার্চ করতে করতে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে, তাও আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সাধারণ বুদ্ধি এ কথাই বলল যে আমরা যেন মুজিববাহিনীকেই সমর্থন করি এবং তার সঙ্গে সংখ্যগরিষ্ঠ ও ভারতীয় আর্মির স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও তার সরাসরি কমান্ডের অধীন মুক্তিবাহিনীর সম্পর্ক মসৃণ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান হিশাবে সংশি-ষ্ট সকলের দ্বারা গণ্য জনাব তাজউদ্দিন -এরও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছিল মুক্তিবাহিনী।

ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি শ্রী আর. এন. কাও এসময় আমার ঊর্ধ্বতন সিভিলিয়ান কর্মকর্তা ছিলেন। আওয়ামী লীগের যুব উইং -এর নেতৃত্ব এবং খোদ সংগঠনটি সম্পর্কে বিস্তারিত গোয়েন্দা তথ্য জানার সুবিধা তাঁর হয়েছিল এবং তাঁরও গভীর উপলব্ধি ছিল যে তিনি আমার তত্ত্বাবধানে যে যুবনেতাদেরকে দিয়েছিলেন কেবল তাদের দ্বারাই আসল কাজটি হবে এবং তাঁদেরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া দরকার বাংলাদেশের সবচেয়ে স্পর্শকাতর রাজনৈতিক অঙ্গনে কাজ করার জন্য। তিনি তাঁদের প্রতি অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীদের ঈর্ষার কথা জানতেন যে ঈর্ষা ছিল তাঁদের গরম-মাথা ও আপশহীনতার মনোভাবের জন্য ও মন্ত্রীদের নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অভিসন্ধির জন্য। পরিস্থিতি সহজ করতে যেখানে যেমন পারা যায় যথাসাধ্য তিনি করেছিলেন তবে সবচেয়ে কঠোর সমালোচনা আমাকে শুনতে হয়েছিল কারণ আমিই ছিলাম তাঁদের প্রশিক্ষণে ও কাজে লাগানোয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কমান্ডার।

এ ব্যাপারে আমার অসুবিধা বেড়ে গেল যখন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী ডি.পি ধর আমাদের দৈনন্দিন বিশদ কর্মকাণ্ডের মধ্যে নাক গলাতে শুরু করে দিলেন।

সংশি-ষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্পর্ককে কয়েকটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শেখ ফজলুল হক মনি

হালকা পাতলা গড়নের মানুষটি যেন এক জ্বলন্ত মশাল। তাঁদের স্বাভাবিক নেতা বলে মনে হত তাঁকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং যে কোনও আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন কিন্তু কাজ করা বন্ধ করতেন না। সীমান্তের কাছাকাছি তাঁর লুকানোর জায়গায় ডাক্তার পাঠানোর কঠিন কাজটা আমাকে করতে হত। তাঁর চিকিৎসার যতদূর সম্ভব ভাল ব্যবস্থা আমি করতাম।

তিনি ছিলেন আন্তরিক, বন্ধুদের প্রতি সংবেদনশীল, আর শেখ মুজিবের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত। আমার মনে আছে ঐ সময়টার কথা যখন যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরে আমার স্টাফ অফিসারদের মধ্যে একজনের কাছে আমি শোনার পর তাঁকে শেখ মুজিবের মুক্তির

খবরটা দিই। প্রচুর আনন্দের আবেগে তিনি কাঁদলেন এবং কৃতজ্ঞতার বশে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। দুর্ভাগ্যবশত দেখা গেল সেবার ওটা একটা গুজব মাত্র ছিল।

অদম্য সাহসের অধিকারী স্থিরপ্রতিজ্ঞ এই লোকটি পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ ভূমিতে আসল যুদ্ধের সময় আমার সঙ্গে ছিলেন। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি এত বেশি অমনোযোগী ও অসতর্ক ছিলেন যে রাঙামাটির পতনের স্বল্প পরে যখন তিনি রাতে চলাফেরা করতেন তখন আমি তাকে চোরাগোপ্তা গুলি থেকে নিরাপত্তা দানের জন্য এক জীপ ভরতি লোক দিয়েছিলাম।

উচ্চসংস্কৃতিবান মানুষটি কথা কম বলতেন। তাঁর হাসি বের হয়ে অসত একদম সরাসরি হৃদয়ের ভিতর থেকে এবং সে হাসি ছিল সংক্রামক। তাঁকে হাসতে দেখতে আমার ভাল লাগত।

রাজনীতির ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ সচেতন ছিলেন। রাজনৈতিক চিন্তা তাঁর সম্যক বিবেচনাপ্রসূত ছিল। এমন প্রখর দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন যে অন্যদের অভিসন্ধি সহজেই দেখতে পেতেন। একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হিশাবে ভাল করবেন, অবশ্য তাঁর আকাঙ্ক্ষা আরও অনেক বেশি উচ্চ ছিল বলে মনে হয়েছিল।

তিনি আমাকে বলেছিলেন আমি এই যুবনেতাদের জন্য শেখ মুজিবের অনুপস্থিতি জনিত শূন্যতা পূরণ করেছি। আমি বুঝেছিলাম তিনি শুধু তাঁর ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন তাঁর দেশের জন্য আমি আমার চাকরিগত কর্তব্যের বাইরে যা করছি তার জন্য।

মুক্তির পরে আমি দেখেছি তিনি ঢাকা থেকে *বাংলার বাণী* নামে একটি বাংলা দৈনিক সম্পাদনা করছেন, তার সাথে আরও কিছু কিছু পত্রিকা। এ কাজে তিনি এত নিবিষ্ট ছিলেন যে আমাকে তিনি খুব কমই সময় দিতে পারতেন এবং আমি বারবার তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করার পর তিনি শুধু একবার হ্যালো বলার জন্য হাজির হতেন।

তোফায়েল ও রাজ্জাক তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। সিরাজও তা করতেন, কিন্তু স্বল্প পরিমাণে। প্রায়ই আলোচনা গরম হয়ে উঠত। সিরাজ অপেক্ষা করতে চাইতেন না। কিন্তু সবসময় তাঁরা একটি টীম হয়ে কাজ করতেন এবং যৌথ নেতৃত্বের ভাল উদাহরণ তুলে ধরতেন।

সিরাজ

তিনি র‍্যাডিকাল ধ্যানধারণা পোষণ করতেন। আপশহীন মনোভাবের ছিলেন। যুদ্ধ

করতেন বাঘের মতো। কাজ করতেন নিবেদিতপ্রাণ ক্রীতদাসের মতো। একসঙ্গে অনেকদিন তিনি না খেয়ে না ঘুমিয়ে শুধু চা -এর ওপর থাকতে পারতেন। যখন খেতেন, খুব ভাল রকম খেতেন। মুরগি এবং গোশত-ভাত তাঁর প্রিয় ছিল।

নির্ঘুম রাতের ক্ষতিপূরণ করতেন যখন কাজ থাকত না তখন দিনের বেলায় লম্বা ঘুম দিয়ে। বক্তৃতা দিতে তিনি পছন্দ করতেন না। মুজিববাহিনীর ছেলেদের উদ্দেশ্যে তাঁকে কিছু বলানোর জন্য রীতিমতো অনুরোধ উপরোধ করতে হত, কিন্তু যখন কিছু বলতেন তাতে খুব ভাল কাজ হত। কথা এমন বলতেন যে বোঝা যেত তিনি কাজের লোক, কথার নয়; তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীর মতো করে তিনি কথা বলতেন। তিনি প্রচার অপছন্দ করতেন। মুখ বুজে কাজ করে যেতে চাইতেন। চিরকুমার। বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার ধরন ছিল আক্রমণাত্মক এবং কখনও কখনও বলতেন গোমড়ামুখে রাগান্বিতভাবে। মুক্তির স্বল্প পরে ঢাকায় তিনি যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে এসেছিলেন তখনকার কথা আমি ভুলতে পারি না। তিনি ছিলেন খুব অসুস্থ। গায়ে অনেক জ্বর। তাঁকে আমার কক্ষে বয়ে নিয়ে আসার জন্য তিনি জোর করছিলেন। এমনকি লিফটে দুজন যুবক তাকে ধরে রেখেছিল কারণ তিনি ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছিলেন না। বিছানা ছেড়ে আমার সাথে দেখা করতে আসার জন্য আমি যখন তাকে তিরস্কার করলাম তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"আপনাকে আমার শ্রদ্ধা জানানোর এই সুযোগ আমি কি করে হারাই; আপনি আমাদের জন্য ও আমাদের দেশের জন্য এত কিছু করেছেন। মুক্তির পরে আপনি এখন ঢাকায়, আমি কিভাবে না এসে পারি।" তিনি এমন মানুষ যাকে ভালবাসতে হয়। তিনি আত্মোৎসর্গের প্রতীক স্বরূপ। আমার শুধু মাত্র এই ভয়ই ছিল যে দারিদ্র্যমুক্তির পথের ধীরগতিতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন না এবং হয়তো রূঢ় ও অগ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে অপ্রিয় হয়ে যাবেন। শেষ পর্যন্ত এই হল যে তিনি শেখের অধীনে কোনও পদ গ্রহণ করলেন না এবং সরকারের বিরোধী একমাত্র নেতা হিশাবে দেখা দিলেন।

তোফায়েল আহমদ

আয়ুবের আমলে বানোয়াট অভিযোগে শেখ মুজিবকে বন্দি করলে ছাত্রনেতা হিশাবে তাঁর ওপর ভার ছিল মুজিবকে মুক্ত করার লক্ষ্যে অদম্য আন্দোলন গড়ে তোলার। বাংলাদেশের ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন প্রবাদপুরুষ। যখনই তিনি মুক্তিবাহিনী প্রশিক্ষণ শিবিরের বহির্ভাগে হাজির হতেন, ছাত্ররা প্রশিক্ষণ ফেলে সমস্ত শৃঙ্খলা ভুলে তাদের প্রিয় নেতাকে দেখতে দৌড়ে আসত। তিনিও শেখ মুজিবের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। কিছুটা কালোপানা রঙের গাট্টাগোট্টা গড়নের। যখন বলতেন, শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। এমন উদ্দীপ্ত ও জোরালোভাবে কথা

বলতেন যে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকত এবং মুখমণ্ডল ঘর্মাক্ত হয়ে যেত। এমনকি প্রতিপক্ষের মন বুঝে চলার মতো কৌশলী ছিলেন, প্রতিপক্ষের প্রতিও মনোরম আচরণ করতেন; রাজনীতিবিদ হিশাবে গড়ে উঠছিলেন তিনি। শেখ মুজিবের সহকারী হিশাবে আন্তরিক ও শ্রমসাধ্য রাজনৈতিক কাজ করে করে তার এক ধরনের কারিশমা গড়ে উঠেছিল। পরে আমি জেনেছিলাম শেখ মুজিবও তাঁকে একই রকম ভালবাসতেন এবং শেখের বাসায় তিনি মনি'র মতোই ঘন ঘন যেতেন, যেখানে মনি ছিলেন শেখের নিকটাত্মীয়। বাংলাদেশের মুক্তির জন্য তোফায়েল দিনরাত কাজ করতেন। তাঁর স্ত্রী এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও তখনও বাংলাদেশে ছিলেন এবং আমি যখন তাদেরকে বের করে নিয়ে আসার একটা পরিকল্পনার কথা বললাম, তিনি বললেন–"তাঁদের নিরাপত্তার ভার খোদার হাতে থাকুক, লাখো লাখো বাঙালি একই রকম বিপদের মধ্যে সেখানে আছে, সবাই তো বের হয়ে আসতে পারবে না।"

আমি এই লোকটির স্বাভাবিক বন্ধুভাবাপন্নতা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। মনি যেমন বলেছিলেন তিনিও তেমনি বলেছিলেন যে এই কঠিন সংগ্রামের সময়ে শেখের অনুপস্থিতিজনিত শূন্যতা আমি পূরণ করছি।

শেখ পাকিস্তানের বন্দিশালা থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় নামার পর তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি শেখের সাথে কোলাকুলি করেছিলেন। এমনকি শেখের ছেলেরাও তাঁর পরে ছিল। সুতরাং এটা অস্বাভাবিক ছিল না যে তিনি নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হয়েছিলেন।

আব্দুর রাজ্জাক

শরীরের গঠন উত্তম। কোনও কিছুতেই যেন বিচলিতি হন না এমন একটা মানুষ। রাজনৈতিক বন্দিত্বের কোনও ছাপ তাঁর মুখে নেই। খোশমেজাজি, সংস্কৃতিবান, রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক এবং ভাল বক্তা। এই ছিলেন আব্দুর রাজ্জাক। সাংগঠনিক কাজে ছিল তাঁর বিশেষ যোগ্যতা। এ ব্যাপারে তিনি অনন্যসাধারণ ছিলেন। তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবং দারুণ রকম জনপ্রিয় ছিলেন। সময়ানুবর্তী এবং নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন, সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করতেন। লক্ষ্য অর্জনে সকল রকমের আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। আমার প্রত্যয় হল তিনি সৎ এবং দক্ষ প্রশাসক হিশাবে শেখের সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে পরিগণিত হতে পারেন।

ঐ আগুনের মতো নেতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে স্থিতিশীল চরিত্রের। এমন নয় যে অন্যেরা স্থিতিশীল ছিলেন না কিন্তু তাঁকে সব সময় মনে হত গ্রানাইট পাথর যার চারপাশে ও উপরে শক্ত কাঠামো গড়ে তোলা যায়। তিনি বিবেচনাপরায়ণ ছিলেন এবং খুব বেশি আবেগপ্রবণ ছিলেন না। তিনি বাছবিচার করতেন, কোনও পরিকল্পনা

কার্যকর করার আগে গভীর ও দীর্ঘ চিন্তা করতেন। খুঁটিনাটি পর্যন্ত ভাবতে ছাড়তেন না এবং নিটোল উৎকর্ষই হত তাঁর লক্ষ্য। মনে হয় তাঁর একমাত্র দুর্বলতা ছিল সিনেমা দেখতে যাওয়া। তিনি মজা করে বর্ণনা করতেন কিভাবে একবার আয়ুবের পুলিশ, যখন কিনা তিনি গোপনে থেকে কাজ করছিলেন, তাঁকে ঢাকায় এক সিনেমা হল থেকে ফেরার পথে অসতর্ক অবস্থায় পাকড়াও করেছিল।

তাঁর আন্তরিকতা আমার পছন্দ হল। আমরা ভাল বন্ধুতে পরিণত হলাম। আমি ভেবেছিলাম মুক্তির পরে শেখ সাহেব তাঁকে কোনও সাংগঠনিক কাজ দেবেন এবং আসলেই মর্যাদাবান আওয়ামী লীগ পার্টির তিনি সাংগঠনিক সচিব হয়েছিলেন।

তাঁদের স্বাধীনতার পরে সস্ত্রীক তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে ছিল এক আনন্দপূর্ণ চমক। তিনি ইরান যাচ্ছিলেন একটা সমাবেশে যোগ দিতে। সেই একই রকম যেমন আগেই বলেছি। বাংলাদেশের ক্ষমতা কাঠামোয় তিনি সব সময়ই এক সম্পদ হয়ে থাকবেন।

এই চার নেতাই বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে এমন কারও সন্ধান করছিলেন, যে তাঁদের দেশের মুক্তির জন্য তাঁদেরকে কিছু অস্ত্রসাহায্য দিতে পারবে। ভারতে কেউ তাঁদেরকে চিনত না। তাঁদের নিজেদের অস্থায়ী সরকার ছিল গঠনের প্রক্রিয়ায় এবং তাঁরা তাঁদেরকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

আমরা কিছু দায়িত্ববান যুবনেতার খোঁজ করছিলাম যাঁদের ঐ দেশে কিছু প্রভাব আছে। বেশ কয়েক দিন ব্যাপী কথাবার্তায় আমরা অনুভব করলাম যে তাঁরা খাঁটি দেশপ্রেমিক, তাঁদের রয়েছে সুপ্রতিষ্ঠিত সংগঠন যার শাখা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে আছে, এবং এঁরা সত্যিকার কাজের হবেন। শীঘ্রই তাঁরা নিজেদের ভাল চেনা নব্যযুবকদের বাংলাদেশের ভিতর ও বাহির থেকে জোগাড় করে ফেললেন এবং আমরা তাদেরকে বিশেষভাবে সংগঠিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করলাম। আমাদের প্রশিক্ষণ ছিল খুব শক্ত রকমের কিন্তু ইনস্ট্রাক্টরদের (যাদের আমি বিশেষভাবে ব্রীফ করেছিলাম) ব্যবহার প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতি এত ভাল ছিল যে দু'পক্ষের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের বন্ধন এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছিল। আমরা এই সব ছেলেদের মধ্যে বিপুল উদ্যম ও উৎসাহ লক্ষ করেছিলাম। এসব ছেলেরা আমাদের আলোচ্য নেতাদের হাতে বাছাই করা ছিল। এরা সবাই ছিল শিক্ষিত, অনেকে তাদের স্নাতক, প্রকৌশলী ও ডাক্তারি পাঠ অসমাপ্ত রেখে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি ত্যাগ করে এসেছিল। কিছু ছিল স্রেফ স্কুল-ছাত্র। তাদের দারুণ অসম্ভব রকমের চমকপ্রদ ক্ষমতা ছিল ইনস্ট্রাকশন বুঝে শিখে নেওয়ার। যে সব ছেলে কোনওদিন রাইফেল দেখেনি তারা এমন ভাবে লাইট মেশিন গান হাতে কাজ করছিল যেন ওটা তাদের জন্ম থেকে ভালরকম চেনা। ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি টেকনিক তাঁরা রেকর্ড পরিমাণ স্বল্প সময়ে শিখে ফেলেছিল।

প্রথম দিকে তাদের শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না এবং পাহাড়ি এলাকার ঠাণ্ডা হাওয়া তাদের খুব লাগছিল। কিন্তু আমরা যে চমৎকার খাবার আর ভিটামিনসমূহ তাদের দিচ্ছিলাম তাতে তারা শিগগিরই চাঙ্গা হয়ে উঠল। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ত্যাগ করার আগে প্রত্যেকেরই ওজন বেড়েছিল।

তাদের মধ্যে যারা তাদের আপন ও প্রিয়জনদের ইয়াহিয়ার জেইলরদের হাতে রেখে এসেছিল তারা অবশ্য বিমর্ষ ছিল এবং তারা মাঝে মাঝে কান্নাকাটি করত যাতে করে অন্য অনেকের চোখেও পানি ঝরত।

তাদের কতকে নিজেদের চোখে দেখা পাকিস্তানিদের এমন কাজের বর্ণনা করত যে সর্বশেষ পাকিস্তানিটা পর্যন্ত বিতাড়িত না হওয়া পর্যন্ত এবং সম্ভব হলে তাদের শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম না নেওয়ার ইস্পাত কঠিন শপথ নিত অন্য শ্রোতারা।

তাদের মধ্যে দুজন ছিল যাদের বয়স কুড়ির নিচে– আশরাফ এবং জামাল। এ দুজন আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল কারণ আমি তাদেরকে খুব খারপ পরিস্থিতির মধ্যে এবং পরে সবচেয়ে ভাল পরিস্থিতির মধ্যেও দেখতে পেরেছিলাম যখন আমি তাদের ভষ্যিৎ সম্ভাবনা আন্দাজ করেছিলাম।

আশরাফ

একজন ছিল আশরাফ–বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ছেলে। এই অল্পবয়স্ক ছেলেটি তার বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে ছিল। সে স্বাধীনতার জন্য এত উচ্চ মাত্রায় নিবেদিতপ্রাণ ছিল যে সে সারাক্ষণ বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি জঙ্গলে অবস্থান করত। প্রশিক্ষণের পরে সে যা কিছু শিখেছিল তার সব কিছু কাজে লাগাতে চাইল। সুদর্শন ও সম্ভাবনাময় এই ছেলে অনুভব করত তার দেশের প্রতি তার দায়িত্ব হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে এও ভাবত যে অল্পবয়স্কদেরই আত্মত্যাগ করতে হবে তাদের নিজেদেরই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য। সে রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। সে একবারও তার প্রিয় বাবা -এর সঙ্গে দেখা করতে যায়নি। একবার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম এমন সময় অনুরোধ এল বেগম নজরুল ইসলামের কাছ থেকে–তাঁর ছেলে আশরাফ যেন মাত্র একটি বারের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে, সে মাসের পর মাস তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি বা চিঠি লেখেনি। আমি খবর দিলাম কিন্তু যুবকটি কখনও তাঁর মাকে কোনও সময় দিতে পারল না এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একবারও আসল না। অস্থায়ী সরকারের জন্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন শক্তির এক টাওয়ার স্বরূপ। জনগণ ও শেখ মুজিব -এর প্রতি তাঁর অশেষ আনুগত্য ছিল। যেহেতু তাজউদ্দিন সাহেব প্রধানমন্ত্রী হিশাবে সব আলাপ আলোচনা চালাতেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম নেপথ্যে থাকতেন, কিন্তু তিনি তাঁর অটল

দৃঢ় সুস্থির ব্যক্তিত্বের দ্বারা সমগ্র সরকারকে মর্যাদা দান করতেন। তাঁর দেশ ও শেখ মুজিব -এর প্রতি তাঁর অটল আনুগত্য আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করেছিল এবং আমার কাছে তাঁকে প্রিয় ব্যক্তিত্ব করে তুলেছিল।

শেখ জামাল

কুড়ি বছরের কম বয়সের দ্বিতীয় ছেলেটি আমাকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছিল যে আমি তাকে নিজের পুত্র হিশাবে বিবেচনা করতাম এবং চাইতাম তার সাথে যেন আমার কোনও বিচ্ছেদ না হয়। সে ছিল শেখ জামাল, শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র।

এই ছোট ছেলেটি তখনও সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ বা ম্যাট্রিকুলেশন করেনি কারণ বেগম মুজিব ও পরিবারের অন্যদের সাথে সে গ্রেফতার হয়ে তাদের বাসায় আটক অবস্থায় থাকত, বাসা থেকে সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে নেওয়ার ফলে মেঝের ওপর ঘুমাতে বাধ্য হত। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বাড়িটার চারদিক ঘিরে তারকাঁটার বেড়া তুলেছিল এবং সেনা পাহারা বসিয়েছিল যাতে কেউ পালিয়ে যেতে না পারে। এই পাকিস্তানি নির্যাতকদের পরিকল্পনা কী ছিল তা কেউ আন্দাজ করতে পারেনি।

জামাল পালানোর একটা পরিকল্পনা করেছিল, দেখতে চেয়েছিল মুক্তিবাহিনীকে মুজিব পরিবারের অবস্থান সম্বন্ধে জানাতে পারে কি না এবং দেশের জন্য যুদ্ধও করতে পারে কি না। সে একজন পাঠান গার্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করল এবং তারকাঁটার বন্দিশালা থেকে লাফ দিয়ে বাইরে চলে এল। তার বেরিয়ে আসা ছিল চূড়ান্ত রকমের বিপদজনক এবং পাকিস্তানি প্যাট্রলের হাতে পড়ার সম্ভাবনা ছিল সর্বত্র। কোনও কিছুই তাকে থামাতে পারল না। সে পালাল এবং ভারতের পথে যাত্রা শুরু করতে যাওয়া আর কিছু ছাত্রের সঙ্গে মিলিত হল। অনেক দেরিতে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং আমাদের যুবনেতারা তাকে ধরে নিয়ে এল।

আমি একটা খবর পাঠিয়ে বললাম যে এই বাঘের বাচ্চার ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। কারণ শুধু এই নয় যে সে শেখ মুজিবের পুত্র বরং এজন্যও যে এত অল্প বয়সে চূড়ান্ত দুঃসাহসের কাজ সে করেছে। জামাল তার জন্য কোনও বিশেষ পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থা বা খাদ্য ও পোশাক গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। সে সমস্ত ধকল সহ্য করল এবং গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল খুব দ্রুত শিখে নিল। আমার চোখে তার স্থান অনেক অনেক উপরে উঠে গেল যখন সে আমাকে বলল যে তাকে তার বাবার খ্যাতির মর্যাদাও রক্ষা করে চলতে হবে। আমি তখন বুঝলাম যে সে খুব অল্প বয়সে খুব বড় রকমের দায়িত্ব কাঁধে নিতে চাচ্ছে। সে অত্যন্ত পাকা হাতে অস্ত্র ধরত এবং পার্বত্য ঠাণ্ডা আবহাওয়া রীতিমতো উপভোগ করত। প্রশিক্ষণর পরে সে সীমান্তের দিকে চলে গেল এবং তার কমরেডদের সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন বিপদ ও ঝামেলার ভাগ নিল। সে দিনরাত

কাজ করত। আমি যখন তার নিষ্পাপ মুখের দিকে চেয়ে ভাবতাম যে সে অত্যন্ত দুঃসাহসিক অভিযান করে তার মা ও পরিবারের থেকে দূরে এসেছে, মনে তার সদা ভয় পাকিস্তানে বন্দি তার বাবার নিরাপত্তা নিয়ে এবং তাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি একত্রিত হওয়ার বড় একটা সম্ভাবনা নেই, তখন আমার চোখে পানি এসে যেত। আমি মনে মনে ভাবতাম পাকিস্তানিদের প্রতি তার এবং তার প্রজন্মের সকলের কী তিক্ত মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে, যারা বিনাদোষে দারুণ দুর্ভাগ্য পোহাচ্ছে।

জামাল ছিল জন্মগত জননেতা, যেমন ছিলেন তার বাবা। যখন সে তার বাবার টেপরেকর্ড করা তাঁর স্বদেশবাসীদেরকে জেগে ওঠার জন্য বাংলায় দেওয়া উদাত্ত আহ্বান শুনত তখন আমি তার আবেগ লক্ষ করতাম। এরকম একজন বাবার জন্য কে না গর্বিত হবে, কিন্তু সে জানত না তাঁর কণ্ঠ আর কোনও দিন শুনতে পাবে কি না। আমাকে বলা হয়েছিল, মাঝে মাঝে যখন কেউ তাকে লক্ষ করত না তখন একাকী সে কান্নাকাটি করত। শুধু তার বাবার জন্য নয়, বরং তার মা ও সবচেয়ে ছোট ভাই রাসেলের জন্যই বেশি, যাদেরকে সে পাক নির্যাতনকারীদের হাতে রেখে এসেছে। সে নীরবে দুঃখ ভোগ করত। সে আমার গোটা পরিবারের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। আমরা তাকে আমাদের ফলের বাগানে দাওয়াত করে আনতাম এবং সে সেখানকার মনোরম পরিবেশে মন জুড়াত ও তা উপভোগ করত। আমার খামার বাড়িটা সকল বাংলাদেশি নেতাদের সাধারণ সাময়িক বিরতির স্থান হয়ে উঠেছিল। একটা পার্টিতে–সেখানে জামালও ছিল– আমি সমবেত সকল নেতাদের উদ্দেশে বলেছিলাম যে শেখ মুজিব অবশ্যই মুক্ত হবেন এবং শেষ পর্যন্ত জাতির জনক হিশাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আমি অন্তর থেকে কথাগুলি বলেছিলাম। যদিও শেখ মুজিব আমার চেনা ছিলেন না কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং আমার পরিবারের কাছে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন এবং আমি তাঁর নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা করতাম। মুক্তির পরে জামাল তার মহান মাতার সঙ্গে পুর্মিলিত হল। কম লোকই মুক্তিযুদ্ধের বিখ্যাত নেতাদের এই নিবেদিতপ্রাণ স্ত্রীদের ভূমিকার কথা লেখেন। আমি মনে করি বেগম মুজিব আত্মত্যাগে সব পুরুষদের অতিক্রম করেছিলেন। অল্প রেশনে এবং সামান্য বিছানা ছাড়া পাক আর্মির হাতে বন্দি অবস্থায় থেকে তাঁর চেয়ে কম মনের জোরের যে কোনও মহিলা ভেঙে পড়তেন। তিনিই সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ সয়েছেন। তার দৃঢ়তার কাছে তাঁর নৈতিক শক্তি ও চরিত্রের কাছে এবং তাঁর অদম্য নিষ্ঠার কাছে তাঁর জাতি অনেক অনেক ঋণী। এগুলিই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের ইচ্ছাশক্তিকে ভেঙে দিয়েছিল।

ঢাকার পতনের পর একজন ভারতীয় আর্মি অফিসার কিছুটা ঝুঁকি নিয়ে বেগম মুজিবকে মুক্ত করার পর খুব শীঘ্রই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমার সঙ্গে মনি, তোফায়েল

ও রাজ্জাক ছিলেন। আমি দেখলাম তার মধ্যে একজন রানির সৌষ্ঠব এবং এক বাঘিনীর হিংস্রতা বিদ্যমান। তাঁর মধ্যে থেকে আত্মবিশ্বাস ঠিকরে বেরুচ্ছিল, তবে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না ভুট্টো তাঁর স্বামীকে মুক্তি দেবেন কি না। যখন আমি তাঁর আত্মীয় শেখ ফজলুল হক মনির উপস্থিতিতে তাঁকে জানালাম বাঙালি সাধু বাবা সীতারাম দাস ওংকারনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন শীঘ্রই শেখ সাহেব নিরাপদে এসে পৌঁছবেন তখন তিনি কিছুটা স্বস্তি পেলেন। কথাটা সত্য হয়ে দেখা দিল। স্বাধীনতার পর গোটা পরিবারটার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য কষ্ট ভোগ করেছে বলে এমনকি কনিষ্ঠতম সন্তান শেখ রাসেলও দাবি করতে পারত।

অপর দুটি ক্ষেত্রে ঘটনাপ্রবাহ ছিল অনেক বেশি দুর্ভাগ্যজনক। এক ছোট বালক আবেগে আপ্লুত হয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ দখলকৃত শহরের রাজপথে গ্রেনেড হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করেছিল তাকে গ্রেফতার করতে আসার জন্য। দুর্ভাগ্যজনকভাবে উত্তেজিত অবস্থায় গ্রেনেডটি সে সেফটি পিন না টেনেই ছুড়ে দিয়েছিল একদল পুলিশের দিকে। সে শহিদ হয়, তাকে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয়টি আমাদের কেন্দ্রে প্রশিক্ষিত এক ছোট সুদর্শন বালকের ওপর অসহ্য নির্যাতনের কাহিনি। কিন্তু সে কোনও তথ্যই ফাঁস করেনি। ঢাকার পতনের স্বল্প পর শেখ ফজলুল হক মনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি মুজিববাহিনীর একটি অসুস্থ বালককে হেলিকপ্টারে করে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে যেতে পারি কি না। সঙ্গে সঙ্গে আমি রাজি হলাম। চট্টগ্রাম এয়ার ফীল্ডে আমি দেখলাম কিছু মহিলাসহ একটি দল আমার হেলিকপ্টারের দিকে আসছে। দলের মধ্যভাগে ছিল সেই ছেলেটি। সে হাঁটতে পারছিল না। দুই বন্ধু তাকে ধরাধরি করে আনছিল। কাছাকাছি আসার পর সে আমার পা স্পর্শ করার জন্য নিচু হল, বয়স্কদের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য যা সকল সংস্কৃতিবান বাঙালির সালাম জানানোর পদ্ধতি। আমি তাকে চিনলাম এবং তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

আমাকে বলা হল যে তাকে ভীষণভাবে নির্যাতন করা হয়েছে তার কাছে থেকে কথা বের করার জন্য কিন্তু সে কিছুই বলেনি। তাই তারা বৈদ্যুতিক শক ও লাঠির মার দিয়ে তার দুই পা অচল করে দিয়েছে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম গঙ্গার পানি কিংবা ব্রহ্মপুত্রের পানি তাকে এমন সাহসী করেছে। সে বলল– "স্যার, আপনিই আমাকে এমন হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন।" সেই সব সাহসী ছেলেদের মন এমন বিরাট ছিল।

এই সব আত্মত্যাগী ছেলে-মেয়েরাই ছিল সাফল্যের চরম নিশ্চয়তা, তা সে যত ক্ষতির বিনিময়েই হোক না কেন। ■

অধ্যায়–৪

রাজনৈতিক কলহ

মুজিববাহিনীর চার নেতার নাম আমি দিয়েছিলাম 'অবিচ্ছেদ্য চার'। তাঁরা হচ্ছেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম, তোফায়েল আহমদ এবং আব্দুর রাজ্জাক। তাঁরা সবাই সবাইকে শ্রদ্ধা করতেন। তাঁরা একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতেন, ঘুমাতেন এবং কথাবার্তা বলতেন। তাঁদের কেউ একজন যদি মুজিববাহিনীর ছেলেদের উদ্দেশ্যে উদ্দীপনাময় বাণী দিতেন তো তাতে অবশ্যই অন্য তিনজনের নাম উলে-খ করতেন। আমার মনে হত তাঁদের নিজেদের মধ্যে মনিই নেতা হিশাবে গণ্য হতেন সম্ভবত শেখ মুজিবের সাথে তাঁর আত্মীয়তার কারণে। যখন আমাদের প্রত্যয় হল যে এই নেতৃত্বই আয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করা ছাত্র বিদ্রোহের জন্য দায়ী এবং শেখ মুজিবের আস্থা যে তাদের ওপরে আছে তার কিছু প্রমাণও পেলাম, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম তাঁরা যতদূর নিতে পারেন ততদূর পরিমাণ সাহায্য তাদেরকে করব। তাঁরা তাঁদের ছেলেদের গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন। আর তা দানের সেরা যোগ্যতা ছিল আমাদের হাতে।

আর্মি শুধু মানুষকে নিয়মিত ও কমান্ডো টাইপ অপারেশনের প্রশিক্ষণ দিতে পারত যার জন্য হাজার হাজার ছেলে-যুবা এগিয়ে আসছিল এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীর অংশ হয়ে যাচ্ছিল। এই নেতারা আমাদের জানালেন যে অনাকাঙ্ক্ষিত অনেক লোক–বাংলাদেশে নকশালপন্থীদের মতো যারা–প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র পাচ্ছে। তাঁরা আমাদের সতর্ক করে দিলেন যে এই সব অস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যহৃত হবে না বরং লুকিয়ে রাখা হবে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে নকশালপন্থী শাসন কায়েম করার কাজে ব্যবহারের জন্য। কার্যত তাঁরা কিছু নকশালীপন্থী কম্যুনিস্ট নেতার নাম উলে-খ করলেন যারা ঘটনাক্রমে কিছু বাংলাদেশি আর্মি অফিসারের আত্মীয়; সেই সব আর্মি অফিসার এখন মুক্তিবাহিনীতে, তাদের সাহায্যে ও সমর্থনে উক্ত কম্যুনিস্ট নেতারা স্বমতাবলম্বী বিপুল সংখ্যক কম্যুনিস্ট ক্যাডারকে রিক্রুট করিয়ে প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত করিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে।

এই ব্যাপারগুলি বিশ্বস্ততার সাথে সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছিল কিন্তু স্পষ্টতই কোনও কাজ হয়নি। মুক্তিবাহিনীতে আরেক দল ফ্রীডম ফাইটার ছিল যারা সাম্প্রদায়িক এবং পাকিস্তানপন্থী। তারা স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্র সমর্পণে দৃঢ়ভাবে নারাজ ছিল বরং দেশজুড়ে এমনভাবে গোলমাল সৃষ্টিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল যাতে করে পাকিস্তান ফিরে আসতে পারে। ভাগ্যক্রমে তাদের সংখ্যা এসময়ে খুব বেশি ছিল

না পাকিস্তান কর্তৃক বিশেষভাবে ও পাইকারিভাবে সংঘটিত নৃশংসতার কারণে। তৃতীয় একদল ছিল; যারা ছিল খারাপ লোক বা ডাকাত, তারা দেখল সুবর্ণ সুযোগ, ভারতীয় খরচে শুধু আধুনিক অস্ত্র হাতে পাওয়ারই নয় বরং ঠিকঠাকমতো প্রশিক্ষণ পাওয়ারও।

আমি সরকারকে সতর্ক করেছিলাম যে মুক্তিবাহিনীর উপরি-উলি-খিত তিন ধরনের উপাদান একে অপরের সাথে হাত মেলাবে এবং লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ব্যবহার করে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে গণ্ডগোল সৃষ্টি করবে।

মুজিববাহিনীর নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি সকল মুক্তিযোদ্ধাদের যাচাই বাছাই -এর মোক্ষম পদ্ধতি তুলে ধরেছিলাম কিন্তু তা কাজে লাগানো হয়নি। দিনের পর দিন এই নেতারা আমার কাছে ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার প্রতি এইসব বিপদের অভিযোগ নিয়ে এসেছেন নতুন নতুন প্রমাণসহ। একই রকম নিয়মিতভাবে আমি তাদের নিশ্চয়তা দিতাম আমি আমার সাধ্যমতো সব চেষ্টা করব এসব বন্ধ করার জন্য কিন্তু সব সময়ই আমি জানতাম আমরা বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে আসলে কিছু করা সম্ভব নয়। মুক্তিবাহিনীর বেশি বেশি সংখ্যক যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে চাপ বর্ধিত হারে বেড়ে চলেছিল। জোরটা ছিল সংখ্যার ওপরে এবং ঈপ্সিত সংখ্যায় তাদের পাওয়া যাচ্ছিল। একটা দায়সারা গোছের ব্যবস্থা ছিল যেখানে সাবেক পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বি-র দুজন বাঙালি সদস্যকে মনোনীত করা হয়েছিল তাদের খাঁটিত্ব সম্বন্ধে প্রত্যয়ন দেওয়ার জন্যে। বিশেষ স্বার্থসম্পন্ন লোকজন কর্তৃক তাদের কাছে আনা প্রত্যেকটি তালিকা আওয়ামী লীগ পার্টির এই সম্মানিত ব্যক্তিগণ এমনকি ভাসা ভাসা পরীক্ষা ছাড়াই প্রত্যয়ন করে দিতেন। একবার তালিকায় স্বাক্ষর করার পর তারা ভুল লোককে প্রত্যয়ন দেওয়ার কথা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। পুরা প্রক্রিয়াটা এমন যেনতেন ভাবে চলছিল যে এরকম ধারণা হওয়া সম্ভব ছিল এই এমএনএ-গণকে কোনও বিশেষ স্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠী দ্বারা বসানো হয়েছে অথবা মুক্তির পর কী ঘটবে সে ব্যাপারটা তারা একটুও গায়ে মাখতেন না।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার বলতে বস্তুত জনাব তাজউদ্দিনকে বোঝাত। যে জন্যই হোক মুজিববাহিনীর নেতাদের তা কখনও ভাল চোখে দেখত না এবং তাঁদের প্রত্যেকটি অভিযোগকে তুচ্ছ, বাজে ও ছেলেমানুষিপূর্ণ বলে বিবেচনা করত। কর্নেল ওসমানী তাঁর সরকার থেকে আদেশ গ্রহণ করতেন এবং বাইরে এই সব নেতার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ হলেও তাঁর স্বীয় সামগ্রিক কমান্ডের বাইরে মুজিববাহিনী নামে তাঁদের একটা আলাদা বাহিনী রাখা পছন্দ করতেন না। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জেনারেল অরোরা গোটা অপারেশনের ব্যাপারে চূড়ান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনিও মুজিববাহিনীর ব্যাপারে খুশি ছিলেন না কারণ সেটা সরাসরি তাঁর কমান্ডে রাখা ছিল না যদিও আমি মুজিববাহিনীর কমান্ডের

দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনিক হিশাবে তাঁকে নিশ্চিত করে বলছিলাম যে মুজিববাহিনী বাংলাদেশের মধ্যে তাঁর দেওয়া সকল কাজ সমাধা করবে, আমি সবসময় তাঁর সংস্পর্শে থাকব ফলাফল জানানোর জন্য। তিনি তাতে সন্তুষ্ট হননি কারণ আমি নিজে ব্যাখ্যা করে বোঝানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও জেনারেল অরোরা এ অদ্ভুত কমান্ড কাঠামোর কারণ বুঝতে ব্যর্থ হন।

গণ্ডগোলের মূল

যুবনেতারা সবসময় অভিযোগ করতেন যে জেনারেল অরোরা'র জনাব তাজউদ্দিনের সাথে কিছু রাজনৈতিক বোঝাপড়া আছে, যেজন্য তাঁরা দুইজনেই জোর দিতেন যেন মুজিববাহিনী তাঁদের কমান্ডে কাজ করে, যুবনেতাদের কমান্ডে নয়; কারণ জনাব তাজউদ্দিনের প্রতি তাঁদের কোনও আনুগত্য ছিল না। আমি জানতাম যে যুবনেতারা যেজন্যই হোক জনাব তাজউদ্দিনকে ভাল চোখে দেখতেন না। জনাব তাজউদ্দিনকে মনে হত কোনও একটা পরিকল্পনা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপারগুলি পরিচালনা করছিলেন। তাঁরা সবসময় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিন্তু জনাব তাজউদ্দিনের প্রতি তা ছিলেন না।

ভুল বোঝাবুঝির অবসানের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তার মূল ছিল অতীতে এবং অতীতে গঠিত মনোভাবগুলি দূর করার কোনও উপায় ছিল না। যুবনেতারা কোনও না কোনও ভাবে পুরনো এমএনএ এবং এমপিএ -দের সম্মেলনকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন এবং জনাব তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছিলেন এই মর্মে যে যেখানে অন্য একজনার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা ছিল সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদটি জবরদখল করেছিলেন। আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য তাঁদের পছন্দের ব্যক্তি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ব্যাপারটা একটা বিশ্রী অবস্থার জন্ম দিতে পারত কারণ যুবনেতারা জনাব তাজউদ্দিনকে তাঁদের কথামতো তাঁর যে স্থান তা দেখিয়ে দিতে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এই পর্যায়ে অস্থায়ী সরকারে কোনও ভাঙন সৃষ্টি হলে গোটা আন্দোলনের জন্য তা সর্বনাশা হত। আমি মনে করি আমি এই নেতাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে তাঁরা যা করতে চাচ্ছিলেন তা করলে তাঁদের মিশনের জন্য অর্থাৎ বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ভীষণ বিপদ ডেকে আনা হত এবং তা এমনকি আরও সাংঘাতিক পরিণতি ডেকে আনত মুক্তির পরের সময়ে। ভাগ্যিস তাঁরা স্বীকার করেছিলেন এবং যদিও ভিতরে ভিতরে তাঁরা জনাব তাজউদ্দিনকে ভাজাপোড়া করছিলেন কিন্তু বাইরে আমার মতো দুই একজন বন্ধু ছাড়া আর কেউ ব্যাপারটা জানত না।

আরও একটা, সম্ভবত আরও স্পর্শকাতর একটা সমস্যা ছিল যার দিকে আশু নজর দেওয়া দরকার ছিল। আসলেই এই নেতারা কিছু ভারতীয় কর্মকর্তাকে পরিচিত বাংলাদেশি নকশালপন্থীদের সাথে কথাবার্তা বলতে দেখেছেন বিলাসবহুল ভারতীয় হোটেলে; সেখানে তারা বাস করছিল বলেও তাঁদের মনে হয়েছে। যুবনেতারা এই লোকগুলিকে তাদের সবচেয়ে ঘোরতরো রাজনৈতিক শত্রু হিশাবে জানতেন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইনের দিনগুলিতে। বস্তুত এদের বিরুদ্ধেই আওয়ামী লীগ তার যুব উইং সৃষ্টি করে। সুতরাং তাঁরা বুঝতে পারলেন না কেন ভারত সরকার তাঁদের ঘোর শত্রুদের প্রতি এমন পক্ষপাতমূলক আচরণ করবে। তাঁরা ভুল করে এই ভেবে অবাক হলেন যে আমাদের সরকার বাংলাদেশে একটা কম্যুনিস্ট পার্টিকে জোরদার করতে চায়, একটা কম্যুনিস্ট সরকার যদি না-ও চেয়ে থাকে। তারা নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে এও জানতে পারলেন যে মার্কসবাদী এবং মওলানা ভাসানীর লোকদেরকে অস্ত্র দেওয়া হয়েছে, আলাদা করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা এতে দারুণ হোঁচট খেলেন এবং স্বভাবতই ঝাল ঝাড়ার জন্য আমার কাছে ছুটে এলেন। আমাদের মধ্যে এরূপ কথোপকথন হল:

যুবনেতাগণ– স্যার, আমরা আশা করিনি আপনারা নকশালপন্থী ও মার্কসবাদীদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্রপাতি দেবেন যাতে আমরা গত পঁচিশ বছরে যা অর্জন করেছি তা বরবাদ হয়ে যায়।

আমি হকচকিয়ে যাই, আমার মুখ লাল হয়ে যায়। আমি বলি:

আপনারা এসব কী বলছেন?

যুবনেতাগণ– আপনি বলতে চান আপনি জানেন না যে নকশালপন্থীদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে... (একটা জায়গার নাম বলে) জায়গায় এবং ভারতীয় কর্মকর্তারা তাদের নেতাদেরকে প্রথম শ্রেণির ভারতীয় হোটেলে রাখছেন ও তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করছেন।

আমি– আমি এমন ডাহা আজগবি কথা আগে শুনিনি। আমি সব সময় ভেবেছি কিছু শত্রু দালাল আমাদের মধ্যে ভাঙন ধরাবে। এখন বলেন আপনাদের মধ্যে এসব গুজব কারা ছড়াচ্ছে?

যুবনেতাগণ– আমরা নিজ চোখে দেখেছি এবং নিজ কানে শুনেছি, এর মধ্যে কোনও ভুলের সম্ভাবনা নেই। আমাদের মন ভেঙে গেছে এবং আমরা আমাদের সম্পূর্ণ মনোভাব পুনর্বিবেচনা করতে চাচ্ছি। আমরা আপনাকে সব সময় ভালবেসেছি আমাদের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে আপনার আন্তরিকতার কারণে। এটা সম্ভব যে আপনার ঈশ্বরপরায়ণ প্রকৃতির কারণে আপনাদের সরকার আপনকে এ ব্যাপারে বিশ্বাস করে সব বলেনি।

এটা সম্পূর্ণ সম্ভব যে তারা এ পন্থায় কোনও বিদেশি শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদেরকে খুশি করতে চাইছে। দয়া করে খবর নিন এবং আমাদেরকে আপনার সরকারের পলিসি জানান। রাশিয়ানপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টির কথা না হয় বোঝা যায়, তারা পুনর্গঠিত হলে যা কিছু হোক কেবলমাত্র কাগজেকলমে বিদ্যমান থাকবে; কিন্তু চীনপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি?

আমার মুখে আর কথা জোগায় না। আমার কাছে কোনও উত্তর ছিল না। একমাত্র ঈশ্বর জানেন আমাদের দেশে এ ধরনের কোনও উদ্যোগের ব্যাপারে আমি কিছুই জানতাম না। রাশিয়ার ব্যাপারে সপ্রশংস ছিলাম। তারা আমাদের প্রয়োজনের সময়ে আমাদের সমর্থনে কত করেছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম আমাদের দেশের ক্ষমতাবানদের কেউ বাংলাদেশে চীনপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করতে চাইবে না।

যখন আমি যুবনেতাদের মনোভাব শ্রী আর. এন. কাও -কে জানালাম, তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে প্রকাশ করলেন যে বাস্তবিকই মওলানা ভাসানীর নকশালাইট-রা কোনও এক স্থানে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। আমার প্রযত্নে তাদেরকে ছাড়া হয়নি কারণ তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে আমি ওরকম কোনও কাজ মনে-প্রাণে গ্রহণ করব না, এবং পরিস্থিতি যা হোক যুবনেতারা শিগগিরই তাদের আবিষ্কার করে ফেলত এবং দারুণ এক গণ্ডগোল দেখা দিত।

এরকম একটা কিছু আবিষ্কার করব তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সব সময় সচিব শ্রী কাও -এর প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলাম। তাঁর যোগ্যতা এবং সততা প্রশ্নাতীত ছিল। তিনিও একজন ঈশ্বরভীরু মানুষ ছিলেন এবং আমাকে ভদ্রতা ও দয়া দেখাতে তাঁর কখনও ভুল হত না। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার বিরক্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। যুবনেতাদের সামনে আমি বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম। আমি প্রায় আমার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে বসলাম, যদিও আমার নিজের দোষে নয়। যদি আমাকে এটা আগে বলা হত তাহলে আমি এর ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার মতো কোনও অজুহাত দিতে পারতাম বা এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারতাম যাতে কাজপাগল লোকগুলি বুঝতে পারেন।

শ্রী কাও স্রেফ বললেন– "আমরা বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করিনি। তাঁরা ভাসানীর লোকদেরকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মস্ত সম্পদ হিশাবে দেখছেন। আমরা কিভাবে তাঁদের উপদেশ অগ্রাহ্য করি। দয়া করে আপনাদের যুবনেতাদের বলুন যে পছন্দ না করলেও এটা তাঁদের গিলতে হবে। আমরা তাঁদেরকে সমর্থন দেব শুধু সামগ্রিক প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিশাবে, একটা স্বাধীন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ হিশাবে নয়। তারা যদি ঠাণ্ডা না থাকে তো তাদের দিয়ে আমাদের

কিছু করার থাকবে না এবং তারা গোল্লা-য় যেতে পারে।"

আমি জানতাম তিনি এসব বলেছেন অভিমানভরে, যা বলেছেন তা তাঁর মনের কথা নয় কারণ কিভাবে তিনি আশা করতে পারেন বাংলাদেশে তাঁর আরব্ধ কাজ তিনি সম্পন্ন করতে পারবেন এই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং নিবেদিতপ্রাণ নেতৃত্ব ছাড়া, তিনি যা খুঁজে পেয়েছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যা তাই ছাড়া। শ্রী কাও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন ভীষণ চাপের মধ্যে, অতীব স্পর্শকাতর রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে এবং অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে। আমি অনুভব করছিলাম তাঁর ওপর কিছু বাধ্যবাধকতা ছিল যা তিনি অতিক্রম করতে পারেননি। অনির্ভরযোগ্য লোকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার এই সুস্পষ্ট ভুল উদ্যোগে কোনও সুবিবেচনা আছে বলে আমার প্রত্যয় হল না এবং আমি তার অফিস ত্যাগ করলাম অনেক হতোদ্যম অবস্থায়।

আমি যুবনেতাদের বললাম কর্তৃপক্ষ স্বভাবতই বাংলাদেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত এমন সবাইকে সাহায্য করছে তাঁদের নিজেদের অস্থায়ী সরকারের সুপারিশ অনুযায়ী। কিছু অবাঞ্ছনীয় লোক এর সুযোগ নিতে পারে, তা এই অসাধারণ পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ সম্ভব এবং এ কারণে তাঁদের দ্বিগুণ সতর্ক থাকতে হবে।

যুবনেতাদের মধ্যে সন্দেহ, দুশ্চিন্তা রয়েই গেল। সুতরাং তাঁরা তাঁদের গোপন 'সেল'গুলি, গোপন আস্তানাসমূহ এবং সেগুলিতে যাওয়ার রাস্তা সম্বন্ধে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বলার ব্যাপারে দারুণ সতর্ক হয়ে গেলেন। আমি আত্মসম্মানের দোহাই দিয়ে তাঁদেরকে কথা দিয়েছিলাম যে তাঁরা তাদের সংগঠন সম্বন্ধে যা কিছু বলবেন তা আমি অন্য কারও কাছে প্রকাশ করব না যতক্ষণ না তাঁরা নিজেরা আগে তা প্রকাশ করেন বা করার জন্য বলেন। এসব তথ্য আমার জন্য খুব প্রয়োজনীয় ছিল কারণ আমি সকল রকম পরিকল্পনা তাঁদের সহযোগিতায় করতাম। আমাদের একসঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে তাঁদের বিপুল বিশ্বাস আমি অর্জন করেছিলাম। আমি তাতে সম্মানিত বোধ করতাম এবং কোনও অবস্থাতেই সেই বিশ্বাস ভঙ্গ করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

আমি তাঁদের গোপন কথা এমনকি তাঁদের নিজেদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কাছেও ফাঁস করতে প্রস্তুত ছিলাম না– এমনকি তাঁদের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও না। তাঁদের জোর সন্দেহ ছিল তাজউদ্দিন ষড়যন্ত্র করছেন স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার। তাঁরা পরে আমাকে অকপটে বলেছিলেন–"তাজউদ্দিনের সঙ্গে তোমাদের কম্যুনিস্ট মন্ত্রী ডি.পি. ধর -এর আঁতাত আছে। আমরা তাঁদের দুজনার কাউকে বিশ্বাস করি না। এমনকি তোমার সরকারও জানতে পারবে না এরা দুজন স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের জন্য কী পরিকল্পনা করছেন।"

তাঁরা কর্নেল ওসমানীর কাছে কোনও তথ্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কর্নেল ওসমানী জনাব তাজউদ্দিনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছিলেন। অথবা লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরার কাছেও না, যাঁর সম্বন্ধে তাঁদের হিশাব ছিল যে তিনি তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের খেলা খেলছেন, কেন, তা তাঁরা আন্দাজ করতে পারতেন না। তাঁরা প্রায়ই আমাকে বলতেন যে জেনারেল অরোরা তাজউদ্দিনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে ও মুজিববাহিনীকে তাঁর কমান্ডের অধীনে দেওয়ার ব্যাপারে চাপ দেওয়াতে চাইছিলেন।

ফীল্ড মার্শাল এফ. এস. এইচ. জে. মানেক্‌শ', এমৃসি

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর আমার এবং আর্মি চীফ-জেনারেল, পরে ফীল্ড মার্শাল, মানেকশ' -এর মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছিল। তিনি আমার আর্মি ক্যারিয়ারে দুই দুইবার আমার ইনসট্রাক্টর ছিলেন, একবার কোয়েটা স্টাফ কলেজে এবং আরেকবার মহৌ -এ ইনফ্যান্ট্রি স্কুলে সিনিয়র অফিসারস কোর্স -এ। উভয় কোর্সেই মেধাসম্পন্ন কয়েকজন কর্নেল যোগ দিয়েছিলেন যাঁরা পরে ভারতীয় আর্মির মেজর জেনারেল এবং লেফটেন্যান্ট-জেনারেল হয়েছিলেন। দুটি স্থানেই তিনি আমাকে শীর্ষ স্থান দিয়েছিলেন এবং আমার কৃতির জন্য আমাকে অভিনন্দিত করেছিলেন।

এই ফীল্ড মার্শাল আমার দেখা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষদের একজন। তাঁর নিজস্ব একটা আকর্ষণ শক্তি ছিল। একজন মেধাবী রণকৌশলী, এবং জীবনের যে কোনও সমস্যার ব্যাপারে তাঁর অ্যাপ্রোচ ছিল অত্যন্ত যুক্তিবাদী ও প্রশস্ত মনোভাবাপন্ন। তাঁর এক অদম্য রসবোধ ছিল যা তাঁর জীবনে প্রচুর ঝামেলার সৃষ্টি করেছে। প্রয়াত জেনারেল বি. এম. কাউলের সঙ্গে একবার তাঁর লেগে গিয়েছিল এরকম সামান্য এক ঘটনায়। ব্যাপারটা জেনারেল কাউল নিজে আমাকে বলেছিলেন। জেনারেল কাউল স্বনির্ভর ভিত্তিতে প্রচুর সংখ্যক বাসভবন গড়ে তুলেছিলেন। বাসস্থানের স্বল্পতায় আর্মি হতোদ্যম হয়ে পড়ছিল, তার নিরসনের জন্যই তিনি কাজটা করেছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন জরুরি অবস্থা চলত। অফিসাররা ও জওয়ানরা বেশির ভাগ সময় সীমান্ত বরাবর সময় কাটাত যেখানে স্বভাবতই কোনও পারিবারিক বাসা পাওয়ার উপায় ছিল না। বেশ কয় বছরের বিচ্ছিন্নতার পর তারা যখন তথাকথিত শান্তির স্টেশনে, যেমন আম্বালায়, পোস্টিং পেত তখন নিজেদের বাসা পাওয়ার জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হত দুই বা তিন বছর। যখন কোনও একজনের নাম উঠত বাসার বরাদ্দ প্রাপ্তির তালিকায় ততদিনে তার আরেক দফা সীমান্ত বরাবর পোস্টিং -এর আদেশ এসে পড়ত। এটা সাংঘাতিকভাবে মনোবল ভেঙে দিত। সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাপারটা উপস্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক সংকটের কারণে কখনও এতদুদ্দেশ্যে যথেষ্ট তহবিল পাওয়া যেত না।

সুতরাং জেনারেল কাউল চিন্তা করলেন স্বনির্ভর ভিত্তিতে কিছু একটা করা দরকার। তাঁর স্বভাবসুলভ উদ্দীপনা, শক্তি এবং রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তাঁর প্রভাবের বদৌলতে 'অমর প্রকল্প' বলে এক প্রকল্প নেওয়া হল এবং তিনি এটা রেকর্ড পরিমাণ কম সময়ে এবং স্বল্পতম খরচে শেষ করলেন। প্রয়াত শ্রী কৃষ্ণ মেনন যিনি তখনকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ছিলেন, এবং প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরু, ব্যাপারটা দারুণভাবে পছন্দ করেছিলেন।

তেমনি একটি প্রকল্প জম্মুতে শুরু করতে চাওয়া হল। জেনারেল মানেক্‌শ' ছিলেন সেখানে জেনারেল অফিসার কম্যান্ডিং (জিওসি)। সুতরাং জেনারেল মাকে্‌শ' আম্বালা আসলেন এ ব্যাপারে জেনারেল কাউলের সাথে পরামর্শ করতে। আম্বালায় অফিসারস মেসে এক ডিনার পার্টিতে কনিষ্ঠ অফিসারদের উপস্থিতিতে জেনারেল মানেক্‌শ' জেনারেল কাউলকে বললেন তাঁর সঙ্গে কমান্ড বদল করতে এবং বললেন– "আপনি বাড়ি বানাতে ওস্তাদ আর আমি প্রশিক্ষণে; আপনি জম্মুতে আমার কমান্ড নিন এবং বাড়ি বানান, আর আমি আপনার ডিভিশনের প্রশিক্ষণ দিই।" এসব কথা হালকাভাবে বলা হয়েছিল কিন্তু জেনারেল কাউল ছিলেন স্পর্শকাতর এবং সব ব্যাপারে সক্ষম হওয়ার জন্য গর্বিত ব্যক্তি। তিনি কথাটা হালকাভাবে নিলেন না। এতে দুই উর্ধ্বতন অফিসারের মধ্যে সংশোধনের অযোগ্য ভাঙনের সৃষ্টি হল যা পরে অনেক বিশ্রী জটিল ঘটনার জন্ম দিয়েছিল।

যুদ্ধের পরে ফীল্ড মার্শল করাচিতে হালকা চালে একটা কথা বলে ঝামেলায় পড়েছিলেন। তিনি নাকি পাকিস্তানিদের বলেছিলেন যে তারা এ যুদ্ধে জিততো যদি তিনি তাদের চীফ হতেন। এ কথার কিছু গুরুতরো ফল ফলেছিল দিলি-র রাজনৈতিক অঙ্গনে।

যা হোক, ১৯৭১ -এর ইন্দো-পাক যুদ্ধের ইতিহাস লেখার সময় যখন আসবে, আমার সন্দেহ নেই ফীল্ড মার্শাল মানেক্‌শ' কর্তৃক প্রদর্শিত নেতৃত্বের গুণাবলি সে ইতিহাসে এক উজ্জ্বল স্থান দখল করবে। যখন আর্মি, নেভি এবং এয়ারফোর্সের মতো তিনটি শক্তিশালী বাহিনীর একযোগে মসৃণভাবে কাজ করার ব্যাপার আসে তখন একজন শুধু দক্ষ নয় বরং সর্বাধিক কৌশলী এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর্মি চীফের প্রয়োজন হয় সমন্বয়ক হিশাবে। অন্যথায় কোনও সুফল আসতে পারে না। আমার মতে ফীল্ড মার্শলের সবচেয়ে বড় অর্জন ছিল অন্য দুই বাহিনীর চীফদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা।

দেশের ভাগ্য যে এয়ার মার্শাল পি সি লাল এবং অ্যাডমিরাল নন্দ তাঁদের নিজ নিজ পেশায় অতিশয় দীপ্তিমান হওয়া ছাড়াও ব্যক্তিত্বে ছিলেন সৌহার্দ্যপূর্ণ, কিন্তু স্যাম মানেক্‌শ' ছাড়া বেশ কয়েক বারই খারাপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারত।

ফীল্ড মার্শাল তাঁর ষাট বছর বয়সেও সুদর্শন এবং স্মার্ট। বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধে আর আকর্ষণশক্তিতে পূর্ণ। অকপটতা ও ন্যায়পরায়ণতা দ্বারা তিনি এমনকি নিজ প্রতিপক্ষকেও কাবু করে ফেলতে পারেন। তিনি সেই অল্পসংখ্যক ফীল্ড মার্শালদের একজন যারা নিজ ভুল স্বীকার করবেন এবং অন্যের গুণ কিছু থাকলে তার স্বীকৃতি দেবেন। কেউ কোনও দোষ করলে তার প্রতি তিনি সদয় থাকেন। এটা এমন একটা গুণ যা আমাদের পরিস্থিতিতে দীর্ঘকালে কোনও সুফল দেয় না। তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নেবেন। তিনি যত সহজে শত্রু বানান তত সহজে বন্ধু বানান। কোনও কোনও দিক দিয়ে তিনি সেইসব ব্রিটিশ জেনারেলের ছাঁচে পড়েন যারা নিশ্চয়ই তাঁর দীর্ঘ আর্মি ক্যারিয়ারকে প্রভাবিত করে থাকবেন। তাঁর ইংলিশ টাইপের চরিত্র ছিল, যেমন সময়ানুবর্তিতা, সঠিক পোশাক, মেসের ভদ্রতা, বিশ্বস্ত অধস্তনদের সঙ্গে সমপর্যায়ের মতো ব্যবহার করা এবং তাঁদেরকে তাঁদের মতামত প্রকাশ করার সম্পূর্ণ সুযোগ দেওয়া। এটা তাঁকে যাদের তাঁর কাছে যাওয়ার সহজ সুযোগ ছিল তাদের দ্বারা সহজে প্রভাবিত হওয়া সম্ভব করে তুলত। আমার দৃষ্টিতে এটা ছিল তাঁর একটা দুর্বলতা যা তাঁকে অন্যদের ব্যক্তিত্বের ব্যাপার ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করত।

বাংলাদেশের অপারেশনের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী ডিপি ধর -এর সাথে তার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে আমি একবার তাঁকে মন্ত্রীর পিঠ চাপড়ে দিতে দেখেছিলাম। এতে আমি একটু কেঁপে গিয়েছিলাম কারণ একজন মন্ত্রীর সাথে কোনও সার্ভিস চীফের এতটা সহজ হওয়া আমি কল্পনা করতে পারিনি। প্রয়াত শ্রী এলএন মিশ্রও তাঁর খুব বড় বন্ধু ছিলেন এবং তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে খুব সহজ ছিলেন।

ফীল্ড মার্শালের সঙ্গে আমি একটা ভাল সংযোগ স্থাপন করেছিলাম কিন্তু পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতর তা বরবাদ করে দেওয়ার কোনও সুযোগই নষ্ট করত না।

বাংলাদেশ অপারেশনস -এর সময়ে আমি ছিলাম দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের অধীনে–একদিকে ফীল্ড মার্শাল, অন্যদিকে রাজনৈতিক। ফীল্ড মার্শাল গোটা পরিস্থিতি অতিশয় ভালভাবে বুঝতেন এবং আমার সংগঠনগুলিকে -এজিববাহিনীকে ও পরে বিশেষ সীমান্ত বাহিনীকে (Special Frontier Force) তাঁর পরিকল্পনার অঙ্গ করে নিয়েছিলেন যাতে করে তিনি অংশগ্রহণকারীদের বিশেষ চরিত্র ঠিক রেখেই এই আন্‌কন্‌ভেনশনাল সেট আপ থেকে সর্বাধিক সুবিধা বের করে নিতে পারেন। ধর এবং মিশ্র, এই দুই মন্ত্রীই প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এটা জেনারেল মানেক্‌শ'র জন্য বিরাট রাজনৈতিক সহায়তা নিশ্চিত করেছিল এবং বাংলাদেশ বিজয়ের পর তাঁকে সংগতভাবে ফীল্ড মার্শাল র‍্যাংক দেওয়া হয়েছিল। আমি মনে করি তাঁর এই র‍্যাংক অর্জন করার জন্য যোগ্যতা ছিল সুপ্রচুর। তাঁর সামরিক নেতৃত্বে আমাদের এক হাজার বছরের

ইতিহাসে প্রথম এমন মাপের এক বিজয় আমরা অর্জন করেছিলাম যা শুধু এশিয়ার নয় বরং সারা বিশ্বের গোটা শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং শান্তির প্রক্রিয়া এমনভাবে অগ্রসরমান করে দিয়েছিল যার স্বপ্ন দেখারও কোনও অধিকার আগে আমাদের ছিল না। গোটা বিশ্ব আতঙ্কে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইতিহাসের গতি পরিবর্তনের শেষ চেষ্টা নিয়েছিলেন তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সপ্তম নৌবহর আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার ভয়াবহ হুমকি দিয়ে, যদিও তাতে আমরা সংকল্প থেকে টলিনি। ঐ সময় আমরা জানতাম না যে সোভিয়েত নৌবহর মার্কিন সপ্তম নৌবহরের ছায়ানুসরণ করছিল এবং নিক্সন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিতে পারেননি। এই মহৎ উদ্যোগ দ্বারা রাশিয়া ভারতীয় জনগণের ভালবাসা অর্জন করল। কিন্তু আমি গল্পের অনেক সামনের দিকে এসে পড়েছি। ■

অধ্যায়—৫

মুক্তিবাহিনী এবং মুজিববাহিনী

গোলমালটা কোথায়

আর্মির দ্বারা সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত মুক্তিবাহিনী ছিল এক সাংঘাতিক শক্তি। তাদের সংখ্যা ছিল বহু হাজার। বিদ্রোহে যোগ দেওয়া ঈস্ট বেংগল রাইফেল ব্যাটালিয়ানগুলি আগে থেকে ছিল সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত। তারা এক সর্বোপরি পরিকল্পনার মধ্যে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের সমগ্র সীমান্তজুড়ে মুক্তিবাহিনীর লোক ছিল, তারা ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে সহায়তা দিত। এই বিএসএফ আগে ঐ মুক্তিবাহিনীর লোকদের প্রশিক্ষণে সাহায্য করেছিল। সীমান্ত রক্ষার কাজে থাকা ছাড়াও সীমান্ত বরাবর তাদের ঘাঁটির কাছাকাছি পাক শত্রু অবস্থানগুলিতে তারা আক্রমণ করছিল। তবে তাদের সীমিত প্রশিক্ষণের কারণে ভালভাবে প্রস্তুত পাক অবস্থানের বিরুদ্ধে কমান্ডো আক্রমণের জন্য তারা তেমন সজ্জিত ছিল না এবং প্রায়ই তাঁরা দারুণভাবে হতাহত হচ্ছিল। কিন্তু অ্যাকশনের ব্যাপারে তাদের নিজেদের তুমুল আগ্রহ ও উচ্চতর কমান্ডের নিরবচ্ছিন্ন চাপ তাদের বেগমাত্রা বজায় রাখছিল। গেরিলা পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বল্প-জ্ঞান-সম্পন্ন সামরিক কমান্ড প্রায় ২০০ সদস্যের মুক্তিবাহিনী গ্রুপ গঠন করে গ্রুপগুলিকে বাংলাদেশ অঞ্চলের গভীরে পাঠিয়ে দিত এবং তাদের বলে দিত যত বেশি লম্বা সময় সম্ভব সেখানে থাকতে। উদ্দেশ্য ছিল বেসামরিক জনসাধারণকে সব রকমের সম্ভব পন্থায় শত্রুকে প্রতিরোধ করতে উৎসাহিত করা। প্রায়ই এই কৌশল ঠিক উল্টা ফল অর্জন করত। ছোট ছোট গ্রামের অল্প লোক সামান্য সম্বল নিয়ে দুইশত অতিরিক্ত মানুষের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে উঠতে পারত না; তাদের সামান্য সম্বল তাদের নিজেদের জন্যই যথেষ্ট ছিল না। পাক সামরিক আইন প্রশাসক সব সময় ও-রকম বড় সংখ্যক আগন্তুকের খবর জেনে ফেলত এবং মুক্তিবাহিনীর দলটি ঐ স্থান ত্যাগ করার পর বাহিনীর ছেলেদের খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রচণ্ডভাবে ঐ গ্রামের অধিবাসীদের উপর চড়াও হত। প্রতিশোধ হিশেবে অনেক গ্রামবাসীকে গুলি করা হত এবং বাকিরা তাদের প্রাণ হারানোর আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। এর ফলে মুক্তিবাহিনীই কতগুলি এলাকায় জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছিল।

যারা এই নিষ্ফল লোকবল হারানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত সামরিক টেকনিক প্রয়োগ করা হত। তাদের মধ্য অনেক ভাল লোক প্রভাব হারিয়ে ফেলল এবং তাদের অন্য প্রশংসাযোগ্য কাজের কোনও স্বীকৃতি রইল না। জেনারেল মানেক্‌শ'র আস্থাভাজন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরা, অনেক স্পর্শকাতর ইস্যুকে

কর্কশভাবে মাড়িয়ে যান এবং আমাদের চূড়ান্ত সাফল্য ভারতের জন্য অনেক ক্ষতিকর হয়ে থাকতে পারে এমন অনেক ভুল পদক্ষেপকে বিস্মৃতির মধ্যে ঠেলে দেয়। জনাব তাজউদ্দিন ও শ্রী ডি পি ধর -এর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সংযোগও তাঁকে অনেক সুবিধা দিয়েছিল।

যুবনেতারা বাংলাদেশের ভিতরে তাদের বিস্তৃত সংগঠনের বদৌলতে জানতে পেরেছিলেন যে কিছু মুক্তিবাহিনী ইউনিট কিছু বদ অভ্যাস রপ্ত করেছে, যাদের মধ্যে কতকে সাধারণ জনগণের ওপর লুটতরাজ করেছে এবং তাদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চালিয়েছে, অন্যেরা ব্যক্তিগত শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। আগেই যেমন বলা হয়েছে, মুক্তিবাহিনীতে সব রকমের লোককে রিক্রুট করা হয়েছিল এবং যদিও একটি ফোর্স হিশাবে মুক্তিবাহিনী চমৎকার কাজ করেছিল, তবু মুক্তিবাহিনীর মধ্যে কেউ কেউ ছিল নিন্দনীয় এবং তারা গোটা ফোর্সের দুর্নাম সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং যুবনেতাদের জোরালো বিশ্বাস ছিল তাদের ফোর্সের, যার বাছাই করা গেরিলা নেতারা প্রত্যেকে তাঁদের ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত, নাম হওয়া উচিত মুজিববাহিনী যাতে তাকে 'মুক্তিবাহিনী' থেকে আলাদা করে চেনা যায়।

তাদের আরেকটা যুক্তি ছিল যে বাংলাদেশে "মুজিববাহিনী" নামটার গ্রহণযোগ্যতা হবে অপরিসীম এবং এটা শুধু তাঁদের সংগঠন থেকেই সব রকম সহায়তা বয়ে আনবে না, বরং সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও সব রকম সহায়তা বয়ে আনবে। আমি মনে করি শেখ মুজিবের প্রতি তাঁদের উচ্চতর আনুগত্য তাঁদের "মুজিববাহিনী" নামটা পছন্দ করার ব্যাপারে কম দায়ী ছিল না।

আমরা গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশলের ওপরে প্রায় ১০ হাজার মুজিববাহিনী নেতাকে প্রশিক্ষণ দিলাম। কথা ছিল তারা এরপরে তাদের গোটা সংগঠনকে বাংলাদেশের ভিতরে প্রশিক্ষণ দেবে; মোটের উপর এই প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা দাঁড়াবে লক্ষ লক্ষ। সেটা ছিল একটি প্রতিষ্ঠিত ও নির্ভরযোগ্য সংগঠন এবং আমরা পরে জেনেছিলাম তার নেতারা শুরুতে শেখ মুজিবের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং এরা তাঁর পূর্ণ আস্থাভাজন ছিলেন। এর মানে ছিল যে তারা গোটা জাতির আস্থাভাজন ছিল।

আমি যখন এই বিশেষ ফোর্সের নাম "মুজিববাহিনী" দেওয়ার কথা বললাম, উচ্চতর কমান্ড তা গ্রহণ করলেন না। তাঁদের মতে এটা বাংলাদেশের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করবে এবং সম্ভবত মুজিববাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে একটা ক্ষতিকর ভাঙন সৃষ্টি করবে। আমি যুবনেতাদেরকে এ সিদ্ধান্ত কবুল করাতে পারলাম না। তাঁরা বলে দিলেন– যে যা-ই বলুক না কেন এই ছেলেরা বাংলাদেশের মধ্যে মুজিববাহিনী নামেই পরিচিত হবে। এতে আমার তরফ থেকে আর যুক্তিতর্কের অবকাশ রইল না। কিন্তু আর্মির উচ্চতর

কমান্ড একটা আলাদা সংগঠনের অস্তিত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না, তা সে সংগঠনের অভীষ্ট যা-ই হোক না কেন। শুধু তার নাম নয়, তার আলাদা অস্তিত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ল। লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরা বললেন জনাব তাজুউদ্দীন জানতে চাচ্ছেন কারা কারা কিসের লক্ষ্যে এই সংগঠন খাড়া করছে। সে হচ্ছে অতিশয় নিবেদিতপ্রাণ যুব-নেতৃত্ব যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আওয়ামী লীগের যুব সংগঠনকে শক্তিশালী করতে ও দেশটির মধ্যে গেরিলা কার্যক্রম চালাতে চাচ্ছে। আমার এই ব্যাখ্যা তাঁকে সন্তুষ্ট করল না। তাঁর মনে বদ্ধমূল ছিল সবকিছু নিজের কমান্ডের অধীনে রাখার ইচ্ছা, সুতরাং সকল যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল। চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল মানেক্‌শ' স্বাভাবিকভাবেই তাঁর উপদেশ গ্রহণ করে চলতেন এবং একবার কলকাতায় তিনি আমার সঙ্গে খুবই কাটখোট্টা রকমের ব্যবহার করেছিলেন। আমি বুঝতে পারছি কেউ তাঁকে বলেছিল আমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে যুবনেতাদের ব্যবহার করে আমার ব্যক্তিগত কমান্ডের অধীনে একটা আর্মি খাড়া করছি। সংশি-ষ্ট সকলের দ্বারা অনেকগুলি চেষ্টা হয়েছিল যুবনেতাদেরকে চাপ দিয়ে তাঁদের পরিচিতি মুক্তিবাহিনীর মধ্যে মিলিয়ে দিতে অথবা অন্ততপক্ষে আদেশ নির্দেশ আমার মাধ্যমে না নিয়ে সরাসরি আর্মি হাই কমান্ডের কাছ থেকে তা নিতে। তাঁরা তাতে সোজাসুজি না করে দিলেন। এ ধরনের চাপের প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের দৃঢ় ও বিরূপ মনোভাব নিশ্চয়ই এই লক্ষ্য আরও কোনও প্রচেষ্টার মুখে ছাই দিয়ে দিয়েছিল। তবে আমার ওপর নিরবচ্ছিন্ন চাপ প্রয়োগ হতে লাগল কারণ আমি সার্ভিসে ছিলাম।

এ বিরোধ বন্ধের চূড়ান্ত চেষ্টায় আমি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরার সঙ্গে দেখা করলাম মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর দায়িত্বের ভাগাভাগি চূড়ান্ত করার জন্য। তিনি বললেন সীমান্তের ২০ মাইলের মধ্যে সব রকমের হানার ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তিবাহিনীর আর অভ্যন্তরের গভীরের দায়িত্ব মুজিববাহিনীর। যুবনেতারা এটাই চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি চাইলেন তাঁরা তাঁর কমান্ডের অধীনে কাজ করবেন যা তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না।

আরেকটা ব্যাপার ঠিক করা দরকার ছিল– আর্মির সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিবাহিনী যে সীমান্ত রেখাজুড়ে ছিল তা পাড়ি দেওয়ার পদ্ধতি কী হবে।

আমরা কতগুলি বিস্তৃত করিডোর গড়ে তুলেছিলাম সারা বাংলাদেশজুড়ে। অনেক নিরাপদ বাড়ি ছিল অবস্থানের জন্য, আর মুজিববাহিনীর ছেলেদের তাদের পুরনো সংগঠনের মাধ্যমে চমৎকার যোগাযোগ ছিল একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত। তারা ইচ্ছামতো যেতে ও আসতে পারত।

লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরা আমাদের ছেলেদের সীমান্ত অতিক্রমণের জায়গাগুলি,

তারা কোন পথে আসা যাওয়া করে, তাদের নিরাপদ বাড়িগুলি ও তাদের গন্তব্য সম্বন্ধে জানার জন্য জেদ ধরলেন। যুবনেতাদের কোনও অসুবিধা ছিল না সীমান্ত অতিক্রমণের স্থানগুলির কথা বলতে, যাতে আর্মি ইউনিটগুলিকে সীমান্ত অতিক্রমণের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া যায়। কিন্তু তাঁরা তাদের করিডোরসমূহ, নিরাপদ বাড়িগুলি এবং গন্তব্যগুলির কথা বলে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তাঁরা অনেক মুক্তিবাহিনী নেতার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন না এবং তাদের মধ্যে অনেকে তাঁদের রাজনৈতিক শত্রু ছিল।

সে সব কথা আর্মি ফর্মেশনগুলিকেও জানানো যেত না কারণ মুক্তিবাহিনী ছিল তাদের কমান্ডে এবং তারা নিশ্চয়ই পুরা জিনিশটা মুক্তিবাহিনীর কাছে প্রকাশ করে দিত।

সাংঘাতিক কষ্টে এই আপশ -ঐীমাংসায় সম্মত হওয়া গেল যে মুজিববাহিনীর নেতারা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের জায়গাটা প্রকাশ করবে স্থানীয় আর্মি ইউনিট কমান্ডারদের কাছে, যারা তাদেরকে প্রবেশ করতে দেবে। এই ব্যবস্থার কথা কমান্ড সদর দফতর সকল আর্মি ইউনিটকে জানিয়ে দেবে। আমরা কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম যাতে সকল আর্মি ইউনিট এই ব্যবস্থার কথা জানতে পারে। ইতিমধ্যে আমরা লিয়াযোঁ স্থাপন করলাম লোকাল ফর্মেশন এবং ইউনিট কমান্ডারদের সাথে এসএফএফ -এর আর্মি অফিসারদের মাধ্যমে, যাঁরা লিয়াযোঁ অফিসার নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এসএফএফ -এর লেফটেন্যান্ট-কর্নেলরা সীমান্ত বরাবর স্থিত হয়েছিল ভারতীয় আর্মির সঙ্গে লিয়াযোঁ সহজতর করার জন্য। যখন আমি রিপোর্ট পেলাম যে লিয়াযোঁ স্থাপিত হয়েছে কিন্তু তখনও আর্মি কমান্ড তাদের ইউনিটগুলিকে কোনও নির্দেশাবলি তখনও জারি করেনি, তখন আমি ব্যাপারটা আবার চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল মানেক্‌শ'র কাছে পাঠালাম। যখন জেনারেল মানেক্‌শ' লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরার কাছে জানতে চাইলেন তিনি আদেশ জারি করেছেন কি না এবং লিয়াযোঁ ঠিকমতো স্থাপিত হয়েছে কি না, তিনি বললেন যে আমার কোনও অফিসার তাঁর কমান্ডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি এবং তিনি তাঁর কমান্ডের অধীন সমস্ত ফর্মেশনকে ইতিমধ্যে আদেশ জারি করেছেন। আমি যখন জেনারেল মানেক্‌শ'কে আমার অফিসারদের লিয়াযোঁ সফরের ঠিক ঠিক তারিখ ও সময় জানালাম, আর্মি চীফ বেশ বিস্মিত হলেন এবং লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরাকে আবার জিজ্ঞেস করে নিশ্চিতি পেলেন যে আমার অফিসাররা তাঁর কমান্ডারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কিন্তু তাঁকে তা জানানো হয়েছিল না।

এ একটা ছোট্ট সামান্য ঘটনা এবং আমি এটা উলে-খ করতাম না কিন্তু উলে-খ করলাম এই জন্য যে পরে আমরা আবিষ্কার করেছিলাম কমান্ড সদর দফতরের স্টাফ ইচ্ছাকৃত

প্রচেষ্টা নিয়েছিল মুজিববাহিনী সম্পর্কিত ঘটনাবলি আর্মি চীফের কাছে মিথ্যাভাবে উপস্থাপন করতে। এর ফলে আমার বহুবার আর্মি চীফের ডিরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস এবং স্বয়ং আর্মি চীফের সঙ্গে মুজিববাহিনী সম্পর্কে সমগ্র সত্য ব্যাখ্যা করার জন্য সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল। মেজর জেনারেল কেকে সিং, (পরে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এবং আর্মি কমান্ডার) তিনি ডিরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস (ডিএমও) হিশাবে কাজ করছিলেন। তিনি একজন অতিশয় মেধাবী অফিসার ছিলেন। তিনি মুজিববাহিনী কার্যক্রমের রাজনৈতিক সংশে-ষ এবং তাদের উচ্চ সম্ভাবনা বুঝলেন। তিনি ওখানে থেকে অনেক কাজে এসেছিলেন। পরে মেজর জেনারেল গিল তাঁর জায়গায় আসেন জেনারেল কেকে সিং যুদ্ধে একটা আর্মারড ডিভিশন কমান্ড করার দায়িত্ব পাওয়ার পর, যেখানে তিনি অজস্র সম্মানসূচক পদক লাভ করেন। নতুন ডিএমও একজন দুঃসাহসী প্যারাট্রুপার ছিলেন। তিনি তাঁর নতুন অফিসের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বেশি সময় নেননি এবং দু'একটা ঘটনা ছাড়া আমাদের মধ্যে বোঝাপড়া বেশ ভালই ছিল। আমার ফোর্স যুদ্ধে সম্মানজনক জয় লাভ করার পরে তাঁর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল।

জেনারেল কেকে সিং আর্মি চীফের পক্ষ থেকে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরাকে অত্যন্ত প্রাঞ্জল নোট পাঠিয়ে মুজিববাহিনীর কমান্ড ও কন্ট্রোল কী হবে এবং এই ফোর্স -এর ওপর কী কাজের দায়িত্ব দেওয়া যাবে তা বিশদ জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই নোট সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ সব সময় লেগে ছিল এবং এড়ানো যেত এমন হৃদয়-যন্ত্রণা ভুগতে হয়েছিল।

যে কোনও যুদ্ধে আর্মি কমান্ডারদের এমন সব এজেন্সির সহযোগিতামূলক কাজের সদ্ব্যবহার করতে হয় যারা তাদের সরাসরি কমান্ডের অধীনে নয় কিন্তু নিজ নিজ নেতৃত্বের অধীনে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যায় সাধারণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে। আর্মি কমান্ডারের যা থাকা দরকার তা হচ্ছে বিস্তৃত দৃষ্টিকোণ আর এমন এক অন্তর্গত আকর্ষণী শক্তি যা এসব আর্মি-বহির্ভূত লোকদের কাছ থেকে সবচেয়ে ভাল কাজ বের করে নিয়ে আসতে পারে।

একথা বললে যথাযথ সুবিচার করা হবে যে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরার সাথে বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় আমি দেখেছি একমাত্র এই মুজিববাহিনীর কমান্ড ও কন্ট্রোল -এর ইস্যু ছাড়া আর সব ব্যাপারে তিনি ছিলেন বেশ যুক্তিপূর্ণ। তাঁর চীফ অব স্টাফ জেনারেল জ্যাকব একজন অত্যন্ত দক্ষ ব্যক্তি এবং আমার একজন বন্ধু। যে সব গোলমালের কথা বলা হল তার উৎপত্তি আমার কাছে রাজনৈতিক বলেই মনে হয়েছিল। এ সবের জন্য এ দুজন অফিসারকে দোষ দেওয়া যায় না। ■

অধ্যায়—৬

পাকিস্তানি সৈন্যরা কেমন অধঃপাতে গিয়েছিল

২৫ মার্চ ১৯৭১ -এর পরে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের দ্বারা অনুষ্ঠিত নৃশংসতার ধরন দেখে ব্যক্তিগত স্যাডিয্‌ম্‌-কে তার উৎস বলে শনাক্ত করা যায় না। সেসব নৃশংসতা ছিল অত্যন্ত ঘন ঘন সংঘটিত, সংখ্যায় অত্যন্ত বেশি এবং পাকিস্তানি আর্মির অজস্র লোক তাতে সংশি-ষ্ট ছিল। পাকিস্তানি আর্মির অফিসার ও জওয়ানদের বিভাগ-পূর্ব সময়ে আমার চেনা ছিল। তাদের ব্যবহার সততাপূর্ণ, ঋজু এবং পেশার উপযুক্তই ছিল। তারা এসেছিল ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদের পরিবার থেকে এবং তাদের হিন্দু ও শিখ সহকর্মীদের মতোই তাদেরও স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তাদের মধ্যে কিছু কিছু এমন ছিল যারা যে কোনও সম্প্রদায়ের একজন নিরপরাধ নারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে খুশিমনে নিজের জীবন দিয়ে দিতে পারত। অতঃপর তাদেরকে যখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানের বাংলাদেশে) তার প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত করা হল তখন গোটা পাকিস্তানি আর্মির ক্ষেত্রে কী অঘটন ঘটল। প্ররোচনা যেমনই হোক, একটা গোটা ফোর্স নিশ্চয়ই এমন উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে না। প্রত্যেকটা অফিসার ও জওয়ান একযোগে অমন মারমুখো (trigger-happy) হয়ে উঠতে পারে না, এবং মেয়েদেরকে তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে, যেন ড্রিল করছে এমনভাবে, বলাৎকার করা, যৌন লিপ্সা পরিতৃপ্ত করার জন্য অবশ্যই হতে পারে না। এমনকি মানুষ রূপে যারা জানোয়ার, তারাও এমন পাশবিকতা উপভোগ করতে পারে না। সাধারণত অতীব ভদ্র আচরণপূর্ণ এই ফোর্সের এই বিচ্যুতির ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছাড়া আর একমাত্র কারণ যতদূর দেখা যায় তা হচ্ছে রাজনেতিক মতান্ধ শিক্ষা। এর সঙ্গে যোগ করা যায় কতক উর্ধ্বতন অফিসারের নিজেদের জীবনের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করার জন্য প্রকাশিত নির্বোধ ধর্মান্ধতা ও স্বার্থপর অত্যুৎসাহিতা। সন্ত্রাসের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বাগে আনার জন্য ইয়াহিয়া খান জেনারেল টিক্কা খানকে বাছাই করেন যখন কিনা তাঁর ক্ষয়ে যাওয়া সামরিক মস্তিষ্কে এর চেয়ে ভাল কোনও চিন্তা আসছিল না।

কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়া খান আকস্মিক রোষভরে এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এমনটি হতে পারে না। ইতিপূর্বে সমগ্র পাকিস্তানকে তিনি বলেছিলেন যে শেখ মুজিব ভবিষ্যতে প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। ঐ দেশটির প্রথম নির্বাচনে শেখ যে বিপুল সমর্থন লাভে সক্ষম হন, তার ফলে ইয়াহিয়া এই বিবৃতি দিয়েছিলেন এবং শেখের নেতৃত্বে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রূপরেখা কেমন হবে তা আলোচনা করার কথা বলে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন।

স্পষ্টতই পরিকল্পনাটা তা' দিয়ে ফুটানো হয়েছিল সেইসব বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের অনুরোধে যাঁরা পাকিস্তানে কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করতে চাইছিলেন। এই অতি জঘন্য পরিকল্পনার পিছনে যাঁর চিন্তা প্রধানত কাজ করেছিল সে হচ্ছে পাকিস্তান পিওপ্‌ল্'স পার্টি'র প্রধান জনাব ভুট্টো। পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে তিনি ভাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন, যদিও তা শেখ মুজিবের পাওয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার মতো অমন বিপুল ছিল না। পাকিস্তানের একনায়ক রাষ্ট্রপতি হতে জনাব ভুট্টোর উচ্চাভিলাষ মাটিতে আছড়ে পড়েছিল জনসাধারণের কণ্ঠ উচ্চকিত হয়ে ওঠা মাত্র। যে কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই এই ফলই হত।

জনাব যেডএ ভুট্টোই আবার সামরিক আইন জারি করে বেলুচিস্তানের মুসলমান ভাইদের কসাই হিশাবে কুখ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে পাঠানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রয়োজন ছিল একজন ধর্মান্ধ সৈনিকের যার কাছে "ইসলাম বিপন্ন" এই আওয়াজটিই যথেষ্ট হত নিরপরাধ স্বধর্মীদের ওপর জঘন্য হত্যালীলায় নিয়োজিত হওয়ার সময় বিবেকের কণ্ঠ শ্বাসরুদ্ধ করার জন্য। সেই নিরপরাধ স্বধর্মীদের একমাত্র দোষ হল তারা সমান বলে গণ্য হতে চেয়েছিল, একটা রাষ্ট্রের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হতে নয়, যে রাষ্ট্রের জন্য তারাই তাদের পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের তুলনায় অনেক বেশি আত্মত্যাগ করেছিল। সমস্ত প্রাপ্তব্য নিদর্শন দেখায় যে, বহু চিন্তাভাবনা করে পরিকল্পনাটা করা হয়েছিল যার অনেক কিছুই চেঙ্গিস খানের ওপর লিখিত বই থেকে নেওয়া।

ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পৌঁছলেন এবং দেখালেন যেন সমস্যার একটা ন্যায়সম্মত মীমাংসার জন্য আলোচনা চালাচ্ছেন। তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করলেন। শেখ মুজিব, যেমন আশা করা গিয়েছিল, তাঁর নীতিতে অনড় রইলেন। ইতিপূর্বেই জেনারেল টিক্কা খানকে সামরিক আইন প্রশাসক হিশাবে পাঠানো হয়ে গিয়েছিল। তাঁর এই অফিস গ্রহণের আগে যে শপথ বাক্য পাঠের প্রয়োজন হয় তা তাঁকে পাঠ করাতে বাংলাদেশের কেউই রাজি হননি। এটা দেখায় সামরিক আইন প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কতদূর ব্যাপক হয়েছিল। ইসলামাবাদে খবর পৌঁছল যে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। শেখ মুজিবের ন্যূনতম দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন যাতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপার ছাড়া আর সব ধরনের ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু এই আনুকূল্যটুকু মঞ্জুর করার বিন্দুমাত্র ঝোঁক সেই সাম্প্রদায়িক একনায়কত্বের ছিল না। জনাব ভুট্টোর উচ্চাভিলাষ বাধার সম্মুখীন হয়েছিল। সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সাম্প্রদায়িকতার আগুন আরও বেশি উস্কে দেওয়ার পথ গ্রহণ করলেন। তাতে করে তিনি সামরিক শক্তির প্রধান পীঠস্থান পাঞ্জাবে আরও বেশি

জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন। সেখানে চিৎকার উঠল– "সকল বিচ্ছিন্নতাবাদীকে হত্যা করো। তাদেরকে একটা শিক্ষা দাও। মুজিব একটা ভারতীয় এজেন্ট। সকল বাঙালিই হিন্দু। তারা সবাই ষড়যন্ত্রকারী, তারা নিকৃষ্ট জাতি। সত্যিকার মুসলমান হওয়ার জন্য তাদের নতুন রক্ত দরকার, রাজকীয় পাঞ্জাবি রক্ত দরকার। জেনারেল টিক্কা খানকে সেখানে পাঠাও।"

জেনারেল টিক্কা খানকে শুধু জেনারেল ইয়াহিয়া খান বোঝালেন না, বোঝালেন জনাব ভুট্টোও, যিনি ইসলামের নয়া রক্ষাকর্তা হিশাবে জনপ্রিয়তার ঢেউ -এর চূড়ায় ওঠে বসেছিলেন। পর্যায়ক্রমে জেনারেল টিক্কা বোঝালেন আর্মি সিনিয়র কমান্ডারদেরকে এবং এমন এক দল অফিসারকে বেছে নিলেন যারা একটা মুসলিম আর্মি কর্তৃক একটা মুসলিম জনগণের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। সে দেশের সবাই হিন্দুদের ওপর হত্যাযজ্ঞটা ভালই বুঝত কিন্তু অল্প কতকেই বুঝত কেন ঠাণ্ডা মাথায় সব মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে হবে, কেন সব মুসলিম যুবতি-কিশোরীদেরকে বলাৎকার করতে হবে, যেটা হবে যৌনলিপ্সা পরিতৃপ্তির ব্যাপার নয় বরং ধর্মীয় কর্তব্যের ব্যাপার, নীল-রক্তের এক নতুন প্রজন্ম উৎপাদন করার জন্য।

অনেক পদকে ভূষিত লেফটেন্যান্ট-জেনারেল নিয়াযি একজন দৃঢ়চেতা কমান্ডার হিশাবে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচিত হলেন। তিনি বেসামরিক জনগণের ওপর পাইকারি হত্যালীলা চালানোর পলিসি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালাতে এবং শেষটায় সেই হত্যালীলার শিকারদের সাহায্যে আসা ভারতীয় আর্মির সঙ্গে শেষ সৈন্যটি নিহত হওয়া পর্যন্ত শেষ রাউন্ড পর্যন্ত যুদ্ধ চালাতে পারবেন।

আপশ -রীমাংসার জন্য আলোচনার মিথ্যা ভড়ং -এর আড়ালে জাহাজের পর জাহাজ ভর্তি সৈন্য পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে এসে পৌঁছল। বিপুল সংখ্যক বেলুচ ও পাঠান আধা-সামরিক লোক আনা হল শুধু তাদেরকে বাঙালি নারীদের ওপর লেলিয়ে দিতে নয় বরং তাদের এও বুঝিয়ে দিতে যে তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার দাবি করতে থাকলে কিরূপ ফল তারা ভোগ করবে।

'ইসলাম' (পাঞ্জাবে যেমন বোঝাত) -এর স্বার্থে বাংলাদেশের তরফ থেকে আরও বেশি আত্মত্যাগের জন্য আবেদন করে যে সকল ভাবপ্রবণ যুক্তি হাজির করা হচ্ছিল তা সব শেখ সাহেব চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন কোনও কারণ ছাড়াই ভুট্টো ঢাকায় এসে উদিত হলেন। আসলে তিনি এসেছিলেন সামরিক আইন প্রশাসক ইয়াহিয়া খানের দোদুল্যমান চিত্তে শক্তি জোগাতে এবং মুজিবের মতো গণ্ডগোল সৃষ্টিকারীদের কিভাবে শায়েস্তা করা যায় তার পরামর্শ দিতে।

সকল প্রস্তুতি যখন শেষ তখন জেনারেল টিক্কা চট্টগ্রামের নিরস্ত্র শ্রমিকদের ওপর গুলি

চালিয়ে স্পষ্ট করে দিলেন তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে কতটা পরিষ্কার। দিনটা ছিল ২৩ মার্চ, সমস্ত আলোচনা আকস্মিকভাবে বন্ধ করে দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া যেদিন বিমানযোগে ইসলামাবাদের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন তার ঠিক এক দিন আগে। শত শত শ্রমিককে হত্যা করা হল। তাদের মরদেহ কবরস্থ হল না, খোলা জায়গায় পড়ে রইল পচার জন্য।

ঢাকা ত্যাগের আগে ভূট্টো, টিক্কা ও তার দলবলের এ ধরনের কাণ্ড দেখে এতটা সন্তুষ্ট হলেন যে তিনি বলেছিলেন—"খোদাকে ধন্যবাদ। পাকিস্তান রক্ষা পেল।"

আমি আশা করি একদিন বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত নৃশংসতার এক প্রকৃত সত্য ও ভাল রকম দলিলাদি সংবলিত প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। শেখ মুজিব একজন মহান রাষ্ট্রনেতার মতো এবং পরম বদান্যতায় শুধু যে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে মুক্তি দেওয়ায় সম্মত হয়েছিলেন তাই নয়। এমনকি তাদের মধ্যকার ৯৩ জন মহা-অপরাধীকেও ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিলেন যারা এমন অমানবিক কদাচারে নিজেদেরকে ঢেলে দিয়েছিল যা হয়তো এমনকি বর্বর জাতিসমূহের প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা যায় না।

মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের চোখে দেখা নৃশংসতার যে বিবরণ প্রায়ই দিত তেমন কিছু ব্যাপার এখানে নমুনা হিশাবে তুলে দেওয়া হচ্ছে। আরও বেশি বেদনাদায়ক স্যাডিস্ট কার্যকলাপের বিবরণ, যদিও তারও চোখে দেখা সাক্ষী বর্তমান, এখানে দেওয়া হচ্ছে না যেহেতু উদ্দশ্য হচ্ছে এই শোকাবহ ব্যাপারের কারণ উদ্ঘাটন করা, বাংলাদেশিদেরকে এবং বিবেকসম্পন্ন অন্য মানুষদেরকে তীব্র মর্মবেদনা দেওয়া নয়।

প্রথম বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ২৩ মার্চ ১৯৭১ তারিখে জেনারেল ইয়াহিয়া যেদিন ইসলামাবাদে ফিরে যাওয়ার জন্য বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করলেন তার একদিন আগে। ঐদিন হাজার হাজার মানুষ চট্টগ্রাম বন্দরের কাছে সমবেত হতে শুরু করেছিল। তারা ছিল প্রধানত নিরীহ গ্রামীণ মানুষ। জমায়েত নিষিদ্ধ করে কোনও সরকারি আদেশ তখন ছিল না। কোনও রকম পূর্ব সংকেত ছাড়াই তাদের ওপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলি হল। এবং শীঘ্রই পুরা এলাকাটা মৃতদেহে ভরে গেল। পরে মৃতের সংখ্যা দেখা গেল চার হাজারের উপরে। লাশগুলি সাগরে ছুড়ে ফেলা হয়েছিল।

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে সোজা চলে গেল জগন্নাথ হলে, যেটা ছিল হিন্দু ছাত্রদের হোস্টেল। এক শ'র বেশি ছাত্রকে তাদের কক্ষে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হল। পরদিন সকালে আর্মি ইউনিটগুলি আবার আসল। আগের দিন যারা আহত হয়েছিল তাদেরকে তারা একত্র করল। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ডক্টর জিসি দেব-ও ছিলেন। তাদেরকে তারা

হুকুম করল বিভিন্ন কক্ষে যেসব মৃতদেহ ছিল সেসব হলের অঙ্গনে একত্রে জড়ো করতে। রক্তাক্ত পঙ্গু মানুষগুলির জন্য এ ছিল এক কঠিন ও বেদনাদায়ক কাজ কিন্তু তবু তাদের তা করতে হল। কাজটা করা হয়ে গেলে ডক্টর জিসি দেব সহ আহত সকলকে মৃতদেহগুলির কাছাকাছি লাইন দিয়ে দাঁড় করানো হল এবং নিষ্ঠুরভাবে গুলি করে হত্যা করা হল। তারা সবাই ছিল হিন্দু। হিন্দুদের হত্যাকারীদেরকে মুসলমানদের ঈশ্বর পুরস্কৃত করেন বলেই ঐ হত্যাকারীদের বিশ্বাস ছিল।

২৫ মার্চ ঢাকা নিউমার্কেটের নিকটস্থ বাবুপুরা বস্তির সকল ঘর আগুনে-বোমা দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এ বস্তির বাসিন্দাদের প্রায় সকলে ছিল মুসলমান রিকশাওয়ালা। আগে থেকেই প্রয়োজনীয় সংখ্যক মেশিনগান প্রস্তুত রাখা হয়েছিল জীবন্ত আগুনে দগ্ধ হয়ে মরা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যারা পালাতে চাইবে তাদেরকে ঝাঁঝরা করে দিতে। তারা কাউকেই রেহাই দেবে না। নারী ও শিশুরা পুরুষদের সঙ্গে একযোগে একই ভাগ্য বরণ করল। এক হাজারের বেশি মানুষ এই নরককুণ্ডে জ্বলে মরল। তারা সবাই ছিল মুসলমান। তাদের একমাত্র দোষ ছিল তারা তাদের মতো অজস্র মানুষের অংশ হিশাবে তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপার্জন করতে আগ্রহী ছিল।

২৬ মার্চ নীলক্ষেত ও হাটখোলার মধ্যেকার রেল লাইনের পাশের বস্তি ঘরগুলির মুসলমান বাসিন্দাদের ওপরও একই ব্যবস্থা নেওয়া হল। আগুন-বোমা ও মেশিনগান শেষ করে দিল বিপুল সংখ্যক মানুষকে, যারা আর্মির কসাইগুলিকে চোখে দেখার সুযোগও পেল না।

পুরনো ঢাকা নগরী এলাকায় নয়া বাজার বস্তির বাসিন্দা মুসলমান আওয়ামী লীগ সমর্থকদের ওপরও একই ব্যবস্থা নেয়া হল তবে কিছুটা দয়াপূর্ণ ব্যবস্থা হিশাবে তাদের অল্পবয়স্ক মেয়েদেরকে আর্মি ক্যাম্পে সরিয়ে নেওয়া হল বলাৎকারের জন্য।

২৫ মার্চ রাতে পাক সেনারা চট্টগ্রামের ঈস্ট বেঙ্গল রাইফেলস সদর দফতরে আক্রমণ চালাল। এই ঈস্ট বেঙ্গল রাইফেলস গঠিত ছিল অনুগত বাঙালিদের নিয়ে, তারা প্রায় ২৫ বছর ধরে পাক আর্মির অংশ হিশাবে কাজ করছিল। কিন্তু তাদেরকে আর আস্থাভাজন মনে করা যাচ্ছিল না, কারণ, জানা গিয়েছিল যে তারা মুজিবের স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। পাকিস্তানের সেবা করার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল এমন এক হাজার লোককে লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের সাহায্যে শেষ করে দেওয়া হল।

২৫ মার্চে সিলেটে কারফিউ বলবৎ করা হল বাসিন্দাদেরকে কোনও বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই। মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বের হয়ে আসা একজন বৃদ্ধ লোককে গুলি করে হত্যা করা

হল। তারপর আর্মির লোকেরা তার দুই ছেলেকে বলল লাশ সরিয়ে নিতে। তারা যখন লাশের কাছাকাছি এগিয়ে আসল তখন তাদের দুজনকেও গুলি করে হত্যা করা হল। এই তিনটি লাশের স্তূপ জনসমক্ষে পচতে দেওয়া হল অন্য যারা মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য বেরুতে পারে তাদের জন্য শিক্ষা হিশাবে।

আরেকটি ঘটনার উদ্ধৃতি এরকম যে, মসজিদে নামাজরত সারি সারি মুসলমানকে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়েছিল এই মন্তব্যসহ যে তারা প্রকৃত মুসলমান নয় সুতরাং তাদের মসজিদে নামাজ পড়ার অধিকার নেই।

সড়ক ও রেল লাইনের উভয় পাশের ঘরগুলিকে প্রণালীভাবে লুট করার পর সেগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। সকল নারীকে, এমনকি কিছু বৃদ্ধ নারীকেও, তাদের পুরুষ আপনজনদের সামনে বলাৎকার করা হল, পরে পুরুষদেরকে গুলি করে হত্যা করা হল।

২৭ মার্চ সিলেট শহরে ঘরে ঘরে গিয়ে তল-াশি করা হল। বেশির ভাগ মানুষ আগেই গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল। যেসব মহিলা রয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে বলাৎকার করা হল। তাদের একজন ছিল ৬০ বছর বয়সের বৃদ্ধা। একটা মেয়েকে বলাৎকার করার পর তারা তার স্তন টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলল। মেয়েটা পড়ে গেল এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করল।

দালালরা, তা বিহারি হোক বা বাঙালি হোক, রেহাই পেত না যেখানে নারী-ধর্ষণের ব্যাপার জড়িত ছিল। গাহিরার একজন মুসলিম লীগারের মেয়ে পাক সেনাদেরকে চা খেতে দেওয়ার পর তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তানিদের জন্য কাজ করছিল, জিকাতলা মানকেশ্বরের এমন একজন মুসলমান ইঞ্জিনিয়ারকে জোর করে দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল প্রকাশ্য দিবালোকে পাক সেনাদের দ্বারা তার মা, তার স্ত্রী ও তার শ্যালিকার ধর্ষিত হওয়া।

৩১ মার্চ দিবাভাগে পাক আর্মি বিহারি রিফুজীদের সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের পাহাড়তলি এলাকায় আক্রমণ চালালে প্রায় ৩ হাজার বাঙালি নিহত হল এবং সকল মহিলা ধর্ষিত হল। প্রায় ৫শ' সুন্দরী মেয়েকে টেনে নেওয়া হল ক্যান্টনমেন্টে। অসংখ্য পুরুষ তাদেরকে বলাৎকার করত। এদের মধ্যে একটি মেয়ে মন্তব্য করেছিল বলে জানা যায় যে, এতগুলি জানোয়ারের ধর্ষণের যন্ত্রণা তবু সহ্য করা যায় কিন্তু শরীরের মধ্যে অত্যধিক পরিমাণ শুক্র জমা হওয়ায় যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় তা সহ্য করা যায় না।

১৯৭১ -এর এপ্রিল মাসটা বিশেষত শুক্রস্থাপনের কাজের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ১০ এপ্রিল চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার নিযিরাহাট নামক গ্রাম ঘিরে ফেলে কাউকে হত্যা করা হয়নি, কোনও ঘরে আগুন দেওয়া হয়নি বা কোনও সম্পত্তি লুট করা হয়নি;

শুধু প্রায় ২০০ জন সুদর্শনা মেয়েকে পাকিস্তানিরা বলাৎকার করেছিল এবং তাদের স্বামী ও পিতামাতাকে ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল। তারা সবাই ছিল মুসলমান।

৪ এপ্রিলে পাকিস্তানিদের একজন উৎসাহী দালাল জামাত-ই-ইসলামীর সদস্যের কন্যাকে তার এবং অন্যদের সাক্ষাতে চারজন পাকিস্তানি সৈন্য বলাৎকার করেছিল।

দিনাজপুর জেলার শতকরা প্রায় চলি-শ ভাগ মানুষ ছিল হিন্দু। তাদের মধ্যে অল্পই ভারতে পালাতে পেরেছিল। কিছু হিন্দু ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার আবেদন করেছিল নির্যাতন-পূর্বক মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে বাঁচার আশায়। কাউকেই রেহাই দেওয়া হয়নি। সবাইকে গুলি করে হত্যা করে একটা গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। জনৈক শীতল সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও -এর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৭ মাইল দূরে সিঙ্গিয়া নামক গ্রামে তখন পর্যন্ত হিন্দুরা বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে রাখায় ঐ গ্রামের গোটা হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় ১৫০০ জন মানুষকে আধঘণ্টার মধ্যে হত্যা করে হিন্দুদের নিজেদের দ্বারাই খোঁড়ানো দুইটি বড় গর্তে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল।

চট্টগ্রাম শহর সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ ভুগেছিল। ৫/৬ এপ্রিল শহরটিকে অবরুদ্ধ করে ফেলে সব বাড়িঘর লুট করা হয়েছিল, মহিলাদের বলাৎকার করা হয়েছিল, বলাৎকারের পরে নগ্ন মহিলাদের গবাদি পশুর মতো বাঁধা অবস্থায় হাঁটিয়ে নদীতে নেওয়া হয়েছিল গোসল করানোর জন্য। রামগড় মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টে ৫০ জন মেয়েকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাদের প্রত্যেককে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জন লোক বলাৎকার করত। বলাৎকারের সময় পাকিস্তানিরা "জয় বাংলা" বলে চিৎকার করত, যা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের রণধ্বনি, এবং তাদের শিকার হতভাগ্য মেয়েদেরকে তাদের পিতা 'শেখ মুজিব' -এর সাহায্য চেয়ে চিৎকার করার জন্য বলত। এখানে এসব দুর্ভোগে যারা ভুগেছিল তারা সবাই ছিল উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণির মুসলমান।

২৬ এপ্রিল বিহারিরা (অবাঙালি) ঢাকাতে তাদের ভাষায় 'প্রতিশোধ দিবস' পালন করল পাক আর্মির পূর্ণ সহযোগিতায়। ঢাকায় যে এলাকা বাছাই করা হয়েছিল তা হচ্ছে মিরপুর ও শ্যামলির মাঝামাঝি জায়গায় কারণ এখানে বাস ছিল উচ্চ ও মধ্য শ্রেণির মুসলমান গভর্নমেন্ট সার্ভেন্টদের।

পাক সৈন্যদের দ্বারা পুরা এলাকাটা অবরুদ্ধ হল। বিহারি অবাঙালিরা তাদের স্যাডিস্ট আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞের পর তারা প্রতিটি নারীকে বলাৎকার করল।

যখন বলাৎকার চলছিল তখনও হত্যা চলছিল। প্রায় ৩ হাজার বাঙালি জীবন হারাল।

৫১ ফ্যান্টম্স্ অব চিটাগং

কেউ জানে না কত নারী জীবন হারানো ছাড়াও সম্ভ্রমও হারিয়েছিল। এগুলি ছিল কিছু কারণ যেজন্য বিহারিদেরকে বাংলাদেশে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়নি।

আরেক ধরনের নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হত যা ছিল ইতিহাসে অভূতপূর্ব। কারফিউ -এর সময়ে পাকিস্তানি সেনারা যত অল্পবয়স্ক বালকদের বাড়িগুলিতে পেত তাদের ধরে নিত, একত্র করত। তাদের চোখ বেঁধে হাতকড়া পরিয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হত তাদের সমস্ত রক্ত বের করে নেওয়ার জন্য। পরে তাদের মৃতদেহগুলি বুড়িগঙ্গা নদীতে ছুড়ে ফেলা হত। সারা বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এটা করা হয়েছে বলে জানা যায়। রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন আছে এমন মরণাপন্ন পাক সৈনিকের জন্য বাঙালি রক্ত তো আর তেমন একটা খারাপ নয়, তাছাড়া সেটা পাঞ্জাবি মুসলমানের রক্তধারায় প্রবেশ করার পর পবিত্রীকৃতও হয়ে যায়।

মে '৭১ -এর প্রথম সপ্তায় প্রায় ২শ' পাক সৈন্য ঢাকা ও কুমিল-া জেলার সীমান্তের ওপর গজারিয়া থানার একটি গ্রামে হামলা চালিয়ে কোনও রকম উস্কানি ছাড়া শত শত নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করল এবং তাদের সম্পত্তি লুট করল ও নারীদের বলাৎকার করল। এ কাজ সম্পন্ন করার পর পাক সৈন্যরা গজারিয়া ইউনিয়নের মুসলিম লীগ চেয়ারম্যান কর্তৃক এক ভোজনে আমন্ত্রিত হল। এ লোকটি গোড়া থেকে পাকিস্তানিদের সাহায্য করে আসছিল। অন্যান্যদের সঙ্গে তার নিজের কন্যাও খাবার পরিবেশন করেছিল। এই কন্যাটিকে কোম্পানি কমান্ডার জোর করে মিলিটারি ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত কেউ ঐ হতভাগ্য মেয়েটির পরিণতির কথা বলতে পারে না।

অনেকে হাফিয মিয়া নামের এক মুসলমানের ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতনের ঘটনার কথা বলেছিল। সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গল শহরে, যা আগে মুক্তিবাহিনীর হাতে পড়েছিল, ২৮ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭টায় পাক বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করলে অনেক মানুষ নিহত হল এবং বাকিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে গেল। ২৯ এপ্রিল পাক সৈন্যরা শহরটা পুনর্দখল করল, সেখানে সম্পত্তি লুট করল এবং তাদের সর্বোচ্চ প্রথা অনুযায়ী নারীদের বলাৎকার করল।

তারা জনৈক হাফিয মিয়াকে গ্রেফতার করল। হাফিয মিয়া থানার একটি খাদ্য গুদামের দায়িত্বে ছিল এবং বোকার মতো দায়িত্ব স্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়নি। সত্য হচ্ছে, লোকটি নিজের আনুগত্যের ব্যাপারে এত গর্বিত ছিল যে তার কোনও আত্মীয়কেও পালিয়ে যেতে দিতে দিল না কারণ সে আশা করছিল সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ শহরটি পুনর্দখল করে তাকে বড় রকমে পুরস্কৃত করবে।

কিন্তু হাফিয মিয়াকে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক এক বিহারি রেলওয়ে স্টেশন মাস্টারকে হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য এবং এলাকার জনগণকে তার গুদামের কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে

যেতে দেওয়ার জন্য সন্দেহ করা হল। অন্য গুদামগুলি যে লুট করা হয়েছিল এবং সেগুলির যে আর অস্তিত্বই ছিল না সে ব্যাপারটা গ্রাহ্যই করা হল না। হাফিয মিয়ার গুদামটাই তখন পর্যন্ত অক্ষত ছিল এবং তাতে খাদ্যদ্রব্যের মজুতও ছিল।

মৃত স্টেশন মাস্টারের পরিবারের উপস্থিতিতে হাফিয মিয়ার শরীরের হাড় মাংস একটু একটু করে কাটার হুকুম দেওয়া হল, আর তার নিজের পরিবারের সদস্যদের ওপর নির্যাতন করা হতে লাগল তার ওপর ঐ ধীর কিন্তু সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক নির্যাতনের ফাঁকে ফাঁকে। প্রথমে হাফিয মিয়ার আঙ্গুলগুলি কেটে ফেলা হল, তারপর তার হাত, বাহু এবং পাগুলি কেটে ফেলা হল। সে যখন যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল ও চিৎকার করছিল, তখন তার পরিবারের সদস্যদের ওপর একের পর এক নির্যাতন করা হচ্ছিল। অনেকগুলি ঘণ্টা ধরে এই বিভৎস লীলা চলল। হাফিয মিয়ার তিন মেয়েকে বলাৎকার করা হল এবং তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, আর কোনও দিন তাদের কথা শোনা গেল না।

পরে কুটি সেন বলে একজন হিন্দু লোককে ধরা হল যে ভারতে পালাতে পারেনি। ফুটবল মাঠে সমবেত একদল মুসলিম লীগারের হাতে তাকে দেওয়া হল। এক পাক আর্মি অফিসার একটা বক্তৃতা দিল যা একজন তর্জমাকারী বাঙালি মুসলিম লীগারদের বুঝিয়ে দিল। বক্তৃতার সারকথা ছিল যে, সব হিন্দু হচ্ছে ভারতের দালাল এবং মুসলমানদের উচিত ধর্মীয় কর্তব্য হিশাবে তাদেরকে হত্যা করা। কুটি সেনকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ঠেলে মাটিতে ফেলা হল। একটা পবিত্র কাজ হিশাবে উপস্থিত সকলে তাকে পদাঘাতে পদাঘাতে হত্যা করল। কুটি সেনের পুত্র বাবলা সেন ভারতে পৌঁছেছিল এবং ঘটনাটির বিবরণ শুনে সে গোপনে ফিরে এসে পিতার মৃতদেহের অবস্থা দেখে আত্মহত্যা করার উদ্যোগ নিল। তবে কিছু লোক তাকে অন্যরকম যে দিন আসছে তার অপেক্ষায় আত্মহত্যা থেকে নিরস্ত হতে বলল এবং সে তাই করল। সে তার বাবার মৃতদেহের সৎকার করল। কিন্তু হাফিয মিয়ার দেহের কিছু কিছু অংশ তখনও পড়ে ছিল যা শেয়ালেও খেয়ে শেষ করেনি।

সিলেট জেলার মৌলবিবাজার পুনর্দখল করা হল এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে। শহরটা লুট করা হল এবং সকল সন্দেহভাজনকে হত্যা করা হল। সকল সুদর্শনা মেয়েকে আর্মি ক্যাম্পে ধরে নিয়ে বলাৎকার করা হল। পরের দিন তাদেরকে নগ্ন অবস্থায় স্থানীয় খেলার মাঠে নিয়ে এসে মুসলিম লীগ নেতাদের সামনে সারাদিন ধরে নাচতে বাধ্য করা হল। তারপর তাদেরকে শিবপুর আর্মি ক্যাম্পে নেওয়া হল, যার পরে তাদের আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি।

১ এপ্রিল ১৯৭১ ঢাকা জেলার সাভার থানার অধীন হোলাতি গ্রামে এক ভয়ঙ্করতম ঘটনা ঘটল। গ্রামটা ছোরা ও বর্শায় সজ্জিত বিহারিদের সহযোগে পাক আর্মির লোকদের

দ্বারা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হল। এটা ছিল আওয়ামী লীগ পন্থী হিন্দুদের গ্রাম। গ্রামটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল যাতে এমনকি সকল গরুবাছুর ও অন্যান্য গৃহপালিত প্রাণীও জ্যান্ত পুড়ে গেল। যারা দৌড়ে পালাতে গেল তাদের ওপর মেশিনগান চালানো হল তবে ব্যতিক্রম ছিল কিছু মেয়ে যাদেরকে রাখা হল স্যাডিস্ট আমোদ উপভোগের জন্য। শিশুদেরকে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওপর দিকে ছুড়ে দিয়ে উচিয়ে ধরা বেয়োনেটের ওপর পড়তে দেওয়া হল একাজে সিদ্ধহস্ততার অনুশীলন হিশাবে। তাদের মায়েদের স্তন কেটে কেটে মৃতদেহগুলির মুখে পুরে দেওয়া হল। তখনও যারা জীবিত ছিল তাদেরকে 'জয় পাকিস্তান' বলে চিৎকার করতে বলা হল। তাদের বেশির ভাগই স্যাডিস্টিক কসাইগুলির কথা মতো তাই করল। তবে ছয় বছর বয়সের একটি ছেলে না বুঝে সে যেমন অভ্যস্ত ছিল তেমন 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার দিল। এতে আর্মির লোকেরা এত ক্ষিপ্ত হল যে তারা ছেলেটিকে কেটে পঞ্চাশ টুকরা করল এবং একেকটা টুকরা যে হিন্দুরা তখনও জীবিত তাদের খেতে দিল। তারা খেতে অস্বীকার করলে তাদের সবাইকে গুলি করে হত্যা করা হল। এইভাবে পাকিস্তানের গৌরব বৃদ্ধি করা হল।

যে অল্প সংখ্যক কমবয়সি মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখা হল তাদেরকে বলা হল যে "ভয় নেই; আমরা তোমাদের আঘাত করব না বা হত্যা করব না। তোমাদেরকে বাছাই করা হয়েছে এজন্য যে তোমরা ভাল মুসলমানি শুক্র লাভ করবে এবং খাঁটি মুসলমানদের জন্ম দেবে যারা মুজিবের মতো বাস্টার্ড নয়।" এই মেয়েদের টেনে নিয়ে যাওয়া হল টঙ্গির আর্মি ক্যাম্পে।

তাদের আরেক ধরনের আচরণ তুলে ধরা যেতে পারে। ২৭ এপ্রিল ১৯৭১ -এ নাশকতামূলক কাজ হিশাবে গোয়াল টেক -এ একটা রেলগাড়ি লাইনচ্যুত করার শাস্তি দিতে মনস্থ করল পাক আর্মি। আসলে রেল তার নিচের নরম মাটির ক্ষয়ের কারণে সরে গিয়েছিল। কিন্তু বাঙালিদেরকে শিক্ষা দিতে হবে, তার জন্য যে কোনও অজুহাতই যথেষ্ট।

আশপাশের চারটি গ্রাম গোয়াল টেক, মর্কন, পাগার এবং আব্দুল-াপুর -এর বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দেওয়ার এবং নাশকতামূলক কাজ করার অভিযোগ তোলা হল। গ্রামগুলির বাসিন্দাদেরকে সপরিবারে ৩০ জনের একেকটা দলে কতগুলি নির্ধারিত জায়গায় সমবেত হতে বলা হল এবং সাথে সাথে গ্রামগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। এখানে পিতাদেরকে নিজেদের কন্যাদের এবং ভ্রাতাদেরকে নিজেদের বোনদের বলাৎকার করতে আদেশ দেওয়া হল সমবেত অন্যদের সামনে। এতে অস্বীকার করাতে নারী-শিশুসহ সকলকে হত্যা করা হল। তারা ছিল সবাই মুসলমান। কয়েক জায়গায়

মানুষদেরকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বাধ্য করা হল; তারা জীবন্ত পুড়ে গেল।

এ ধরনের কত যে ঘটনা ঘটেছিল যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। সেসব পাক আর্মির কলঙ্ক হিশাবে ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে থাকবে।

এটা অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যে সামরিক উর্দির মধ্যে এই কাপুরুষগুলি বেসামরিক নারী-পুরুষদের প্রতি এমন উদ্ধত ও পৈশাচিক আচরণ করত কিন্তু এরাই যখন মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর সাহসী বাঙালি দেশপ্রেমিকদের মোকাবিলা করত তখন আতঙ্কে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ত। এই বাঙালি যোদ্ধারা যুদ্ধে পৌরুষপূর্ণ এবং নারীদের প্রতি নম্র বীরোচিত আচরণের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের সেরা অংশ মুজিববাহিনী সৈনিক হিশাবে আচরণের আদর্শ স্থাপন করেছিল তাদের নাম ও ভূমিকার সম্মান বজায় রেখে।

মুজিববাহিনীর প্রশিক্ষণের সময় আমি যত কথা বলেছিলাম তাতে আমি এমন একটা বিপ-বের জন্য উপযুক্ত চরিত্র গঠনের ওপর জোর দিয়েছিলাম। আমি শত শত বার এ কথা বলেছিলাম– "প্রতিটি নারী হচ্ছে তোমাদের কাছে হয় মা, নয় বোন, নয় তো কন্যা। শত্রুপক্ষের মেয়েরাও যেন সহানুভূতি ও নিরাপত্তার জন্য তোমাদের দিকে তাকাতে পারে। প্রতিটি শিশু একজন সম্ভাব্য নাগরিক ও সাহায্যকারী। এমনকি রাজাকারদেরও তোমাদের মতো চিন্তা করার জন্য বোঝাতে হবে। তাদের অনেকে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করছে তাদের পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য কারণ নিষ্ঠুর শত্রুরা তাদরে জীবিকার্জনের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। রাজাকাররা কী কঠিন অবস্থায় আছে তা বুঝতে হবে। পাকিস্তানের পক্ষে কাজ না করে সে খাদ্য পাবে কী করে? বাঙালিরা এখন যে অবস্থায় আছে তাতে তাদের সবাইকে কি তোমরা খাওয়াতে পার? যদি না পার, একজন রাজাকারকে শত্রুর দালাল বলে অভিহিত করে তাদের স্থায়ীভাবে শত্রু বানিয়ো না। তাকে এমন কিছু কাজ দাও যা সে পাকিস্তানিদের বেতনে থেকেও করতে পারে আবার সেসব করে নিজেকে বাঙালি জাতির অন্তর্ভুক্ত মনে করেও গৌরব বোধ করতে পারে।

আসলে এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও কাজের ফলে আমরা বাংলাদেশজুড়ে অজস্র রাজাকার সমর্থক পেয়েছিলাম। তারা এমন সব মিশনে সফলভাবে কাজ করেছিল যা তাদের দেশপ্রেমপূর্ণ সাহায্য ছাড়া কার্যকর করা সম্ভব হত না। আমি সেসব শত শত ঘটনার উলে-খ করব না যাতে সাহসী রাজাকাররা মুজিববাহিনীর লোক এবং তাদের রসদপত্র এবং পরবর্তী পর্যায়ে আর্মির রসদপত্রও বহন করেছিল। তারা পাকিস্তানের বেতন নিয়েও দেশের মুক্তির জন্য কাজ করেছিল।

বাংলাদেশে পাক আর্মির তুলনায় মুজিববাহিনীর চরিত্র ছিল অতিশয় বিপরীত।

পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরা তাদের চমৎকার সেনাদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্য দায়ী ছিলেন এবং এ জন্য ঠিক সেনাদের কাছেই তাদের জবাবদিহি করতে হবে।

কিন্তু, কোনও আর্মি যখন উপরে যেমন দেখানো হল সেভাবে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেয় তখন তা তার নিজের কবরই খনন করে। সৈনিকবৃত্তি হচ্ছে সবচেয়ে মহান পেশা। তার কাছে এমনকি শত্রুকে হত্যা করাও ব্যক্তিগত শত্রুতার উর্ধ্বে। আহত শত্রুর চিকিৎসা সামরিক হাসপাতালে এমনভাবে হতে হয় যেমন হয় সপক্ষের আহতদের। তাদেরকে সর্বোত্তম চিকিৎসা সেবা দিতে হয়। বন্দিদের ও নিরস্ত্র বেসামরিক জনসাধারণের সাথে সম্মানসূচক ব্যবহার করতে হয়। তাহলে তারাও একই রকম ব্যবস্থা ফিরিয়ে দেয়।

একজন সৈনিক কিভাবে মানুষের কাছ থেকে সম্মান আশা করতে পারে, যার উর্দিই তাদের ঘৃণার উদ্রেক করে। তার কী সুযোগ আছে শত্রুর কাছ থেকে নিজের অবস্থান বা কর্মপরিকল্পনা গোপন রাখার যেখানে সমগ্র জনগণই প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষায় টগবগ করছে। একজন সৈনিকের বেছে নিতে হবে নারী ও বিজয়ের মধ্যে যে কোনও একটি, লোভ ও সম্মানের মধ্যে যে কোনও একটি, স্বার্থপরতা ও আত্মত্যাগের মধ্যে যে কোনও একটি। নিরস্ত্র ও অসহায় বেসামরিক জনসাধারণের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের গালগল্পে ভরা যাদের পেট, এমন আর্মি সত্যিকার যুদ্ধের সম্মুখীন হতে পারে না। ভারতীয় আর্মি এবং মুজিববাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর চেয়েও বেশি করে পাক সশস্ত্র বাহিনীগুলি পরাজিত হয়েছিল যাদেরকে তারা নির্যাতন ও হত্যা করেছিল তাদের প্রেতদের হাতে।

পূর্বাঞ্চলের পাক আর্মির আত্মা বিনষ্ট হয়েছিল বলে তারা চিরতরে সম্মান হারিয়েছিল এবং তাই সহজেই ইতিহাসের শক্তিগুলির প্রবল হানার সামনে তাদের পতন হয়েছিল। ■

অধ্যায়—৭

স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এস এফ এফ) সম্পৃক্ত হল

বাংলাদেশ যুদ্ধের বিবরণে অতীন্দ্রিয়বাদের কথা আনা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কিছু অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ১৯৭০ সনের ডিসেম্বরে আমার আধ্যাত্মিক গুরু বাঙালি সাধু বাবা ওংকারনাথ -এর সান্নিধ্যে কয়েকটা দিন কাটানোর জন্য বেনারস গিয়েছিলাম। গঙ্গা নদীতে অজ্ঞাতবাসে কাল যাপনের জন্য বাবা দুটি নৌকা ভাড়া করেছিলেন, একটি রান্নার কাজে একটি থাকার কাজে ব্যবহারের জন্য। সকল শিষ্য ও ভক্তদের বিদায় করে দেওয়া হয়েছিল, কেবল তার দেখাশোনার জন্য জনা চারেককে রাখা হয়েছিল। বাবার বয়স ছিল আশি, অজ্ঞাতবাসে তার দৈনন্দিন প্রয়োজনের দেখাশোনা করার জন্য দু'এক জন লোক তাঁর দরকার ছিল। অবশ্য তিনি যথেষ্ট সদয় হয়ে আমাকে ও আমার স্ত্রীকে, দুজনকেই তাঁর সঙ্গে ঐ মনোরম ও ঐশ্বরিক আবাসে থাকতে দিয়েছিলেন।

আমরা চারটি চমৎকার দিন বাবার সার্বক্ষণিক সাহচর্যে নাম সংকীর্তনের মিষ্টি সুর শুনে কাটিয়ে দিলাম। (বাবা ২৪ ঘণ্টাই তাঁর গায়ক শিষ্যদের এক বিশেষ দলের গাওয়া নাম-গান-গানে গানে ঈশ্বরের নাম-শুনতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন)। সেই পবিত্রতম নদীর বুকে খেলে যাওয়া বিশাল তরঙ্গ আর তার মধ্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালাই তো ছিল সংগীতের মতো। সকাল সন্ধ্যায় নদী পেরিয়ে ভেসে আসত মন্দিরের ঘণ্টার সুরেলা ধ্বনি। সান্ধ্য আরতি শোনা যেত, নদীর পার ধরে শত শত আলো জ্বলে উঠত। গঙ্গার পবিত্র জলে ভক্তদের ভাসিয়ে দেওয়া অজস্র বাতি চোখে পড়ত। বেনারসের গঙ্গার গভীর জলের ওপরে প্রশান্ত নির্জনতায় ঈশ্বরভাব -এ পরিপূর্ণ এই সাধুর মহান উপস্থিতি আমাদের চিত্তভাবকে অনেক ওপরে তুলে দিত। আজ পর্যন্ত আমি জানি না কেন বাবা আমাকে চার দিন ধরে তাঁর সঙ্গে নদীবক্ষে বাস করানোর মতো অসাধারণ একটা কাজ করলেন, এবং ঠিক যখন আমার জগৎ আমি ভুলে যেতে বসেছি ঠিক তখনই তিনি আমার অজ্ঞাতবাসের অবসান ঘোষণা করলেন। এই খবরটা ছিল আমার জন্য ভীষণ আতঙ্কস্বরূপ। আর কোনওদিন আমি এমন মনোরম সময় কাটাইনি বা সংসারের কামনা-বাসনা থেকে নিজেকে এমন মুক্ত মনে করিনি।

আমরা বেনারসে ফিরলাম। নদী পার হয়েই বাবা আমাদেরকে নিয়ে বেনারসের মন্দিরগুলিতে ঘুরে বেড়ালেন। আমরা যখন দুর্গামন্দিরে (দুর্গা হচ্ছে শক্তি, ঈশ্বরের শক্তির দিকটিই হচ্ছে দুর্গা) প্রবেশ করলাম, আমি কৌতুকভরে বাবাকে বললাম এই দেবের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে।

তিনি আমার হাত ধরলেন এবং সেই সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর শক্তির মূর্তির প্রতি সম্বোধন করে বললেন–

"মা, এই হচ্ছে সুজন। সে শিগগিরই যুদ্ধে যাবে। তাকে রক্ষা করো, এবং তার বাহিনী ও ভারতের জন্য সম্মান ও বিজয় এনে দাও।"

এরপর তিনি মন্দির থেকে বের হয়ে যেতে লাগলেন, আমার ডান হাত ধরে তাঁর পিছনে পিছনে আমাকে টানতে টানতে। মন্দির থেকে বের হওয়ার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম কোন যুদ্ধে আমাকে পাঠাচ্ছেন। ঐ সময় বিশ্বে বিশেষ কিছু ঘটছিল না কেবল মধ্যপ্রাচ্য ও ভিয়েতনামের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের এলাকায় ছাড়া এবং সেখানেও ভারত সংশি-ষ্ট হতে পারে এমন মনে হওয়ার মতো কিছু ছিল না, স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সংশি-ষ্ট হওয়া তো আরও দূরের কথা।

বাংলাদেশে এমনকি শেখ মুজিবও জানতেন না তাঁর দেশের জন্য কী অপেক্ষা করছে। পাকিস্তানের ব্যাপারে ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন, ২৫ মার্চ ১৯৭১, তখনও অনেক দূরে। সামগ্রিক অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল শেখ সাহেব অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসনসহ ছয় দফা নিয়ে এগিয়ে যাবেন এবং সম্ভবত পাকিস্তান শাসন করবেন একজন মহান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রনেতা হিশাবে– সেভাবেই খ্যাতিমান ছিলেন তিনি।

বাবা আমার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না, সোজা হন হন করে হেঁটে গেলেন তাঁর বেনারস আশ্রমের দিকে, স্বর্গীয় সংগীতের মিষ্টি সুরে যে স্থানটা আচ্ছন্ন হয়েছিল।

১৯৭১ -এর এপ্রিলে বাংলাদেশ থেকে আমাদের দেশে সাংঘাতিক রকম বিপুল সংখ্যায় শরণার্থী আসল কিন্তু প্রথম দিকে মনে হল এটা এমন একটা সমস্যা যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে সন্তোষজনক ব্যবস্থায় শরণার্থীদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, তাদেরকে আশ্বাস দিতে হবে এবং নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো যাবে। শেখ মুজিব সম্বন্ধে খবর ছিল যে তিনি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেফতার হয়ে আছেন, যদিও কেউ কেউ, স্বাধীন বাংলা বেতারসহ, ঘোষণা করেছিল যে তিনি বাংলাদেশের মধ্যে থেকে একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। কেউ কেউ বলল যে তিনি মৃত এবং অস্থায়ী সরকারের মধ্যেকার কেউ কেউ এমনভাবে কাজ করছিলেন যেন তিনি জীবিত থাকলেও পাকিস্তান কখনও তাঁকে তাঁর নিজের দেশে ফেরার সুযোগ দেবে না।

সপ্তায় সপ্তায় উত্তেজনা বাড়তে লাগল। দেখা গেল পরাশক্তিরা এবং আরও কিছু শক্তি ঐ লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে, চেষ্টা করছে সর্বতোভাবে ভারতকে ভীত করতে ও পাকিস্তানের সাহস বাড়াতে।

পাকিস্তানি আর্মি পাগলের মতো পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশে যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছিল

এবং তার মিত্র চীন কলহের আগুনকে উস্কে দেওয়ার সাথে সাথে তিব্বতে কিছু কিছু প্রস্তুতিমূলক সৈন্য সঞ্চালন করছিল।

এ ধরনের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মতো অবস্থায় আছে এমন যে কোনও দেশ একটি আকস্মিক ও উস্কানি-বিনা আক্রমণের বিরুদ্ধে পূর্বসতর্ককতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করে পারে না। বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের দ্বারা সংঘটিত পাইকারি হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে সাহায্য করায় বিশ্বের জাতিসমূহকে বুঝিয়ে রাজি করতে স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মাসের পর মাস ব্যর্থ চেষ্টার পুরস্কার হিশাবে ভারত পেল পাকিস্তানিদের গোলাবর্ষণ যা সোজা আঘাত করল ত্রিপুরা, কাছাড় এবং মেঘালয় রাজ্যের রাজপথগুলিতেও, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের বরাবর গ্রামগুলিতে তো বটেই।

যুবনেতারা তাদের পাক শাসকদের এই মতলবের ব্যাপারে ভাল রকম সজাগ ছিলেন। সুতরাং শুরু থেকেই তাঁরা চরম কিছুর জন্য নিজেদেরকে তৈরি করছিলেন এবং এমনকি যখন তাদের সাময়িক সরকার গল্পগুজবে ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে কাল কাটাচ্ছিল তখন তাঁরা শক্ত ও সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তাদের একমাত্র ভালবাসা পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তাঁদের শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন দিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে। তাঁদের অস্থায়ী সরকারের মধ্যেও এমন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক ছিলেন যারা নীতির ব্যাপারে একই রকম আপশহীন ছিলেন, যারা ডুবিয়ে দিচ্ছিলেন সেই সব দুর্বল কণ্ঠস্বর যা তখনও আত্মসংবরণ ও পুনর্মিলনের পরামর্শ দিত।

আমার ডাক পড়ল

যা চলছে তা অল্প সময়ে শেষ হওয়ার মতো ব্যাপার নয় এমনটা সন্দেহ করে ভারত সরকার অপ্রচলিত (গেরিলা) যুদ্ধের একজন বিশেষজ্ঞ হিশাবে আমাকে ডেকে পাঠাল, বলল সীমান্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে ও মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে একটা প্রতিবেদন পেশ করতে। আমি তড়িঘড়ি সংশি-ষ্ট সীমান্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে এবং বাংলাদেশের বেশ কতক যুবনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি প্রতিবেদন পেশ করে দিলাম।

আমার ব্যক্তিগত পরিদর্শন থেকে মানচিত্র যা দেখায় তারই সত্যতা প্রতিপন্ন হল; তা হল বাংলাদেশ গেরিলা যুদ্ধের স্বর্গ। বন এবং পাহাড়, নদীনালা, হ্রদ ইত্যাদি অনেক অংশকেই দুর্গম করে রেখেছে। তবু সেখানে রয়েছে মাছ -এুর্গির প্রাচুর্য যা একটা গেরিলাবাহিনীকে স্বাধীনভাবে কাজ করে যেতে রসদ জোগাবে।

তার ওপর যদি আপনি মাথায় রাখেন মোহভঙ্গ হয়েছে এবং ক্রুদ্ধ হয়ে আছে এমন সাড়ে ৭ কোটি মানুষের এক জনসংখ্যাকে তাহলে আন্দাজ করতে পারবেন সামরিক আইন

কর্তৃপক্ষের কী বিশাল বাহিনীর দরকার হবে ঐ দেশটার যে কোনও অংশে শান্তি শৃঙ্খলার স্রেফ বহির্দৃশ্যটুকু বজায় রাখার জন্য। আমি ভাবলাম গেরিলা যুদ্ধ পাকিস্তানের সৈন্যবল ও অন্যান্য সম্পদ নিঃশেষে শুষে নেবে যদি তা কখনও এই পূর্বাঞ্চলকে নিজের অধিকারে রাখার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে মনস্থ করে।

দীর্ঘকাল ধরে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর তেমনি কিছু অসুবিধাও আছে। এতে কম-দৃঢ় মনোভাবাপন্ন বেসামরিক জনসাধারণের মনোবল ভেঙে যেতে পারে শুধু শত্রুর প্রতিশোধের কারণেই নয় বরং এ পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অনটন ঘটনার কারণেও। এটা শত্রুপক্ষে বিদেশি তথাকথিত বিশেষজ্ঞ আকৃষ্ট করে। তারা এটাকে বিবেচনা করে একটা দাবা খেলা বলে, যা তারা খেলবে ক্লাব এবং বেশ্যাখানা থেকে; তারা যুদ্ধের আগুনে যথেষ্ট তেল ঢেলে জ্বালিয়ে রাখতে চাইবে, যাতে তাদের আরাম আর সুবিধাবলি অনির্দিষ্টকালের জন্য বজায় থাকে। কালক্রমে এটা সংলগ্ন দেশগুলিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলবে।

সুবিধা অসুবিধা উভয় দিক নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা তখনও শেষ হয়নি এমন সময় আমার পরিচিত হওয়ার সৌভাগ্য হল কালচে রঙের কাঠিপানা এক যুবকের সঙ্গে দুজনারই এক বন্ধুর বাসায়। আমার মনে হয় তখন মে মাস ছিল। এ বাঙালি যুবকটি তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছেন, যে ঘুমটা সত্যি তাঁর খুব পাওনা ছিল। তিনি চোখ ডলতে ডলতে ড্রয়িং রুমে ঢুকলেন। চোখ দুটি তাঁর ভাল রকমেই লাল রং ধারণ করেছিল। আমরা একসঙ্গে চা -এ চুমুক দিলাম। তিনি ছিলেন মনোমুগ্ধকর, সতর্ক এবং সংবেদনশীল। একটা সরল ইস্কুল-ছাত্রের মতো খোলা মনে তিনি আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

এ ছিল তোফায়েল আহমেদ। আয়ুব এই যুবককে কেনার জন্য যে কোনও কিছু দিতে রাজি হতেন। জেনারেল ইয়াহিয়া একবার গ্রাম -এলাকায় সফরকালে তাঁর একমাত্র নিরাপত্তা প্রহরী হিশাবে ঐ যুবকের ওপর নির্ভর করেছিলেন। সেখানে মানুষ এই যুবককে রীতিমতো পূজা করত।

তিনি অধৈর্য কলেজ ছাত্রের মতো তড়বড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন কিন্তু শিগগিরই শান্ত হয়ে সেই মায়ামুগ্ধকার হাসি হাসলেন যে হাসি সোজা তার হৃদয় হতে উঠে আসত। তিনি তাঁর অপর তিন সহকর্মীর কথা বললেন এবং শিগগিরই তাঁদের মধ্যে দুজন দেখা দিলেন। একজন আব্দুর রাজ্জাক, আওয়ামী লীগ পার্টির সেই যুবনেতা, এবং তারপর সিরাজুল আলম, সেই আগুনের মশাল যিনি নিজেকে পুরোপুরি বিক্রি করে দিয়েছিলেন তাঁর দেশের কাছে, অন্য কোনও আকাঙ্ক্ষা যাঁর ছিল না। শেখ ফজলুল হক মনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অনেক পরে। মনির সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমি বুঝেছিলাম

প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী অমিত আত্মত্যাগের মনোভাবসম্পন্ন এই চারজনের কাছ থেকে ঠিক কাজ পাওয়া যাবে এবং তাঁদেরকে বিশ্বাস করে দায়িত্ব দেওয়া যাবে।

এই নেতারা আমাকে খোলামনে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন বাংলাদেশে তারা যে নিষ্ঠাবান রাজনৈতিক কর্মীদের সংগঠন রেখে এসেছেন তার কথা। বললেন যে সেসব কর্মীরা সাহসী, পরিপক্ক এবং উচ্চ সম্মানিত। তাদের শুধু দরকার সঠিক গেরিলা ধরনের প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র। তাঁরা আরও বললেন যে তারা ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকদের ছাড়া আর কেবলমাত্র কিছু কম্যুনিস্ট ক্যাডারদের বিরুদ্ধে যারা তাদের চীনা ও পাকিস্তানি পৃষ্ঠপোষকদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে; তাঁরা এসব লোকদের সঙ্গে কোনও অবস্থাতেই সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নন, তাতে করে যদি স্বাধীনতা আরও কয়েক বছর পিছিয়ে যায় এবং আরও বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তাতেও তাঁরা রাজি। তাঁরা বললেন বাংলাদেশে তাঁদের বিরোধীরা হচ্ছে সুবিধাবাদী এবং তাদের কোনও নীতি নেই।

মোজাফ্ফর গ্রুপে (রুশপন্থী-কম্যুনিস্ট গ্রুপে) তাঁদের কিছু বন্ধু ছিল কিন্তু তাঁদের বক্তব্য অনুসারে এই গ্রুপের শ্রমিক বা ছাত্রদের মধ্যে উলে-খ করার মতো অনুসারী দল ছিল না। পরে আমি শ্রী ডি পি ধর -এর অনুরোধে অধ্যাপক মোজাফ্ফর -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম এবং দেখেছিলাম তাঁর লক্ষ্যে তিনি মোটামুটি নিষ্ঠাবান ছিলেন।

ঘটনা হিশাবে আমি এখানে উলে-খ করতে পারি যে ১৯৭১ এর অক্টোবর মাসে হৃষীকেশে বাংলাদেশের মওলানা ভাসানীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি একটা অত্যন্ত আরামদায়ক লিমুযিনে চড়ে মহান বাঙালি সাধু বাবা ওংকারনাথ -এর সঙ্গে দেখা করতে হৃষীকেশস্থ তাঁর আশ্রমে এসেছিলেন। ভাসানী ভারতে হিন্দুবিদ্বেষী হিশাবে ভাল রকম পরিচিত ছিলেন এবং দেশভাগের সময় বিপুল হিন্দু হত্যার জন্য দায়ী ছিলেন বলে তাঁর খ্যাতি ছিল, সুতরাং এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল যখন কিনা তিনি একদল ভারতীয় সরকারি অফিসার এবং তাঁর নিজের সচিবদের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামলেন। নব্বই বছর বয়সে তাঁকে নিটোল স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছিল। আমার সঙ্গে তিনি শিখদের সাহস সম্বন্ধে কথা বললেন। তিনি এমন ধারণা দিলেন যে তিনি ভারতকে ভালবাসেন এবং তাঁর দেশের মুক্তিতে ভারতীয় সশস্ত্র সহযোগিতা আশা করেন।

বাবাও তাঁর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রতি ভদ্রতা ও সম্ভ্রম দেখালেন। মওলানা ভাসানী বাবাকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন বাংলাদেশ মুক্ত হবে কি না এবং কত তাড়াতাড়ি। বাবা উত্তর দিলেন "তুমি যেটা চাইছ তা ঈশ্বর ইতিমধ্যে মঞ্জুর করে দিয়েছেন এবং শিগগিরই তা ঘটে যাবে। এটা এখন শুধু ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বর যেমন ইচ্ছা করেন সে অনুযায়ী ইতিহাসের পাতা উল্টানোর প্রশ্ন মাত্র।" মওলানা ভাসানী এই

উত্তরে খুব খুশি হলেন এবং তাঁর সচিবকে কথাটা ডাইরিতে লিখে রাখতে বললেন এই মহান সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী হিশাবে। তারপর বাবা তাঁকে আশ্রম ঘুরে দেখালেন, সেখানকার সকল কার্যক্রম তাঁকে ব্যাখ্যা করে বললেন এবং শেষটায় মওলানা ও তাঁর বন্ধুদেরকে তাঁর নিজের বসার ঘরে বসিয়ে ফল (প্রসাদ) খেতে দেওয়ার আদেশ করলেন। এটা ছিল বাবার শুভেচ্ছার এক বিরল নিদর্শন; আমি নিশ্চিত যে মওলানা তা অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন এবং চলে যাওয়ার আগে বাবার প্রতি প্রচুর সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

বেশ কিছুকাল যাবতই বাবা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা করে চলেছিলেন। এই সময় তাঁর হৃষীকেশ আশ্রমে যথারীতি দুর্গা পূজা চলছিল। পূজার শেষে মূর্তি গঙ্গানদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। এবার কিন্তু মূর্তিকে যথাদিবসে বিদায় দেওয়া হল না। বাবা সবাইকে বললেন : "মা আমার সঙ্গে আরও কিছুটা বেশি সময় ধরে থাকবেন। আমার কতগুলি জিনিশ আলোচনা করতে হবে।" দেখা গেল তিনি কাঁদছেন এবং মূর্তির প্রতি এমনিভাবে কথা বলছেন : "মা, আমি আজ রাতে গঙ্গা নদীতে ডুবিয়ে তোমাকে বিদায় দেব। এই নদীর পানির সঙ্গে সোজা বাংলাদেশে চলে যাও। সেখানে হাজার হাজার মানুষ কাঁদছে। তাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে, অপমানিত করা হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে। তাদের তুমি রক্ষা করো মা, জানোয়ারগুলিকে ছুড়ে ফেলো এবং ঈশ্বরপ্রেমী এই জাতিকে তুমি মুক্ত করো। তারা তোমার ওপর নির্ভর করে আছে মা, সুজন এবং আমার আরও কিছু শিষ্য সেখানে যাবে এই যুদ্ধে লড়ার জন্য। তাদের রক্ষা করো। তাদের জন্য সম্মান ও গৌরব এনে দাও, ও দুর্বৃত্তিনাশিনী... ।"

ঐ রাতে তিনি অশ্রুসজলচোখে ঐ মূর্তির কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা জানল কোথায় যুদ্ধ হবে এবং তার ফল কী। যুদ্ধের পরে আমাকে এসব কথা বলা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে আমাকে বাংলাদেশের জন্য এই দুর্ধর্ষ গেরিলাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের সামরিক-রাজনৈতিক দায়িত্ব দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। রিক্রুটিং করার কথা ছিল যুবনেতাদের। এই নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে সমগ্র গেরিলা অপারেশন পরিকল্পনা করার এবং আমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সে পরিকল্পনা কাজে পরিণত করার কথা ছিল আমার। স্বীয় আত্মার সন্তুষ্টির জন্য এর বেশি চাওয়ার মতো আমার কিছু ছিল না। আমার সমস্ত সময় এ কাজে ঢেলে দিলাম। টেক্সট বই ঘেটে সমাধান করা যাবে এমন ব্যাপার এটা ছিল না। এটা ছিল অনন্য কিছু, এর জন্য দরকার ছিল পরিপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা এবং আমার সমগ্র কর্মশক্তি।

এইসব যখন চলছিল তখন আমি ভাবছিলাম যে বর্তমানে পাকিস্তান কর্তৃক মোতায়েন করা হিংস্র পাঠান ও মিযো আধা-সামরিক বাহিনীগুলির বিরুদ্ধে, পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু

সর্বাপেক্ষা দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে লাগিয়ে দেওয়ার এ এক চমৎকার সুযোগ হতে পারে। এই পাক আধা-সামরিক বাহিনীগুলি পাক বিমানবাহিনীর দ্বারা এবং নিয়মিত পাক আর্মি ব্রিগেডসমূহ দ্বারাও সমর্থিত ছিল এবং এরা আমাদের আর্মির সবচেয়ে স্পর্শকাতর পার্শ্বভাগের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার চেয়ে বড় কথা এরা আরাকান রোড দখলে রাখছিল। আমাদের আর্মি দ্বারা পরাজিত হলে পাক সৈন্যদের জন্য বার্মায় পলায়নের একমাত্র স্থলপথ হত এই আরাকান রোড।

যতদূর বোঝা গেল জেনারেল মানেকশ'ও একই রকম চিন্তা করেছিলেন এবং একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন এই সম্ভাবনাটা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। আমাদের মনের মিল হয়ে গেল এবং আমি এই স্পেশাল ফোর্স অব নর্দার্ন হিল ট্রাইবসকে এই নতুন ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য তৈরি করার কাজ শুরু করলাম। এই ফোর্সের লীডাররা এবং জওয়ানরা এই কাজে যোগ দেওয়ার পরিপূর্ণ অর্থ বুঝতে বেশি সময় নেয়নি। তারা লিখিতভাবে আবেদন জানাল তাদের যেন এতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় এবং পাকিস্তান যদি কখনও এদেশের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তাহলে তারা যেন দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ পায়। কৃতজ্ঞতার সাথে এ আবেদন গ্রহণ করা হল। এখন আমার দুইটা ফাইটিং কমান্ড হল। সরাসরি এসএফএফ একটি কমান্ডো বাহিনী হিশাবে, এবং মুজিববাহিনী (গেরিলা বাহিনী), পরে যাদেরকে জেনারেল স্যাম মানেকশ'র নাম অনুসারে স্যামস বয়য (SAMS boys)-ও বলা হত। জেনারেল মানেকশ' জনাব তাজউদ্দিনকে বলেছিলেন যে তিনি নিজে এই বাহিনী গড়ে তুলেছেন আর্মির পক্ষে বিশেষ বিশেষ কর্মভার গ্রহণ ও সম্পন্ন করার জন্য। এতে করে কারা তাদের সৃষ্টি করেছে এবং কোন উদ্দেশ্যে, এই মর্মে পুরনো যে বিতর্ক ছিল তার অবসান হয়ে গেল।

কিন্তু প্রথমেই আমরা মিযোদের সম্বন্ধে এবং সংশি-ষ্ট এলাকা সম্বন্ধে আলোচনা করব। এ দুটিই খারাপের দিকে পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারত। ■

অধ্যায়–৮

মিযোগণ

এই উপজাতি বাস করে লুশাই পর্বতসমূহে, যা এখন মিযোরাম নামে ভারতের একটি আলাদা রাজ্য। উৎসের দিক দিয়ে তারা মঙ্গোল-প্রতিম এবং সাধারণত তারা শান্তিপ্রিয়, সহজে বশ মানা স্বভাবের। তাদের মধ্যে কিছু বাস করে সংলগ্ন বার্মার চীন পাহাড়সমূহে। তাদের বসতির এমন ছড়ানো ছিটানো চরিত্রের কারণে সামগ্রিক ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষ তাদেরকে তৎকালীন আসাম, বেঙ্গল ও বার্মার গভর্নরদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল।

এটা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, ১৮৯২ সালে এই এলাকাগুলিকে একটি মাত্র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনার একটা চেষ্টা চালানো হয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সেটা সম্ভবপর বলে দেখতে পেল না। দি স্টেট অ্যাক্ট অব ইন্ডিয়া ১৯৩৫ -এর আওতায় ভারতের ১৬ হাজার বর্গমাইলের মিযো এলাকাকে গভর্নর-জেনারেল-ইন-কাউন্সিল -এর বিশেষ দায়িত্বে দেওয়া হল। ব্রিটিশ সরকার এই স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকায় যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন নিষিদ্ধ করলেও ব্রিটিশ মিশনারিদেরকে পুরা সুবিধা দিয়েছিল এই সরল উপজাতীয়দেরকে খ্রিস্টান মতে ধর্মান্তরিত করার এবং তারা যতটা গ্রহণ করতে পারে ততটা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি এদের মধ্যে ছড়ানোর জন্য। এটা ছিল ব্রিটিশদের দীর্ঘমেয়াদি পলিসির অংশ। পলিসির উদ্দেশ্য নিজেদের জন্য একটা অবস্থান বজায় রাখা ভারত ও বার্মার মধ্যে, যারা উভয়েই স্বাধীনতা অর্জনের খুব কাছাকাছি ছিল। এই সরল ও ভালবাসাযোগ্য জনগণ নিয়ে গণ্ডগোলের শুরু হয়েছিল এই পলিসির ফলেই।

১৯৪৬ -এর এপ্রিলে ব্রিটিশ সরকার রাজনৈতিক দল গঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। এই সময় মিযো ইউনিয়ন পার্টি গঠিত হল। মি. চ সাপ্রংগা, এই পার্টির ভাইস-প্রেসিডেন্ট, এই অংশ থেকে একজন সংসদ সদস্য হিশাবে গৃহীত হলেন। ইউনাইটেড মিযো ফ্রীডম অর্গানাইযেশন নামে অন্য একটি সংগঠন তার প্রেসিডেন্ট মি. লালমাভিয়া -এর অধীনে একটি প্রতিনিধি দল বার্মার সঙ্গে তাদের একত্রীকরণের পন্থা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে বার্মার প্রধানমন্ত্রী উ-নু -এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পাঠালে বর্মি কর্তৃপক্ষ তাতে উৎসাহ দেখায়নি।

তৃতীয় রাজনৈতিক দল মিযো ইউনিয়ন কাউন্সিল, সার্বভৌমত্বের লক্ষ্যে পুনরেকত্রীকরণ চাচ্ছিল। এই দলের নেতারা ছিলেন অধিকতর শক্তিশালী মিযো ইউনিয়ন থেকে বহিস্কৃতরা। মিযো ইউনিয়ন -এর লক্ষ্য ছিল ভারতের সাথে একত্র হওয়া।

ঠিক এই সময়টায় ব্রিটিশ পলিটিক্যাল অফিসার ম্যাকডোনাল্ড সাহেব কুখ্যাত খলনায়কের ভূমিকা পালন করে চললেন। তিনি পুস্তিকার পর পুস্তিকা লিখে চললেন মানুষকে তাঁর ভাষায় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার শেখানোর জন্য। তিনি গির্জার নেতাদের এবং মিশনারিদের ব্যবহার করতে লাগলেন মিযোদেরকে তাদের ওপর ভারতীয় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আধিপত্যের ব্যাপারে এবং তাদের পরিপূর্ণ ভারতীয়করণের ও তাদের সম্প্রতি অর্জিত পাশ্চাত্য রুচিবোধ হারানোর আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে। তিনি মিযো ইউনিয়ন নেতাদের মারাত্মক পরিণতির ভয় পর্যন্ত দেখালেন যদি না তারা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীনতাকামী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস -এর লাইন অনুসরণ করতে বিরত হন। তিনি তাঁদের বললেন–"আপনাদেরকে বিশ্বাসঘাতক হিশাবে বিবেচনা করা হবে এবং কবর খুঁড়ে আপনাদের হাড় তুলে ক্লেদাক্ত নোংরার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হবে।"

ম্যাডোনাল্ড সাহেব এমনকি সংসদীয় গণতন্ত্রভিত্তিক একটি স্বাধীন মিযোরাম শাসনতন্ত্রও খসড়া করলেন যাতে ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুসরণে একটি উচ্চ ও একটি নিম্ন কক্ষ। তিনি এক্স-সার্ভিসমেন'স অ্যাসোসিয়েশন এবং লুশাই চীফস কাউন্সিল (যে দুটিই সরাসরি পলিটিক্যাল এজেন্টের তাঁবের মধ্যে ছিল) এবং মিযো ইউনিয়ন কাউন্সিল দলের সমর্থন সংগ্রহ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁর এই মূলত 'ম্যাকডোনাল্ড প্রস্তাব'কে সরাসরি লন্ডনের রাজকীয় সরকারের দ্বারা গ্রহণ করাতে ব্যর্থ হলেন। এই প্রস্তাবে একটা মৌলিক ত্রুটি ছিল যা বেশিরভাগ মিযোকে এর বিপক্ষে ঠেলে দিল। এই প্রস্তাব অনুযায়ী গ্রাম সর্দার যারা বংশগতভাবে একনায়কের বিপুল ক্ষমতা খাটাত, তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থান বহাল থাকবে বলে কথা ছিল। এর বিপরীতে মিযো ইউনিয়ন পার্টি জনগণকে বলেছিল যে ভারত প্রজাতন্ত্রের অংশ হিশাবে মিযোরামে বংশগত সর্দারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ হবে এবং সাধারণ মানুষ মত প্রকাশের সুযোগ পাবে। মিযোদের স্বাধীনতাপ্রিয় উপজাতীয় চরিত্র এই স্লোগানটি পছন্দ করল। সেদিন দেখা গেল মিযো ইউনিয়ন পার্টিরই জয়-জয়কার।

পরে ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের দূরভিসন্ধিমূলক কাজ হাতে নিলেন লুশাই হিলস -এর ব্রিটিশ তত্ত্বাবধায়ক এল এল পিটার্স সাহেব। তিনি তড়িঘড়ি একটা রাজনৈতিক কমিটি গঠন করলেন প্রধানত কাগজসর্বস্ব কতক পার্টির নেতাদের নিয়ে যেমন বিভিন্ন চার্চের প্রতিনিধিগণ, গ্রাম সর্দারদের কাউন্সিলের প্রতিনিধিগণ, এক্স-সার্ভিসমেন'স অ্যাসোসিয়েশন এবং মহিলা কল্যাণ সংগঠনের প্রতিনিধিগণ। তিনি নিজে এর সভাপতি হলেন এবং এইসব লোকের পক্ষ থেকে নিজে একপ্রস্ত সিদ্ধান্ত মুসাবিদা করে আসামের গভর্নরের কাছে পেশ করলেন।

মূলত এই সিদ্ধান্তে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে লুশাইরা

(মিযোরা) তাদের পছন্দমতো যে কোনও ডমিনিয়নে, যেমন পাকিস্তানে বা বার্মায়, যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে নাকি তাদেরকে ইতিমধ্যে ভারত ইউনিয়নের অংশ বলে নির্ধারণ করা হয়ে গেছে। ঐ সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি করে যেন তাদের প্রথাগত আইন ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা রক্ষিত এবং লুশাইরা ইচ্ছা করলে তারা যেন দশ বছর পরে যে কোনও সময় ভারত ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যেতে পারে। এ সিদ্ধান্তের তারিখ ছিল ১৪ আগস্ট ১৯৪৭। আসামের মহামহিম ব্রিটিশ গভর্নর এ সংক্রান্ত পত্রের কোনও জবাব দেননি। এতে বোঝা যায় যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এ পর্যায়ে এই স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকায় অস্থিরতা বাড়ানোর বিপক্ষে ছিল।

যা হোক, এলএল পিটার্স ও কতক মিশনারির মতো লোকেরা তাদের দূরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে গেল, এমনকি বাড়িয়ে তুলল।

২২ অক্টোবর ১৯৬১-তে মিযোরামে মিযো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হল। এর প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট শ্রী লালডেংগা এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রী লালনুন্মাভিয়া ভ্রমণের যথাযথ কাগজপত্র ছাড়া এবং ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানে যাওয়ার অভিযোগে ১৯৬৩ সনে গ্রেফতার হলেন। তাঁদেরকে অবশ্য দু'মাস পরে মুক্তি দেওয়া হল ভারতের আপশকামী নীতির কারণে।

এমএনএফ -এর এক প্রতিনিধি দল তার প্রেসিডেন্ট শ্রী লালডেংগার নেতৃত্বে ১৯৬৫ সনের ৩০ অক্টোবর আসামের গৌহাটিতে তৎকালীন শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তাঁরা এক স্বাধীন মিযোরাম রাষ্ট্র গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং তাকে অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার মতো সক্ষম করতে বার্মার চীন পাহাড়সমূহ ছাড়াও সংলগ্ন মিযো জনগণ অধ্যুষিত ভারতীয় এলাকা নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য জোর দাবি জানালেন। প্রধানমন্ত্রী ধৈর্যের সাথে তাঁদের কথা শুনে এই বলেছিলেন যে পরে তিনি এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করবেন।

এই রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে অহিংস পন্থা অবলম্বনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সত্ত্বেও শ্রী লালডেংগা এবং তার পার্টি গেরিলাদলসমূহ গঠন করে এবং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের সাথে যোগসাজশে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভারতীয় সীমান্তের ঠিক অপর পারে তাদের অনেক ঘাঁটি গড়ে তুলে।

এই নিরাপদ ঘাঁটিগুলি থেকে এবং সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং চীনা ইনস্ট্রাক্টরদের অধীনে প্রাপ্ত গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তানের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে তারা ভারতীয় অঞ্চল মিযোরামে হাঙ্গামা চালিয়ে যেতে লাগল।

এইসব সরল কিন্তু বিপথে চালিত উপজাতীয়রা তারা কী অবস্থার সম্মুখীন তার সঠিক

বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাদের পার্বত্য আবাসভূমি যে সড়ক ও রেলওয়ের মতো যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, কৃষি জমি বা খনিজ সম্পদও নেই এবং বনজ সম্পদও সামান্যই আছে, এসব কিছু তাদের ভবিষ্যতের জন্য ভাল অর্থনৈতিক বা অন্যান্য সম্ভাবনা দেখায় না। এটা স্পষ্ট যে ভারতের মতো এক উন্নয়নশীল দেশের অংশ হয়ে থাকা এবং ভারতের সাহায্যে তাদের বিরল সম্পদের যথাসম্ভব উন্নয়ন ঘটানোই তাদের স্বার্থের অনুকূল।

স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকার ভারতের পাহারাদার হিশাবে তারা ভারতের কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আশা করতে পারে। ভারত এ অঞ্চলে একমাত্র দেশ যার মিযোরামকে আর্থিকভাবে সহায়তা দানের মতো অবস্থা আছে।

মিযোদের অসন্তোষের কারণ বিবেচনা করলে দেখা যাবে ভারতের বিরুদ্ধে তাদের ক্রোধের মধ্যে বেশ অনেকটা প্রকৃত জিনিশ বিদ্যামান। পাশ্চাত্য জীবনের ও সভ্যতার মিথ্যা মূল্যবোধ ছাড়া ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আর কিছু দেয়নি। এছাড়া মিশনারিরা পরিশীলিত মিযো খ্রিস্টান সমাজের সঙ্গে দেশের বাদবাকি অংশের বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মীয় চিন্তাধারা সম্বন্ধে হীনকারী নিন্দাবাদ করার মাধ্যমে। ভারতীয়রাও এর চেয়ে ভাল কিছু করেনি। করার মধ্যে তারা তাদেরকে জাদুঘরে প্রদর্শনের বস্তু হিশাবে বিবেচনা করেছে এবং কেবল তাদের লোকনৃত্যকে অন্যদের সামনে তুলে ধরেছে। তাদের ক্ষুধা দূর করার উদ্দেশ্যে তাদের কৃষির উন্নয়ন ঘটানোর বা এমনকি ক্ষুদ্র মাপের শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্যও তেমন কোনও চেষ্টা করা হয়নি। ক্ষুদ্র মাপের শিল্প কারখানার জন্য মিযোরা ভাল কারিগর হতে পারে। গোটা রাজ্যটায় নাম করার মতো কোনও যন্ত্রপাতি নেই। রাজধানী আইযাওয়াল -এর সঙ্গে বাদবাকি ভারতের যোগাযোগের প্রধান মহাসড়কটি ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। সেখানে হাসপাতাল ও স্কুলের দারুণ অভাব। এদের চমৎকার পুরুষ ও নারীদের মুখমণ্ডলে হতাশা বিরাটভাবে অঙ্কিত থাকে কিন্তু তবু তারা তাদের দুর্দশা হেসে উড়িয়ে দিতে পারে। কিভাবে পারে তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

মোটের ওপর এই সরল উপজাতিগুলি কেবলমাত্র শান্তিতে জীবিকা অর্জন করতে চায়, তাছাড়া আর কিছু নয়। তাদের চরিত্র এবং সমস্যাবলি বোঝে, এমন একটি ভাল প্রশাসন পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের অবস্থার বৈপ-বিক পরিবর্তন সাধন করতে পারত এবং এমন এক সমাজের ভিত্তি তৈরি করত যা ঐ সীমান্তের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়ার উপযুক্ত অনুগত ও শক্ত সমর্থ মানুষের সমাজে পরিণত হত। দরকার হচ্ছে এমন প্রশাসন যা মিশনারির উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করবে, এবং এই চমৎকার মানুষগুলির প্রথাসমূহ এবং তাদের নতুন খ্রিস্ট ধর্মকে শ্রদ্ধা করবে। নিরাপত্তা বাহিনীগুলির কাজ

জনগণকে দমন করা নয়। তারা তাদের উদ্ধত ব্যবহার দ্বারা বড়জোর জনগণকে উত্ত্যক্ত করতে পারে। তাদেরকে ঠিক ঠিক বুঝিয়ে বলা চাই যে তারা প্রতিটি মিযোকে শত্রু বলে বিবেচনা করবে না।

মিযোদের মধ্যে অসন্তোষ বেশ ভাল রকম ছড়িয়েছিল এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের নিরাপদ ঘাঁটিগুলি পাকিস্তান ও চীনের দ্বারা প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে এমন পরিপূর্ণ হয়ে থাকত যে এই বৈরী ভূমিতে যে কোনও ভারতীয় অনুপ্রবেশ তারা প্রতিরোধ করতে পারত।

এই মিযোরা বাংলাদেশস্থ পাকিস্তান প্যারা-মিলিটারি ফোর্সেস -এর বেতনভুক ছিল। তারা চীনাদের দ্বারা গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পেয়েছিল। পাকিস্তান তাদেরকে সজ্জিত ও পার্বত্য চট্টগ্রামজুড়ে মোতায়েন করেছিল। পাক কর্তৃপক্ষ প্রতিটি পোস্টে মিযোদের পাশাপাশি বেলুচি, পাঠান ও পাঞ্জাবিদের ছোট ছোট ইউনিট রাখত এটা নিশ্চিত করতে তারা যেন সর্বশেষ লোক এবং সর্বশেষ রাউন্ড পর্যন্ত পাকিস্তানের স্বার্থে লড়াই করে। আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তাদের সম্বন্ধে আরও আলোচনা করব এবং যোদ্ধা হিশাবে এবং অন্যান্য ব্যাপারে তাদের গুণাগুণ পাঠকের সামনে তুলে ধরব।

প্রথমে আমরা আমাদের অপারেশন স্থান পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে একটা সমীক্ষা তুলে ধরি। ■

অধ্যায়—৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূখণ্ড

সে এক ঘন-জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য ভূমি। সেথায় খঅল দ্বারা বিভক্ত চারটি আলাদা আলাদা পর্বতমালা আছে। কর্ণফুলি নদীকে আটকানো গেলে সেই খালগুলি ভরে ওঠে বিশাল আকার ধারণ করে। সে ক্ষেত্রে কাপ্তাই বাঁধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কর্ণফুলি নদী সমগ্র এলাকাটিকে বিভক্ত করে প্রবাহিত। উত্তর-পূর্বে ভারতীয় আউটপোস্ট ডেমাগিরি থেকে শুরু করে কর্ণফুলি নদী দক্ষিণ-পশ্চিমে চট্টগ্রাম বন্দরে শেষ হয়েছে। নদীটির বেশির ভাগই নৌচলাচলের উপযুক্ত। গুরুত্বপূর্ণ শহর বর্কল, সুভলং, রাঙামাটি, চন্দ্রঘোনা এবং চট্টগ্রাম সব এক পারে অবস্থিত।

উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত কাসালং খাল সুভলং -এর সন্নিকটে এই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর পাড় বরাবরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহর আছে এবং এটাও নাব্য। এর সমান্ত রালে প্রবাহিত চিংগ্রি খাল রাঙামাটিতে এসে কর্ণফুলি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। এর পারেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ লোকালয় আছে। আরও শত শত খাল এবং হ্রদও রয়েছে।

কর্ণফুলি নদী এবং এই দুটি খাল হচ্ছে যোগাযোগের প্রধান ধমনি, এই চরম দুরূহ ভূভাগে যে কোনও সামরিক সাফল্যের ক্ষেত্রে চাবিকাঠি।

পায়ে চলা পথ, যেখানেই আছে, চলে গিয়েছে পাহাড়গুলির শীর্ষ ধরে। সাপ এবং অন্যান্য অনাকাঙ্ক্ষিত জীবেরা এ এলাকায় প্রচুর বর্তমান। আমাশয় এখানে সাধারণ ব্যাপার। ম্যালেরিয়া এবং আরও অনেক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগব্যাধি সম্বন্ধেও একই কথা।

আরও দক্ষিণে সাংগু নদী দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত। আরাকান সড়কের জন্য এ নদীর ওপর দোহাজারিতে সেতু তৈরি করা আছে। একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু হিশাবে এই সেতুটি ধ্বংসের জন্য এসএফএফ -এর ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব সীমান্তের সংলগ্ন হচ্ছে ভারতের মিযোরাম রাজ্য। এ সীমান্তে ভারতের কিছু বর্ডার পোস্ট আছে যেখানে সব ধরনের চলাচলের জন্য আকাশপথের ওপর নির্ভর করতে হয়। ব্যতিক্রম শুধু ডেমাগিরি, ডেমাগিরি থেকে আইযাওয়াল পর্যন্ত মোটামুটি চলনসই রাস্তা আছে। মিযো বিদ্রোহীরা এই সীমান্ত অতিক্রম করে আবার ফিরে যেত তাদের দুর্গম কিন্তু রসদে পরিপূর্ণ পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘাঁটিগুলিতে, এ কাজে পাক কর্তৃপক্ষের নীরব সমর্থন থাকত।

এই এলাকায় যে বৌদ্ধ চাকমা উপজতি বাস করে, বাংলদেশিদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের কোনও সহানুভূতি ছিল না। আসলে তাদের রাজা শ্রী ত্রিদিব

রায় ইসলামাবাদ থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাদেরকে বাংলাদেশ-বিরোধী অবস্থান নিতে প্রলুব্ধ করার জন্য। মিযো এবং চাকমা উভয়ই আমাদের অপারেশনগুলির সময় অত্যন্ত শত্রুতামূলক ভূমিকা পালন করেছিল।

এই অংশে আমার যুদ্ধকালীন অবস্থানের পরেই কেবল আমি পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছিলাম বার্মা ও আসামের মিযো অধ্যুষিত অংশগুলিসহ একটি পাশ্চাত্যপন্থী খ্রিস্টান মিযোল্যান্ড প্রতিষ্ঠায় ব্রিটিশ পরিকল্পনার গুরুত্ব। এই একই পরিকল্পনা চীনও অনুসরণ করেছে বলে মনে হয় বৃহত্তর পরিসরে, উলি-খিত ভূখণ্ডের সঙ্গে নাগাল্যান্ডকেও সংযুক্ত করে। শত্রুর হাতে এটা একটা চরম দুর্দান্ত গেরিলা ঘাঁটিতে পরিণত হয়ে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারত।

চট্টগ্রামের সমতল ভূমিতেও প্রচুর গাছপালা আছে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে মাত্র দুটি রাস্তা আছে। অতঃপর আছে সেই বিখ্যাত আরাকান রোড যা বাংলাদেশ ও বার্মার মধ্যে একমাত্র স্থল-সংযোগ এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে পরাস্ত শত্রুদের একমাত্র পলায়ন পথ।

আলোচ্য ভূখণ্ডে প্রায়ই প্রচণ্ড তীব্রতায় ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এরকম একটা ঝড়ের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল যখন আমরা অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীভূত হচ্ছিলাম। তাতে কুটিরগুলির চাল ও বেড়া উড়ে গিয়েছিল, গাছপালা উপড়ে গিয়েছিল। যা কিছু খননকৃত পরিখার মধ্যে, তা সব নিরাপদ; মাটির ওপরে যা কিছু তা নিরাপদ নয়।

মনের মিল ঘটল

আর্মি চীফ স্যাম মানেকশ', যিনি তাঁর বন্ধুদের এবং গুণমুগ্ধদের কাছে 'স্যাম' বলে অভিহিত হতেন, এই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সকল প্রাপ্তব্য উপাদান ব্যবহারের জন্য উৎসুক ছিলেন। পাকিস্তান যুদ্ধটা শুরু করবে এটা নিশ্চিত মনে হচ্ছিল। স্পষ্টতই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের দুরধিগম্য ভূমিতে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে ব্যবহার করতে মনস্থির করেছিলেন। সেই পার্বত্য ভূমি হচ্ছে সবদিক দিয়ে পানিতে ঘেরা পথচিহ্নহীন জঙ্গল ও পাহাড়ে পূর্ণ।

প্রথমত সেখানে যে বিখ্যাত কাপ্তাই বাঁধ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করত তা তিনি ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। বাঁধটা এই জংলা ভূমির মধ্য ভাগে অবস্থিত থাকায় একমাত্র গেরিলা অ্যাকশন সেটাকে ধ্বংস করতে পারত। এর ধ্বংসের ফলে পুরা এলাকাটা প-াবিত হত এবং সেখানে মোতায়েন পাকিস্তানের নিয়মিত এবং আধা-সামরিক বাহিনীগুলির জন্য বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি করত।

দ্বিতীয়ত, সেখানে ছিল বিখ্যাত আরাকান রোড যা ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, তারপর কক্সবাজার এবং সমুদ্র উপকূল বরাবর বার্মায় গিয়েছে। পাক আর্মির সৈন্যদের জন্য বার্মায় সরে গিয়ে শত্রু থেকে নিরাপদ হওয়ার একমাত্র স্থলপথ ছিল এটাই। পলায়নপর পাক আর্মিকে তুলে নেওয়ার জন্য মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে আগমন করলেও এটাই হত একমাত্র পথ যা পাকিস্তানিরা ব্যবহার করতে পারত। শ্রেষ্ঠতম বেলামুখ এলাকার কয়েকটা ছিল চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষিণ দিকে। সুতরাং পাক আর্মির পক্ষে এই সড়কের গুরুত্ব এত বেশি ছিল যে তা একেবারেই বাড়িয়ে বলা সম্ভব নয়।

তৃতীয়ত, খোদ চট্টগ্রাম বন্দর ছিল প্রধান বন্দর যেখানে পাকিস্তান থেকে ও তার মিত্রদের কাছ থেকে সৈন্য ও রসদের নতুন চালান এসে নামত। এই বন্দর আক্রমণ করা ও বন্ধ করে দেওয়া ছিল ভারতীয় আর্মির জন্য এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, যেমন এটাকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করা ছিল পাক আর্মির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই সত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পাক কর্তৃপক্ষ এই অংশে নিয়মিত বাহিনীর ও আধা-সামরিক বাহিনীর প্রায় ৮ হাজার লোক মোতায়েন করেছিল।

এই এলাকার গুরুত্ব আরও বেড়েছিল এজন্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ঢাকার দিকে আক্রমণ চালাতে উন্মুখ ভারতীয় আর্মি কোর -এর পূর্ব পার্শ্বের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়েছিল। সে হুমকি দূর করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সুতরাং জেনারেল মানেকশ' এই এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য এসএফএফ -এর দুর্ধর্ষ গেরিলাদেরকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করলেন, কারণ এটাই ছিল আর্টিলারি ও বিমান সমর্থন ছাড়া লড়াই চালাতে পারার মতো একমাত্র ফোর্স; এমনকি ব্যাপকভাবে জলাশয় পারাপারের আবশ্যকতা সত্ত্বেও তার জন্য এই ফোর্সের কোনও বিশেষ জলযানের সরবরাহের প্রয়োজন ছিল না; জলাশয় পারাপারের জন্য তারা স্থানীয় ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা প্রস্তুত করে নিতে পারত। তাঁর সূক্ষ্মদর্শী মেধার দ্বারা তিনি এই সমস্যার সবচেয়ে উত্তম সমাধানটি ভেবে বের করে ফেলেছিলেন।

এরই মধ্যে আমিও ভাবছিলাম পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ হলে এসএফএফ-কে কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত এলাকা কোনটা হতে পারে। আমার ছিল দ্বৈত ক্ষমতা। মুজিববাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর আমার দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশ অঞ্চলের গভীরে তাদের পাঠানো এবং সামগ্রিক বিদ্রোহটাকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটা করা যেত যদি বাংলাদেশ সীমান্তে কর্মরত আমার সেক্টর কমান্ডারদের সঙ্গে সংযোগ রাখতাম। কিন্তু আমি ভাবলাম সবচেয়ে ভাল হয় বাংলাদেশের মধ্যে গভীর অভ্যন্তরে কোনও এক নিরাপদ এলাকায় প্রবেশ করে সেখান থেকে এই গোটা অপারেশনটা দেখাশোনা করা। এবং সেজন্য বিচ্ছিন্ন পার্বত্য চট্টগ্রামের চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? আমি আরও

চাচ্ছিলাম এই ফোর্সটা কিছুটা স্বাধীন ভূমিকা পালন করুক যাতে আমরা এবং ভারতীয় আর্মি একে অপরের পথে না এসে পড়ি। আমার একটা স্বাভাবিক অনীহা ছিল লড়াই -এর এমন কোনও ভূমিকায় যেখানে আপনার রণকৌশলগুলি বলে দেবে একজন অনমনীয় নিয়মিত সৈনিক যার হাতে থাকবে আপনার সকল অ্যাকশনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সামগ্রী। একটা গেরিলা ফোর্সের জন্য এর চেয়ে কম ফলদায়ক আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং আমি প্রার্থনা করছিলাম যে এই যুদ্ধে অংশ নিতে যদি এসএফএফ -এর ডাক আসে তাহলে আমাকে যেন দুরূহ কিন্তু উপযুক্ত রণক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম দেওয়া হয় যেখানে আমি আর্মি হতে কম-বেশি স্বাধীন থেকে আমার লোকদেরকে উদ্যোগ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ দিতে পারব। আমাদের বিপুল সৌভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত তাই-ই হয়েছিল।

আর্মি চীফ আমাকে ডেকে পাঠালেন। যুদ্ধে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স -এর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মনে কী আছে তা ব্যাখ্যা করে বললেন। এটা আমি যা কল্পনা করেছিলাম ঠিক তাই। আমাদের মনের মিল হল এবং আমাকে অবিলম্বে কাজটির জন্য প্রস্তুত হতে বলা হল। আমি বেশ খুশি মনে ফিরে আসলাম এবং অপারেশনের সেই এলাকায় ঢুকে পড়ার জন্য আমার পরিকল্পনাগুলি তৈরি করতে শুরু করলাম।

আমাদের গোপন স্থানান্তর প্রক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত বিমান পরিবহনের সাহায্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে আর্মির গাড়িসমূহ আমাদের রাস্তার মাথা পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যাবে। এই স্থানটিতে আমাদের সবাই একত্রিত হবে এবং সেখান থেকে তাদের পায়ে হেঁটে সামনে বাড়তে দেওয়া হবে স্বশরীরে সরঞ্জামাদি বহন করে। এর মানে দাঁড়াল এক জটিল স্থানান্তর পরিকল্পনা যা অন্যান্য এজেন্সিসমূহের সদিচ্ছা এবং দক্ষতার ওপর বিরাটভাবে নির্ভর করছিল এবং এর বিশদ ছকের শেষটা পর্যন্ত ঠিক ঠিক সম্পন্ন করা আবশ্যক ছিল। এই মতো যখন পরিকল্পনা করা চলছিল তখন আমি আর্মি সদর দফতর থেকে বহু প্রতীক্ষিত আদেশনামা পেলাম 'ইনস্ট্রাকশন' -এর আকারে।

বহ্বাড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া

আর্মির মধ্যে 'ইনস্ট্রাকশন' শব্দটা দিয়ে বোঝানো হয় একজন স্বাধীন কমান্ডারের প্রতি সেই আদেশ যার দ্বারা গ্রহীতা অপারেশন চালানোর ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ উদ্যোগ নিজের হাতে পায়। ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে একটা গাইডলাইন এবং সেটা বিদ্যমান পরিস্থিতির আলোকে যথাসম্ভব সবচেয়ে ভালভাবে প্রয়োগ করতে হয়। এটা পরিষ্কার ছিল যে ফোর্সটি সরাসরি চীফ অব আর্মি স্টাফ (সিওএএস) -এর নির্দেশের অধীনে কাজ

চালাবে, ঈস্টার্ন আর্মি কমান্ডার -এর নির্দেশের অধীনে নয়। কাছাকাছি আর্মি কোরগুলির সঙ্গেও এর কোনও কিছু করণীয় থাকবে না। এ ব্যবস্থায় কাজের সর্বাধিক স্বাধীনতা থাকল, শুধু এটুকু ব্যতিক্রমসহ যে আকাশ থেকে সরবরাহ নামিয়ে দেওয়া এবং মোটরযানের ব্যাপারে আমরা জিওসি-ইন-সি ঈস্টার্ন কমান্ড লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরার ওপর নির্ভরশীল ছিলাম। এ পর্যন্ত ভালই ছিল, কিন্তু বিভিন্ন কাজের বরাদ্দটা পাঠ করে আমি চমকে গেলাম।

এসএফএফ-কে বলা হয়েছিল কাপ্তাই বাঁধ এবং কিছু সেতু এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উড়িয়ে দিতে, ঐ এলাকায় মোতায়েন পাক বাহিনীর ওপর সাধারণভাবে হয়রানি চালিয়ে যেতে, যাতে পাক সংরক্ষিত অতিরিক্ত সেনাদলের এ এলাকায় আসতে হয় এবং আক্রমণকারী কোরের পার্শ্বভাগ নিরাপদ হয়। মৌখিকভাবে চীফ অব আর্মি স্টাফ বলেছিলেন যে এটা তাঁর জন্য সন্তুষ্টির চেয়ে বেশি কিছু হবে যদি এসএফএফ এই কাজগুলি নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সম্পন্ন করতে পারে। এটা স্পষ্ট হল যে আর্মি সদর দফতর এই ফোর্সের সম্ভাবনা সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিল না। কিন্তু এর সম্ভাবনা ছিল যে সব কাজ দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। তাছাড়া আমি ব্যগ্রভাবে চাচ্ছিলাম যে এই লোকেরা তাদের একেবারে প্রথম অ্যাকশনে বিশাল একটা কিছু সাফল্য অর্জন করুক যাতে তাদের মনোবল বাড়ে এবং প্রমাণ হয় যে জাতি শান্তির সময় এই বাহিনীর পিছনে যে অর্থ ব্যয় করেছে তা সার্থক ব্যয় ছিল।

আমি চীফ অব আর্মি স্টাফ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই কার্যভারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বললাম যে এতে আমার লোকদেরকে উদ্দীপিত করার মতো যোগ্য চ্যালেঞ্জ অনুপস্থিত। তিনি একটু নরম হলেন, আমি কী চাই তা জানতে চাইলেন।

আমি বললাম–"আমাকে চট্টগ্রাম বন্দর দখল করাটা আমার প্রধান কাজ হিশাবে দিন। কাপ্তাই বাঁধ ভাঙার মতো অন্য কাজগুলি অতিরিক্ত কাজ হিশাবে ঠিক ঠিক জায়গা মতো এসে পড়বে। এটা লোকগুলির সামনে একটা উপযুক্ত চ্যালেঞ্জ হিশাবে আসবে এবং আমার অপারেশনে গতিবেগ দান করবে।" তিনি বললেন–"তুমি কিভাবে এই শক্ত-প্রতিরোধযুক্ত জায়গাটা দখল করবে? তোমার তো বিমান ও আর্টিলারি সমর্থন থাকবে না। তোমার এমনকি ভারী মর্টারও নেই।" আমি বললাম–"সেটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আমরা আপনার বিশ্বাসের উপযুক্ত বলে নিজেদেরকে প্রমাণ করব।"

তিনি কথা দিলেন আমার অনুরোধ তিনি পরে বিবেচনা করবেন। আমি অনুভব করলাম যে আমাদের ওপর এমন একটা ভারী দায়িত্ব দেওয়ার আগে যুদ্ধে আমাদের সামর্থ্যের কিছু প্রমাণ তিনি দেখতে চান এবং এজন্য আমি তাঁকে দোষ দিই না। আর্মির মধ্যে এই ফোর্সের বিরুদ্ধে এত বেশি প্রতিকূল প্রচারণা বছরের পর বছর চালানো হয়েছে যে স্যাম

মানেকশ'র মতো সমদর্শী পক্ষপাতহীন কমান্ডারও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

এর মধ্যে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী ডিপি ধর আমাকে ডেকে পাঠালে আমি আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে তাঁকে প্রত্যয়বান করার এক সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি তাঁকে বললাম যে আমার মস্ত আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর দখল করার পর, নৌপথে ঢাকার দিকে অগ্রসর হওয়া, গোপনে মুজিববাহিনীর সহায়তা নিয়ে ১শ' এসএফএফ সেনাকে ঢাকায় অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া এবং ঐ শহরে ইতিপূর্বেই গোপনে কর্মরত প্রায় ২ হাজার মুজিববাহিনীর ছেলেকে আরও কর্মসচল করে তোলার মাধ্যমে সেখানকার শত্রু সেনাদের মধ্যে ব্যাপক ধ্বংস ঘটানো। এসব করলে শত্রুর মনোবল এমনভাবে ভেঙে যাবে যে কাছে-পিঠে ভারতীয় আর্মির সেনা দেখা মাত্রই সে আত্মসমর্পণ করবে। আমার মুজিববাহিনীর নেতারা সবাই অপারেশনসমূহ তাড়াতাড়ি শেষ করার এই পরিকল্পনার বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার ব্যাপারে প্রত্যয়ী ছিলেন। আমরা ঐ সময় সন্দেহ করছিলাম যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করা হতে পারে যাতে পাক মিত্র ও বন্ধুর পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য হস্তক্ষেপ করার সুযোগ পায়।

আমি মানচিত্রের ওপর খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখিয়ে এসব ব্যাপার শ্রী ডিপি ধর -কে বুঝিয়ে দিলাম। তিনি কথা দিলেন আমাকে প্রথমেই চট্টগ্রাম বন্দর দখল করার দায়িত্ব দেওয়ার জন্য চীফ অব আর্মি স্টাফকে চাপ দেবেন। আমি জানতাম চীফ অব আর্মি স্টাফকে বোঝানো যায় কিন্তু চাপ দেওয়া যায় না। এবং বোঝানোর সবচে' ভাল উপায় হচ্ছে আমাদের সামর্থ্যের প্রমাণ। সুতরাং আমি ঠিক করলাম সম্ভাব্য সবকিছু করব যাতে বড় রকমের সাফল্য আসে, একেবারে শুরুতেই যেন বিশাল বিজয় অর্জিত হয়।

আমি পুরা পরিকল্পনাটা আমার বেসামরিক চীফ শ্রী আরএনকাও -এর কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছিলাম। আমার ওপর তাঁর প্রচুর বিশ্বাস ছিল। অবশ্য এসএফএফ -এর ধারণার একদম সূত্রপাত থেকে আর্মি ও এসএফএফ -এর মধ্যে চলে আসা বোঝাপড়ার অভাব এবং তার ওপর আর্টিলারি ও বিমান সমর্থনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি দৃষ্টে আমরা শেষ পর্যন্ত কী ফলাফল অর্জন করতে পারব সে ব্যাপারে তিনি সন্দিহান ছিলেন। আর্মি আমাকে যে প্রশাসনিক সহযোগিতা দানের কথা দিয়েছিল এমনকি সে ব্যাপারেও তিনি তেমন নিশ্চিত ছিলেন না। একই ব্যাপারে আমার নিজেরও ভয় ছিল। কিন্তু একেবারে জন্মগত আশাবাদী হওয়াতে এবং ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রেখে আমি ভেবেছিলাম যে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

অবশ্য আমার সবচেয়ে বড় সংঘাতটা হয় আমার সংগঠনের এয়ার উইং -এর সাথে। তারা তাদের ফ্লীট থেকে এমনকি দুইটা পুরনো হেলিকপ্টারও এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনের জন্য আমার কমান্ডে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। সংশি-ষ্ট পরিচালক মনে

হল সেগুলিকে ঘাঁটিতে রেখে দিতে অত্যন্ত আগ্রহী, যাতে যুদ্ধে সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এই বেসামরিক কর্তার কাছে তাঁর হেলিকপ্টারগুলির নিরাপত্তার তুলনায় সৈনিকদের জীবন এবং এই অপারেশনের সাফল্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে দেখা গেল। এক্ষেত্রে মনের মিল ঘটল না। আমার বেসামরিক চীফ শেষ পর্যন্ত চমৎকার ক্রু সমেত একটি হেলিকপ্টার আমার জন্য জোগাড় করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কল্পনা করুন স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স -এর মতো সম্ভাবনাময় ফোর্স একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে নামল একটি মাত্র হেলিকপ্টার নিয়ে, যেখানে প্রয়োজন ছিল কমপক্ষে ছয়টা।

এমন সব বড় বড় প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমরা যে বিশিষ্ট সাফল্যসমূহ অর্জন করেছিলাম তা দেখিয়ে দেয় কী বিপুল তেজ ও উদ্দীপনা এ সময়ে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স-কে ব্যাপ্ত করে রেখেছিল। ■

অধ্যায়—১০

ব্যাঘ্রদের পোষ মানানো

অক্টোবর ১৯৬২ -এর চৈনিক আক্রমণের পর খুব শীঘ্রই দুর্গম উত্তরের পাহাড়ের উপজাতীয়দের মধ্য থেকে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স গড়ে তোলা হয়েছিল। শ্রী বিএন মলি-ক তাঁর *দি চাইনীয বিট্রেয়াল—মাই ইয়ারস উইথ নেহ্রু* নামের বই -এ এই ফোর্সের কথা উলে-খ করেছেন। মূলত এই সীমান্ত-জনদের কাজ ছিল চীনারা যদি কখনও আবার ভারতের ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে তাহলে তাদের লাইনের পিছনে থেকে গেরিলা যুদ্ধ করে চীনাদের বিরুদ্ধে গোটা লড়াই -এ সাহায্য করা।

এ লোকগুলি সবাই দৈহিকভাবে অত্যন্ত শক্ত-সমর্থ এবং একেবারেই ভয়শূন্য। পুনর্জন্মে বিশ্বাসী এই লোকগুলি মৃত্যুকে বিবেচনা করে ভবিষ্যতের এক শ্রেয়তর জীবনের সিং-দরোজা হিশাবে। এটা তাদেরকে প্রায়ই বেপরোয়া করে তোলে। তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি এবং বিপদের প্রতি সহজ-প্রবৃত্তিজাত প্রতিক্রিয়ার কারণে তারা গেরিলা প্রশিক্ষণের জন্য রিক্রুট হিশাবে অনন্য সাধারণ। তারা আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ভালবাসে এবং শিগগিরই অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে। একটা জিনিশ তারা খুব অপছন্দ করে তা হচ্ছে তাদের অস্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তারা তাদের হালকা মেশিনগান সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতে পছন্দ করে, এবং সেগুলি রেগুলার কোয়ার্টার-গার্ডে নিরাপদ জিম্মায় রাখার ব্যাপারটা তারা বুঝতেই পারে না। এমনকি অনেকে ইউনিট কোয়ার্টার-গার্ডে অস্ত্র জমা রাখতে বললে অপমানিত বোধ করতে পারে এবং সন্দেহ করতে শুরু করতে পারে যে কর্তৃপক্ষ হয়তো তাদেরকে বিশ্বাস করছে না। তাদের ফুসফুসের ক্ষমতা বিপুল, তার সাথে তাদের অসাধারণ দৈহিক শ্রম সহ্য করার ক্ষমতা যোগ হওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের থেকে অনেক উচ্চ স্থানে লড়াই করার জন্য তারা আদর্শ যোদ্ধা হয়ে ওঠে।

তাদের একেবারে স্বাধীনচেতা স্বভাব এবং বেশ ভাল রকম পৌরুষ গর্বের কারণে তারা আরোপিত শৃঙ্খলার বশ হতে চায় না। এটাও অনুভব করা গিয়েছিল যে তাদেরকে আর্মি বা পুলিশ অ্যাক্ট -এর অধীনে আনলে তাদের স্বাধীন উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুণগুলিই ভোঁতা হয়ে যাবে অথচ ওগুলিই দেশপ্রেমিক গেরিলার প্রাণস্বরূপ। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই স্বেচ্ছাসেবক ফোর্সটি একটি সিভিলিয়ান ফোর্স হিশাবে সংগঠিত হয়ে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালকের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করবে। ঐ সময় ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক ছিলেন শ্রী বিএন মলি-ক। ঠিক হল তাদের প্রশিক্ষণের এবং শান্তি ও যুদ্ধকালে তাদের মোতায়েনের

ভার অর্পণ করা হবে প্রথা-বহির্ভূত মনের এক সৈনিকের ওপর যিনি তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনের সময় তাদেরকে লড়াই -এ নামাতে পারবেন কঠিন আর্মি কোড -এর সাহায্য ছাড়া, যে কোডে কর্তব্য এড়ানো এবং অবৈধ কর্ম সাধনের বিবিধ অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে।

আর্মি সদর দফতরের পছন্দ এসে পড়ল আমার ওপর। আমি তখন একটা ফীল্ড এরিয়াতে এক আর্টিলারি ব্রিগেডের কমান্ডে ছিলাম। আমি সবে ভালভাবে অর্জিত একটা ছুটিতে এসেছি, তখন আমাকে ডাকা হল এই অনন্য সাধারণ ফোর্সের দায়িত্ব নিতে। তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ মেনন চীফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট-জেনারেল বিএম কাউলের উপস্থিতিতে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাক্ষাৎকার নিলেন এবং আমার কাজের দুরূহতা এবং বিপদসংকুল চরিত্র সম্বন্ধে আমার মনে কোনও সন্দেহ অবশিষ্ট রাখলেন না। আমি সব সময়েই এমন কিছু একটা চ্যালেঞ্জের জন্য উদগ্রীব ছিলাম কিন্তু এটা ছিল এমন কিছু যা ছিল আমার স্বপ্নেরও অতীত। আমাকে বলা হয়েছিল যে এমন একটা ফোর্সকে আর্মি অ্যাক্টের সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হচ্ছে বুনো বাঘকে পোষ মানানোর মতো এবং সে প্রক্রিয়ায় বার বার জখম হওয়ার জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সেই পিছনের সময় থেকে এগিয়ে এসে আমি আনন্দের সাথে বলতে পারি যে এই ফোর্সকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার দুঃসাধ্যতা সম্বন্ধে উচ্চ কর্তৃপক্ষ যে ভয় প্রকাশ করেছিল তা ছিল ভিত্তিহীন। এত বিচিত্র উৎস থেকে নেওয়া এত বেচিত্র্যপূর্ণ মিশ্রণে গঠিত ফোর্স এর চেয়ে ভাল শৃঙ্খলা প্রদর্শন করেছে এমন রেকর্ড নেই। আমাদের মধ্যে অপরাধ ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রত্যেকে শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অনেক বছরের মধ্যে একটা মাত্র দুর্ভাগ্যজনক আত্মহত্যার ঘটনা সমগ্র ফোর্সের মধ্যে ঘটেছিল। ঘটেছিল এ কারণে যে সংশি-ষ্ট ব্যক্তি এক মেডিকেল পরীক্ষায় প্যারাশুট ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারে অনুপযুক্ত বলে দেখা গিয়েছিল। তার গোড়ালির গঠন ক্রটিপূর্ণ ছিল, তাকে ঝাঁপ দিতে দিলে তার পা অথবা মেরুদণ্ড ভেঙে যেত। সে প্রত্যেক লীডারের কাছে গিয়ে আবেদন করল তাকে যেন ঝাঁপ দিতে দেওয়া হয় কিন্তু তার আবেদন গৃহীত হয়নি। অত্যন্ত দেশপ্রেমিক, সাহসী ও সংবেদনশীল এই ব্যক্তিটি তখন একটা গাছ থেকে ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিল।

তার অনুভূতিগুলি তার লীডারদের মনে এই ধারণা এঁকে দিয়ে গেল যে তার সত্যিকারের শারীরিক অসামর্থ্যও তাকে তার সহকর্মীদের চোখে কাপুরুষ বলে প্রতিভাত করত কারণ সে তো প্যারাশুট-ঝাঁপ দিতে পারত না– এই ছিল একেবারে

প্রথম বিপদ যার সম্মুখীন হয়েছিল এই ফোর্স। ওরকম পরিস্থিতিতে তার জীবনের কোনও অর্থ ছিল না বলে সে বোধ করেছিল।

এমনধারা উদ্দীনার জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল এ ফোর্সের মধ্যে।

আমার আদেশে তারা তাদের পানাসক্তি এবং জুয়ায় আসক্তি সংযত করেছিল। এতে করে তাদের মধ্যেকার গণ্ডগোলের বড় রকমের কারণগুলি দূর হয়েছিল। অবসর পেলেই উদ্দাম নৃত্য এবং বৌদ্ধ ধর্ম সংগীতের গান বাজনায় তারা মেতে উঠত। যে কোনও অসংগত আচরণের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ছিল নিজেদের সম্প্রদায়ের সমাজের সামনে প্রদর্শিত হওয়া ও ধিক্কার। আর ভুল কাজ করা লোককে একজন লীডার সবচেয়ে খারাপ ধরনের যে ভয় প্রদর্শন করতে পারত তা হচ্ছে তাকে আমার অর্থাৎ ফোর্স কমান্ডার -এর সামনে হাজির করা, তার মর্মমূলের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য।

যেহেতু স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স -এর ভারতীয় আর্মির ঘনিষ্ঠ সমর্থনে কাজ করার কথা সেহেতু সীমান্তে মোতায়েন ইউনিট ও ফর্মেশনসমূহের সঙ্গে তাদের সমবেত মহড়া করতে হত, যাতে তারা আস্থা অর্জন করতে পারে। আর্মি অবশ্য দাবি করত তাদেরকে আর্মির কমান্ডের অধীনে নিয়মিত সৈনিকদের মতো প্রশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হোক তাদের পক্ষে কাজে লাগার উপযুক্ত হওয়ার জন্য। এটা সম্ভব ছিল না এবং এতে করে একটা গণ্ডগোল চলতে থাকত যার আর শেষ ছিল না।

একটা পার্বত্য এলাকায় একটা আর্মি ব্রিগেডের বিরুদ্ধে গোটা ফোর্সটার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য আর্মি সদর দফতর একটা মহড়ার আদেশ দিল। এটা স্পষ্ট হল যে তারা এই ফোর্সের সঠিক কর্মক্ষমতা পুরোপুরি বুঝতে পারেনি। আমি বললাম যে এসএফএফ -এর শ'খানেক যোদ্ধা আর্মি ব্রিগেডটিকে আটকে ফেলার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু তারা আমাকে বিশ্বাস করল না। শেষ পর্যন্ত তাদের বুঝিয়ে রাজি করা হল। ডিরেক্টর অব মিলিটারি ট্রেনিং, একজন মেজর জেনারেল, নিজে মহড়াটা পরিচালনা করবেন এবং শত্রু কোর কমান্ডারের ভূমিকাও গ্রহণ করবেন। ভরা দিবালোকে আমার লোকেরা তাঁকে ফাঁদে আটকে ফেলল এবং তাদের নিজের আম্পায়ারকে বলল তাঁকে নিহত বলে রেকর্ড করতে কারণ তিনি পাঁচ মিটারের মতো দূর থেকে তাদের রাইফেলের মুখোমুখি হয়ে পড়লেন। যে দারুণ পরিকল্পনা ও রণকৌশলের সাহায্যে তারা গোটা ব্রিগেডটাকে একদম লেজে-গোবরে অবস্থায় ফেলে আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গির মধ্যে এঁটে ফেলল তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল সব ক'জন শত্রু আম্পায়ার। তারা তাঁর বেতার ও তার যোগাযোগ, গোলাবারুদ ও সরবরাহ ডাম্প ধ্বংস করে দিয়ে তাঁকে প্রধান মহাসড়কে আটকে দিল, সেখান থেকে সরতে গেলেই

বিস্তর ক্ষতি সাধন করছিল। চীফ আম্পায়ার আমাকে রিপোর্ট দেখালেন এবং আমার লোকদের অতি উত্তম প্রশিক্ষণের জন্য আমাকে অভিনন্দন জানালেন। কিন্তু আর্মি সদর দফতর রিপোর্টটা ছিঁড়ে ফেলে তড়িঘড়ি একটা চিঠি পাঠিয়ে দিল যাতে দেখানো হল যে এসএফএফ -এর প্রশিক্ষণ কত দুর্বল ছিল। একই সঙ্গে আমাদের মহড়ায় শত্রু আর্মি ব্রিগেড কমান্ডারকে এত ছোট একটা গেরিলা দলের হাতে পর্যুদস্ত হওয়ায় অদক্ষতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হল।

এটা মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে আর্মি সরকারের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিল এসএফএফ-কে তার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের কমান্ডের অধীনে আনতেই হবে। রাজনৈতিক পর্যায়ে সেই কার্যক্রম যাতে শুরু করা হয় সেই লক্ষ্যে ঐ মহড়ার বিষয়ে তাদের মূল্যায়ন আর্মি সদর দফতর প্রতিরক্ষা সচিবের কাছে জানিয়ে দিল।

কিছু কিছু আর্মির মধ্যে একজন ফীল্ড কমান্ডারকে অপবাদ দেওয়ার সবচেয়ে ভাল কৌশল হচ্ছে তাকে কোনও মহড়ায় ব্যর্থ হিশাবে প্রমাণ করা, আর মহড়ার ফলাফল বিচার করেন একজন উপরওয়ালা যিনি মহড়ার অধীন শিকারের ওপর প্রতিশোধ নিতে ঝুঁকে আছেন। এই স্বেচ্ছাচারী খেলায় কোনও নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলী থাকে না। এখানে কোনও পুনর্বিচারের আবেদনও চলে না কারণ প্রথা অনুযায়ী ঊর্ধ্বতন অফিসারকেই সমস্ত সামরিক বিজ্ঞতার ভাণ্ডার হিশাবে ধরা হয়। আমাদের আর্মি সম্বন্ধে এটা সত্য ছিল, অবশ্য আমি বিশ্বাস করি এখন আরও বেশি উদার মনের ও যোগ্যতাসম্পন্ন কমান্ডারগণ আসায় অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে।

আমার বেসামরিক বস শ্রী বিএন মলি-ক, সবচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন সিভিল সার্ভেন্টদের একজন, পুরা পরিস্থিতিটা খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, কিছু বিদেশি বিশেষজ্ঞ কর্তৃক কৃত মহড়ার সেটিং এবং তার ফলাফলের বিশে-ষণ হাতে পাওয়ার পর। এত উচ্চ পর্যায়ে এমন নীচতা দেখে আমি সাংঘাতিক রকম বিষণ্ন হয়ে পড়েছিলাম এবং উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিলাম আমাদের মূল্যের প্রমাণ দিতে– বিশেষত একটা যুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধ তো কেউ নিজে নিজে খুঁজে বের করতে পারে না। এর পরের সবচেয়ে ভাল জিনিশ হচ্ছে একটা মহড়া চালানো এমন একজন আর্মি কমান্ডারের নির্দেশনায় যিনি শুধু তার যোগ্যতার জন্য নয়, নিরপেক্ষতার জন্যও পরিচিত। শিগগিরই তেমন একটা সুযোগ এসে গেল। জিওসি-ইন-সি সেন্ট্রাল কমান্ড লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জেএস ধিলন (১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছিলাম তার সবটার জন্য সর্বাগ্রে যিনি কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন) তাঁর একটা ডিভিশনের মহড়া করাতে যাচ্ছিলেন।

এই মহড়ায় আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভূমিকা নিয়ে যোগ দিতে পারতাম। তিনি কমান্ডার হিশাবে সর্বোচ্চ সততা এবং সামগ্রিক বিবেচনা বোধের অধিকারী বলে পরিচিত ছিলেন। আমরা 'গরুড়' নামের এই মহড়ায় অংশ নিলাম এবং তার ফলে আমি এমন রিপোর্ট অর্জন করলাম যা আমাদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে বিপুলভাবে সহায়ক হয়েছিল এবং ভবিষ্যৎ কর্মপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে টনিক হিশাবে কাজ করেছিল।

জিওসি-ইন-সি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জেএস ধিলন -এর মন্তব্যসমূহ:

> মহড়ার নির্দেশক রিপোর্ট করছেন যে এসএসএফ কোম্পানিটি কৃতিত্বের সাথে তৎপরতা চালিয়েছে; এর ওপর যে করণীয়গুলি অর্পণ করা হয়েছিল তা তারা সফলভাবে সম্পন্ন করেছিল; এরা তাকে গুরুতরো রূপে অকেজো করে দিয়েছিল তাকে ছত্রভঙ্গ করে এবং একজোট হওয়ার সুযোগ না দিয়ে অর্থাৎ শত্রুর ওপর এই দলের কার্যকারিতা ছিল অত্যন্ত লক্ষণীয়।
>
> এই মহড়ায় অংশগ্রহণকারী, এর পরিচালনাকারী এবং এর আম্পায়ার সামরিক অফিসারগণ এসএফএফ -এর কার্যকারিতায় দারুণভাবে চমৎকৃত হয়েছিল। তাঁরা সবাই মনে করে যে আমাদের হাতে নেওয়া যে কোনও অপারেশনের জন্য এসএফএফ একটা মস্ত সম্পদ হতে যাচ্ছে।
>
> প্রত্যেকে জানে যে যখন এই ফোর্সের সূত্রপাত তখন থেকে আপনিই এর স্থপতি। এই সুযোগে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চাই এই ফোর্সের সংগঠন ও প্রশিক্ষণকে এমন উচ্চ মানে উন্নীত করায় আপনার সফলতার জন্য।

এই শেষ অনুচ্ছেদটা ফোর্স কমান্ডার হিশাবে আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা।

মহড়া 'গরুড়' -এর পরিচালকের মন্তব্য:

মহড়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ফোর্স অত্যন্ত ভাল করেছে। তাদের সাফল্যের প্রধান প্রধান কারণ নিম্নরূপ—

ক) অপারেশনের ভূমি সম্বন্ধে তাদের লোকদের সম্যক জ্ঞান ছিল।

খ) তারা অত্যন্ত চলমান ছিল, বিশেষত রাতের বেলায়।

গ) তারা দ্রুততার সাথে হানা দিচ্ছিল এবং চমক সৃষ্টি করতে পারছিল।

ঘ) তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল উচু স্তরের; তারা যখন কোনও ঘাঁটি বা লুকানোর স্থান ত্যাগ করছিল তখন তাদের উপস্থিতির কোনও চিহ্ন তারা

পিছনে ফেলে যাচ্ছিল না।

ঙ) যেখানে তারা আঘাত করবে তা থেকে অন্য জায়গায় আঘাত করার ভান করে বহুলভাবে প্রতারণামূলক ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেছিল। শত্রুকে বহুলভাবে প্রতারিত করতে তারা সক্ষম হয়েছিল।

মেজর জেনারেল
জেওসি ডিভিশন

আমি ভেবেছিলাম পশ্চিমাঞ্চলীয় কমান্ডের জিওসি-ইন-সি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল কেপি ক্যানডেথ, পিভিএসএম-কে একটা মহড়ায় ফোর্সটিকে পরিদর্শন করতে আহ্বান করা ফলদায়ক হবে; তাতে তিনি তাদের সামর্থ্য সম্বন্ধে নিজের জন্য একটা ধারণা নিতে পারবেন। জেনারেল ক্যানডেথ ছিলেন অত্যন্ত প্রশস্ত কল্পনাশক্তিসম্পন্ন অত্যন্ত অকপট একজন অফিসার। এসএফএফ -এর মতো একটা অপ্রচলিত ধরনের ফোর্স সম্বন্ধে তার চিন্তাভাবনা কেমন ছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম না এবং যখন তিনি মহড়া পর্যবেক্ষণ করছিলেন তখন আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। তাঁর যা বলার ছিল সে হচ্ছে এরকম:

সেখানে যা দেখলাম তাতে আমি কী যে বিস্মিত হয়েছিলাম। আমি বিশেষভাবে চমৎকৃত হয়েছিলাম লোকগুলির উচ্চ মানের গুলি চালনায় এবং শারীরিক যোগ্যতায়। দুরূহ পার্বত্য ভূমিতে তাদের দ্রুতগতি চলনের ক্ষমতা আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। কোনও আইন ও আদেশ ছাড়া এবং কোনও রকম শাস্তিক্রমের অনুপস্থিতিতে শৃঙ্খলা বহাল রাখা অবশ্যই একটা সত্যিকারের কঠিন কাজ এবং আপনি ও আপনার অফিসাররা যেভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজটা করে যাচ্ছিলেন তাতে আমি চমৎকৃত হয়েছিলাম। লোকগুলির হাসিখুশিভাব এসএফএফ -এর মধ্যে বিদ্যমান উদ্দীপনার যথাযথ ইঙ্গিত বহন করে।

পরে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জিওসি-ইন-সি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জেএস অরোরাকে, যিনি পরে বাংলাদেশে ঐতিহাসিক যুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে যাচ্ছিলেন, আমাদের ফোর্স পরিদর্শনে আহ্বান করার সুযোগ হয়েছিল আমার। তিনি দারুণভাবে চমৎকৃত হয়েছিলেন। এই ফোর্স সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন– "আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় হয়েছে যে তারা উত্তম কাজ দেখানোর উপযুক্ত এবং সুযোগ এলেই তারা নিশ্চয়ই উত্তম কাজ দেখাবে।... আমি আপনাকে সম্মানিত করতে চাই আপনি যা অর্জন করেছেন সে সবের জন্য; আপনি তা করেছেন যে সব প্রতিবন্ধকতা ও ভুল বোঝাবুঝির

মধ্যে আপনাকে কাজ করতে হয়েছে তা সত্ত্বেও। আমি এই মাত্র বলতে পারি যে একজন অপেক্ষাকৃত কম উত্তম ব্যক্তির পক্ষে, যে আপনার মতো নিবেদিতপ্রাণ ও দৃঢ়সংকল্প নয় এমন কোনও ব্যক্তির পক্ষে, এটা করা সম্ভব হত না।"

এই ভুল বোঝাবুঝির উদ্ভব সম্বন্ধে জানেন এমন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে এরকম একটা মন্তব্য সবচেয়ে বেশি ঈপ্সিত ছিল।

এ পর্যন্ত যদ্দূর দেখা যায় তিনজন উচ্চ পর্যায়ের আর্মি কমান্ডার এই ফোর্সের দক্ষতার ব্যাপারে প্রত্যয়ী হয়েছেন এবং এর নেতৃত্বের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। সবচে' উৎসাহজনক বার্তা অবশ্য এসেছিল জেনারেল স্যাম মানেকশ'র কাছ থেকে, যিনি আমার অনুরোধে এই ফোর্স পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি লিখলেন—"এ ছিল এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। আমি খুব কমই এমন গর্বিত বোধ করেছি। তোমার সৈন্যদের দেখে মনে হচ্ছিল তাদের মধ্যে অসাধারণ হৃদয় আছে, তারা চূড়ান্ত রকম উপযুক্ত ও যোগ্য এবং তাদের মধ্যে রয়েছে বিপুল রকম অনুপ্রেরণা। এমন চমৎকার মানুষদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যে কোনও সৈনিকের পক্ষে আনন্দের ব্যাপার। পৃষ্ঠপোষকতা করার ইচ্ছা থেকে বলছি না, আমি মনে করি এত বিচিত্র এলাকা এবং পরিপার্শ্ব থেকে মানুষদের নিয়ে এমন একটা যোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার বিরাট কৃতিত্ব অবশ্যই তোমার ওপর বর্তায়।"

দৃশ্যপটে জেনারেল মানেকশ'র আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ আবহাওয়া বদলে গেল। এই বিচক্ষণ চীফ আমাদের ইতিহাসের সবচে' বিপদসংকুল কিছু অপারেশনে আমাদের অনুপ্রাণিত ও চালিত করেছেন। সে কথায় আমরা পরে আসব।

এই লোকদের প্যারাশুট ঝাঁপ প্রশিক্ষণ মানে ছিল চলন্ত বিমান থেকে লক্ষিত এলাকায় নিখুঁতভাবে প্যারাশুটসহ ঝাঁপ দেওয়া। যেসব লোক কোনও ধরনের একটা মাত্র মেশিনও সারা জীবনে দেখেনি তাদের জন্য এটা সোজা কাজ নয়। সুতরাং আমি প্রশিক্ষণের সবরকম উন্নত সরঞ্জামাদি যা আমাদের আধুনিক আর্মি ব্যবহার করে সেসব বাদ দিলাম কারণ সেসব নবিশদেরকে ভীত করে তোলে। আমরা গ্রাউন্ড ট্রেনিং -এর জন্য সহজ সরল কৌশল উদ্ভাবন করলাম এবং সত্যিকার ঝাঁপের জন্য উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করতে লাগলাম। এই স্বেচ্ছাসেবক ফোর্সে আর্মি থেকে যেসব অফিসারদের দেওয়া হয়েছিল তাদের কেউ প্যারাশুট ট্রেইনড বা প্যারা-ভলান্টিয়ার ছিলেন না। যদিও অনেক অফিসার এই লোকদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাউন্ড ট্রেনিং গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাদের ধারণা ছিল তাদের কখনও কোনও আকাশযান থেকে সত্যিকারের ঝাঁপ দিতে হবে না, কারণ তাঁরা প্যারা-ভলান্টিয়ার ছিলেন না এবং তাঁরা উচ্চতর বয়সের গ্রুপেও পড়তেন যাদের জন্য সরকার ঝুঁকি নিত না এবং

মৃত্যু বা জখমের ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিপূরণ দিত না। সুতরাং আমার কমান্ডে এ ব্যাপারে আমি একটা সংকটের মধ্যে ছিলাম।

একটা কমান্ড কাঠামোর সুস্থতার জন্য এটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে অফিসাররা জওয়ানদের সঙ্গে সঙ্গে সব রকম বিপদ-আপদের ভাগ নেবে এবং তার শুরু হবে প্রশিক্ষণের বিপদ-আপদ দিয়ে। জওয়ানদের ঝাঁপ দেওয়ানোর জন্য আমি যখন অফিসার ভলান্টিয়ারদের নাম চাইলাম, কোনও নামই এল না। সত্যিকার ঝাঁপের ঠিক আগের দিন ছিল সেটা। সে ছিল এক সংকটজনক অবস্থা। জওয়ানরা যুদ্ধের সময় একজন অফিসারের আদেশ পালন করবে না, যদি শান্তির সময় সে তাদের বিশ্বাস হারায়। এমন নয় যে অফিসারদের সাহসের অভাব ছিল। প্রধান কারণ ছিল যে সরকারি বিধি অনুযায়ী তাদের বয়সের কারণে তাদের ঝুঁকি আবৃত ছিল না এবং তারা তেমন ঝুঁকি না নেওয়াটা সংগত বলে মনে করেছিল। কিন্তু আমার জন্য এক্ষেত্রে সোজাসাপটা প্রশ্ন ছিল হয় জওয়ানদের আস্থা অর্জন নয় তো কমান্ড ছেড়ে দেওয়া।

৩৬ বছরের বেশি বয়সের ব্যক্তিদের ঝুঁকি সরকার কর্তৃক গ্রহণ না করার ব্যাপারে কথাবার্তা জওয়ানদের মধ্যেও গুরুতরো প্রভাব ফেলল। তাদের মধ্যেও অনেকের বয়স এর চেয়ে বেশি ছিল এবং তারা অনুভব করল যে তাদের সেই বয়সে ঝাঁপ দেওয়া সত্যিই ঝুঁকিপূর্ণ হবে যেহেতু সরকার সেই ঝুঁকি গ্রহণ করতে যাচ্ছে না। আমার হাতে মাত্র একটা দিন ছিল এবং কোনও ক্রমেই একদিনের মধ্যে সরকারের সিদ্ধান্ত পাওয়ার সুযোগ আমার ছিল না।

সুতরাং আমি আমার সামনে খোলা একমাত্র পথ অবলম্বন করলাম। ঐ বিকালেই আমি সব জওয়ানদের উদ্দেশ্যে বললাম—"প্যারাশুট-ঝাঁপ মোটে ঝুঁকিপূর্ণ নয়। এটা ভ্রমণের সবচেয়ে মনোরম উপায়সমূহের একটা। কোনও রকম ক্লান্তি ছাড়া শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার উপায় এটা। এর জন্য বেশি প্রশিক্ষণের দরকার হয় না। এবং সব বয়সের জন্যই এটা নিরাপদ। তোমরা জান আমার কোনও প্যারা-ট্রেনিং নেই কিন্তু আমি প্রত্যেকটি গ্রুপের জন্য নিজে আকাশযান থেকে ঝাঁপ দিয়ে দেখিয়ে দেব, যদি না আমার পরে কোনও অফিসার স্বেচ্ছায় জওয়ানদের আগে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে।

এতে গোটা আবহাওয়া যেন বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠল। প্রত্যেকে জানত যে আমি তাদের যে কোনও জনের চেয়ে বেশি বয়সি। তারা এটাও জানত যে আমার কোনও প্রশিক্ষণ ছিল না। কিন্তু সর্বোচ্চ কমান্ডার যখন এভাবে এগিয়ে আসে তখন তার অত্যন্ত গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয়।

জওয়ানদেরকে এসব কথা বলে এবং তাদের তীক্ষ্ণ রণহুংকার উপভোগ করে আমি ভাবতে বসলাম কি করে জওয়ানদেরকে দেওয়া অঙ্গীকার আমি পালন করব। ঝাঁপ দেওয়ার কৌশল শেখার জন্য আমার হাতে আছে মাত্র একটা রাত এবং তাও আমার চা -এর টেবিল থেকে আমার ড্রয়িং রুমের কার্পেটের ওপর ঝাঁপ দিয়ে। একজন জুনিয়রকে অনুরোধ করলাম ঐ রাতে আমার ড্রয়িং রুমে আমাকে গ্রাউন্ড রোলটা শিখিয়ে দিতে এবং প্যারাশুটের সঙ্গে লাগানো রশির ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে। আমি এর কিছু কিছু প্রশিক্ষণ ভূমিতে আমার পরিদর্শনের সময় দেখেছিলাম এবং সব সময় মনে হত যে এগুলি সহজ। ঐ রাতে সবকিছু কঠিন বলে মনে হল। যা হোক আমি চা -এর টেবিল থেকে ঝাঁপ দিয়ে আমার কার্পেটের ওপর কয়েকটা বেঢপ রকমের গড়াগড়ি খেলাম। এবং আমার ইন্সস্ট্রাক্টর আমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে আমি কখনও কাউকে বলব না তিনি আমাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি আমার কাছ থেকে চলে গেলেন এই কথা বলে যে পরের দিন জওয়ানদের সাথে ঝাঁপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমি যেন পুনর্বিবেচনা করি এবং ঝাঁপ দেওয়ার আগে যেন কমপক্ষে এক মাসের নিয়মিত গ্রাউন্ড ট্রেনিং নিই।

আমার জন্য ব্যাপারটা তেমন সরল ছিল না। আমি যদি এই ফোর্সকে কমান্ড করতে চাই তাহলে আমি যা বলেছি তা আমাকে করতেই হবে। আমি শ্রী বিএন মলি-ককে, যিনি তখন তাঁর সদর দফতরের বাইরে ছিলেন, আমার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। তাতে আমাদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমাদের পরিবারের প্রতি যথাযথ ক্ষতিপূরণ দানের ব্যবস্থাও করতে অনুরোধ করেছিলাম। অতিরিক্ত পূর্বসতর্কতা হিশাবে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম আমার ভাই ড. গোপাল সিং এমপি-কে, যিনি পরে অনেকগুলি দেশে আমাদের বিশিষ্ট রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। তাঁকে লিখেছিলাম আমি মারা গেলে তিনি যেন আমার পরিবারকে সাহায্য করেন। পরদিন আমি সবার আগে ঝাঁপ দিলাম এবং নিখুঁতভাবে ভূমিপ্রাপ্ত হলাম। আমার সফল ঝাঁপের কথা জানতে পেরে শ্রী বিএন মলি-ক আমাকে অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন, কেবল নিজের তরফ থেকে নয়, সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর তরফ থেকেও।

প্রশিক্ষণবিহীন আমার এই একটি মাত্র ঝাঁপ পরিপূর্ণ সমাধান করে ফেলল আমাদের অনেক সমস্যার, তা শুধু জওয়ানদের সঙ্গে নয়, সরকারের সঙ্গেও। আমার ড্রাইভার হাবিলদার শাপুর সিং ঝাঁপ দিল। বাবুর্চিরা ঝাঁপ দিল, কোয়ার্টার -এস্টাররা ঝাঁপ দিল। সবাই তাদের প্যারা-ব্যাজ ঝুলিয়ে পৌরুষের গর্বের সাথে হাঁটতে লাগল।

পরে শ্রী বিএন মলি-ক প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সামনে তাঁর অফিসে

আমাকে হাজির করলেন। যেমন সদয়ভাবে প্রধানমন্ত্রী আমাকে গ্রহণ করলেন তা আমি কখনও ভুলতে পারি না। আমার সঙ্গে পরের শিডিউলে ঝাঁপ দেবেন বলে তিনি ব্যগ্র ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

আমরা সবাই শ্রী বিএন মলি-ক -এর অধীনে কাজ করে গর্বিত ছিলাম। এই নিঃস্বার্থ মানুষটি মেধায়, আত্মত্যাগে, দেশপ্রেমের চেতনায়, জাতির জন্য কাজ করায়, অমিত আত্মনিবেদনে জওয়াহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল এবং পণ্ডিত পান্ত প্রমুখ যাঁদের অধীনে তিনি কাজ করেছিলেন তাদের সমপর্যায়ের ছিলেন। তিনি ছিলেন সততায় অটল, অতীব আত্মসংযমী এবং কঠিন চরিত্রের মানুষ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর অত্যুচ্চ মেধা। তার ফলে তিনি সবচেয়ে কঠিন সময়ের পরীক্ষার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছেন এবং এমন সব বাহিনী গড়ে তোলার কৌশল উদ্ভাবন করেছেন যা অনাগত দীর্ঘ কাল ধরে সব রকমের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দেশকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

এটা চরম দুর্ভাগ্য যে এই দেশ তার এই সব প্রতিভাবান সন্তানদেরকে তাড়াতাড়িই ভুলে গিয়েছে এবং তাঁদের বয়োবৃদ্ধিতে তাঁদেরকে অব্যাহতি দিয়েছে, তাঁরা যথারীতি অবসরে চলে গিয়েছেন, তখন আর তাঁদেরকে সম্মান করার বা তাঁদের মেধা ও যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর কোনও ব্যবস্থা রাখেনি।

তিনি সম্প্রতি ৭৮ বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুবরণ করেছেন বাবা ওংকারনাথের একজন মহান শিষ্য হিশাবে। সকল সম্মান তাঁর উদ্দেশ্যে। দেশ মানুষরূপী এক রত্নকে হারিয়েছে। ■

অধ্যায়—১১

'অপারেশন ঈগল' শুরু

আকাশপথে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সরণ শুরু হয় আমার যোগ্য চীফ অব স্টাফ কর্নেল ইকবাল সিং এমসি কর্তৃক তাঁর গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলি পাঠানোর পর। গোয়েন্দা প্রতিবেদনগুলি ছিল সরেজমিন প্রাথমিক নিরীক্ষা এবং মিযোরামের রাজধানী আইযাওয়ালে আটক কতিপয় বন্দি মিযোকে জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে। কর্নেল ইকবাল সিং ইতিপূর্বে এই বিক্ষুব্ধ এলাকায় একটা পদাতিক ব্রিগেড কমান্ড করেছিলেন এবং তাতে প্রভূত ভাল কাজ দেখিয়েছিলেন। এই ভূখণ্ড সম্বন্ধে এবং মিযো বিদ্রোহীরা সাধারণত যেসব কৌশল অবলম্বন করে সে সম্বন্ধে তাঁর ভাল জানাশোনা ছিল। এই অফিসারের যোগ্যতা ও পরিস্থিতির মূল্যায়ন সম্বন্ধে আমার প্রচুর আস্থা ছিল। তিনি যে ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংক লাভ করেননি তার একমাত্র কারণ ছিল এই যে তিনি খুব বেশি সরব এবং সৎ ছিলেন। তাঁর ঠিক উপরের অফিসারটির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব ছিল এবং তিনি জুনিয়র হওয়ায় তাঁকে হারতে হয়েছিল। আমার সৌভাগ্য যে এমন একজন নির্ভরযোগ্য অফিসারকে আমি চীফ অব স্টাফ হিশাবে পেয়েছিলাম।

আকাশপথে সরে আসার পর মোটরযানে শিলচর-আইযাওয়াল-লাংলেহ্ সড়ক ধরে আমাদের অগ্রযাত্রা চলল। দুর্ভাগ্যবশত লাংলেহ ও ডেমাগিরির মধ্যকার সড়কের ওপর চংস পাড়ি দেওয়ার সেতুগুলি ভাঙা ছিল। এই ডেমাগিরিকে আমি আমার সদর দফতর এবং প্রধান ঘাঁটি হিশাবে বাছাই করেছিলাম। উলি-খিত সেতুগলি ভাঙা থাকায় সব অস্ত্রশস্ত্র ও মজুদ-সামগ্রী জওয়ানদের বহন কতে হল। অনেক রসদ এবং প্রধান ওয়্যারলেস স্টেশন লাংলেহ-তে ফেলে রেখে আসা হল এই আশায় যে সেতুগুলির মেরামত হয়ে যাওয়ার পর সেগুলি ডেমাগিরিতে নিয়ে যাওয়া হবে। ডেমাগিরি ও লাংলেহ -এর মধ্যে রাত-দিন বিস্তর যাওয়া-আসা চলল। তাতে এই রকম ধারণার সৃষ্টি হল যে পূর্ব দিক থেকে চট্টগ্রামে হামলা চালানোর জন্য বিশাল এক বাহিনী সমবেত হচ্ছে।

২ হাজার ফুট উঁচু সির্তে-ৎলাং বলে পরিচিত শৈলশিরা বরাবর ডেমাগিরি অবস্থিত। শৈলশিরাটি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর, বাংলাদেশ সীমান্তের সমান্তরাল। এই শৈলশিরায় আরও তিনটা পোস্ট আমি বাছাই করেছিলাম। ডেমাগিরির উত্তরে মারপাড়া এবং দক্ষিণে বর্নাপানসুরি ও জারুলছড়ি। ডেমাগিরিতে আমি এসএফএফ কলামগুলিকে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছিলাম বাংলাদেশের ভিতরে আঘাত হানার জন্য।

এই পোস্টগুলিতে লম্বা সময় ধরে মজুত-সামগ্রী এবং জোগান আকাশ থেকে ফেলা হচ্ছিল এই বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যে একটা বিশাল বাহিনী কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এই

বিভ্রান্তি আরও জোরদার করা হল ডেমাগিরি এবং উত্তর ও দক্ষিণে অন্য পোস্টগুলির মধ্যে মানুষ এবং জিনিশপত্রের সার্বক্ষণিক চলাফেরার মাধ্যমে। এছাড়া আমার নিজস্ব রেকি চলল। প্রকাশ্য দিবালোকে মেজর জেনারেলের উর্দিতে বৈঠায় টানা নৌকায় চড়ে আমি কর্ণফুলি নদী ধরে চললাম, শত শত মিযোর পূর্ণ দৃষ্টির সামনে দিয়ে। আমি গেলাম ডেমাগিরি শহরের বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে। ডেমাগিরি হেলিপ্যাডে আমাদের একমাত্র হেলিকপ্টারটি রাখা হল। এসবে বিভ্রান্তিটা দৃঢ় হল যে প্রায় এক ডিভিশন সৈন্য ইতিমধ্যে ডেমাগিরিতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একজন বাঙালি ন্যাশনাল অ্যাসেমবি- সদস্য, এমএনএ, যিনি আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন, অনেক মানুষকে বললেন যে শুধু ডেমাগিরিতে তিনি নিজে ৮ হাজার সৈন্য গণনা করেছেন, অথচ সেখানে কখনও আমাদের ৪শ' লোকের বেশি ছিল না।

রাঙামাটি শহরটা ছিল প্রথম বড় ধরনের লক্ষ্যস্থান কিন্তু সেখানে পৌঁছার একমাত্র পথ কর্ণফুলি নদী এবং প্রয়োজন একঝাঁক নৌকা। তিনটি পাহাড়ি রেঞ্জের মধ্যে এঁকেবেঁকে এই নদী ঐ শহরটা পর্যন্ত গিয়েছে। পুরা শহরটায় শক্ত-সমর্থ পাঠান এবং কৌশলী মিযোদের মোতায়েন রাখা হয়েছে, তাদের সমর্থন দিচ্ছে সকল স্থানীয় চাকমা উপজাতি। রাঙামাটির প্রায় অর্ধেক দূরত্বে বর্কল শহরটিতে বিশেষ রকমের শক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে সবচেয়ে উঁচু উঁচু অবস্থানে যা গভীরভাবে খনিত বাংকারসমূহ দ্বারাও সুরক্ষিত। বর্কল-সুভলং এলাকাটি শত্রুর জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

এই রেখা বরাবর যে কোনও আঘাতের প্রতি শত্রু স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত সংবেদনশীল। আমরা শিগগিরই দেখলাম বর্কলকে আরও শক্তিশালী করা হল এবং বেশ অনেকটা নতুন শক্তি উত্তরে এসে কর্ণফুলি নদীর উভয় পাড়ের শৈলশিরায় অবস্থান নিল।

আমরা নদীতে চলা নৌকা সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। কিন্তু শুধু ছোট ছোট নৌকা পাওয়া গেল। তার এক একটিতে চার থেকে ছয় জনের বেশি মানুষ চড়তে পারবে না। এর প্রায় সবই দুইজন মানুষের মাছ ধরা নৌকা ছাড়া আর কিছু নয়।

রণকৌশল

শুরু থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেল যে শত্রুর প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানগুলি যেসব স্থানে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং তাদের সরঞ্জামাদির মজুতের যে প্রাচুর্য ছিল তাতে সেগুলি হালকা অস্ত্রে সজ্জিত গেরিলাদের দ্বারা স্থানচ্যুত করা যাবে না। তাদের জন্য দরকার ছিল ভারী মর্টার অথবা আর্টিলারি এবং আকাশযানের সমর্থনে শক্তিশালী কমান্ডো হানা। আকস্মিকতা, গেরিলাদের সর্বোত্তম অস্ত্র, ভালরকম সুফল আনত কিন্তু এই পরিস্থিতিতে আকস্মিকতা অর্জন করা যেত অপ্রত্যাশিত সচলতার মাধ্যমে এবং তা নির্ভর করছিল

এক ঝাঁক হেলিকপ্টারের প্রাপ্যতার ওপর। আমাদের ছিল একটা মাত্র হেলিকপ্টার, হতাহতদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য। অতএব আমাদের সচলতা ছিল দারুণভাবে সীমাবদ্ধ।

আমি মিশ্রিত কমান্ডো-কাম-গেরিলা রণকৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্তে আসলাম এবং একই সঙ্গে দুটি কলাম ব্যবহারের পরিকল্পনা করলাম যার একটা অ্যানভিল অর্থাৎ কামারের নেহাই -এর মতো এবং দ্বিতীয়টা হাতুড়ির মতো কাজ করবে। কম সচল অ্যানভিল ফোর্স সাধারণভাবে কর্ণফুলি নদীর গতিপথ অনুসরণ করে চলবে এবং চূড়ান্ত সচল হ্যামার ফোর্স আঘাত হানবে এবং শত্রু আউটপোস্টগুলিকে অ্যানভিলের উপরে গুড়িয়ে দেবে বর্কলে, সুভলং -এ এবং রাঙামাটিতে। তারপর তখন বিদ্যমান পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে একটা নতুন রণনীতি (strategy) অবলম্বন করা যাবে। এর নাম আমি দিয়েছিলাম অ্যানভিল হ্যামার টাক্টিক্স। অ্যানভিলকে বলা হল সাকিং অ্যানভিল বা শুষে নেওয়ায় রত অ্যানভিল, কারণ আমি চেয়েছিলাম এই অ্যানভিল অবস্থানের আশেপাশে ব্যাপকভাবে গেরিলা অ্যামবুশ চলতে থাকবে যা এর দিকে এবং এর দিক থেকে সরতে থাকা যে কোনও দলকে নিজেদের দিকে তাড়িয়ে এনে ধ্বংস করে ফেলবে। এটা সযত্নে প্রতি ফীল্ড কমান্ডারের কাছে ব্যাখ্যা করা হল। দুর্ভাগ্য যে তাঁদের মধ্যে কতক ছিল আর্মি থেকে নতুন পোস্টেড এবং তাঁরা গেরিলা যুদ্ধের সূক্ষ্ম জটিলতাগুলি অনুধাবন করতে পারেনি। তবে তাঁরা সাধ্যমতো করেছেন এবং কিছু মহার্ঘ ভুলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন ছিল নদীর ওপরে একটা যথেষ্ট বড় সেতুবন্ধ থেকে কর্ণফুলি নদী পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের অঞ্চলে নেমে সেখান থেকে আক্রমণকারী কমান্ডোদেরকে চালিত করা। একটা আক্রমণের একেবারে শুরুতে শত্রুর বাধাযুক্ত নদী পাড়ি দেওয়ার প্রচেষ্টা হচ্ছে চরম বিপজ্জনক কাজ, সকল সৈনিকই এ ধরনের ব্যাপার এড়াতে চাইবে, কিন্তু আমাদের কোনও বিকল্প ছিল না। নদী পার হতেই হবে এবং অন্য পাড়ে শত্রুর সেনা সমাবেশ রয়েছে বলে খবর ছিল।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বহু মাইলের পথ অতিক্রম করিয়ে ফোর্সকে আক্রমণের জন্য তৈরিতে কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী ছিল। সময় বাঁচানোর জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমার ফোর্স সদর দফতরকে নদী পেরুনোর একটা সেতুবন্ধ প্রস্তুত করার কাজ দেব। আক্রমণ হানার জন্য সেখানে অর্থাৎ ডেমাগিরিতে একটি মাত্র কোম্পানি উপস্থিত ছিল। আমরা ১৯টা স্থানীয় নৌকা ব্যবহারের জন্য পেলাম। ডেমাগিরিতে সংগ্রহকারীরা এগুলি অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করে আমাদেরকে দিতে পেরেছিল। সৌভাগ্যক্রমে নদীর অপর তীর থেকে শত্রুরা সরে গিয়েছিল; আমাদের সেটা অজানাই ছিল। নিঃশব্দে ও

কোনও বাধা ছাড়া নদী পার হওয়া গেল। সৈন্যরা ছড়িয়ে গিয়ে আক্রমণকারী কোম্পানিগুলির সমবেত ও সংগঠিত হওয়ার জন্য জায়গা করে দিল।

যদিও আমি আক্রমণকারী গ্রুপের সঙ্গে গিয়েছিলাম, তবু কোম্পানি কমান্ডারকে আমি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই কোম্পানি কমান্ডার সেতুবন্ধ হস্তগত করার কঠিন কাজটা খুব ভালভাবে করেছিল। তাতে করে মনোবল অনেক উঁচুতে ওঠে গিয়েছিল।

সদ্যধরা মাছ ভাজা হল এবং নাস্তায় মগ ভর্তি গরম চা -এর সাথে তা পরিবেশন করা হল। বাংলাদেশ অঞ্চলে কমান্ডারদেরকে আমি আমার আদেশাবলি জানিয়ে দিলাম। একটা ফোর্স যুদ্ধে তার একেবারে প্রথম অ্যাকশনে চালিত হবে এ সম্ভাবনায় প্রত্যেকে উত্তেজনা বোধ করছিল। কমান্ডাররা নিজ নিজ কমান্ডকে কাজ বুঝিয়ে দিল এবং প্রত্যেকে ঝটপট তার নিজ কাজের জন্য হেঁটে চলে গেল। শুরু করানো এবং আদেশ-নির্দেশ প্রদানের সেশনটা একদম যথাযথ হয়েছে বলে মনে হল। উচ্চ আশায় ভরপুর হয়ে আমি নৌকা বেয়ে ফিরে এসে আমার বাংক -এ বসে শান্তিতে দুপুরের খাবার খেলাম।

তারপর আমি হেলিকপ্টারে করে দক্ষিণ কলামের সদর দফতরে গিয়ে আক্রমণ সংক্রান্ত আদেশ-নির্দেশ দিলাম এবং আরও উত্তরে উড়ে গেলাম লেফটেন্যান্ট-কর্নেল এনহুইগকে তুলে আনার জন্য। এক রাত্রিকালীন সৈন্য চালনায় পা হড়কে তাঁর হাঁটু ভেঙে গিয়েছিল এবং তাতে করে তিনি দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন। এই দুঃসাহসী অফিসারের ওপর আমার অনেক উচ্চ আশা ছিল। আমি তাঁকে নিজে পছন্দ করে বেছে নিয়েছিলাম ফোর্সের কিছু দুরূহতম কাজের জন্য। তিনি রেকি সম্পন্ন করে চমৎকার মূল্যায়ন দিয়েছিলেন কিন্তু নিয়তি তাঁকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে পদক অর্জন করতে দিল না। আমি নিশ্চিত ছিলাম তিনি তা অর্জন করবেন। এই অফিসারকে ভারতের একটা চিকিৎসা ঘাঁটিতে স্থানান্তরিত করতে হল। ■

অধ্যায়—১২

নেহাই প্রস্তুতকরণ

একে আক্ষরিকভাবে সামরিক অর্থে গ্রহণ করা উচিত হবে না। সামরিক ভাষায় অ্যানভিল বলা হয় প্রচুর সৈন্য-সামন্ত দিয়ে শক্তিশালীভাবে সুরক্ষিত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানকে, যার দিকে শক্রবাহিনীকে ঠেলে দিয়ে স্লে-জ-হ্যামারের আঘাতে চূর্ণ করা হয়। আমাদের তৈরি অ্যানভিল ছিল শক্রর মনে একটা ধারণা সৃষ্টির জন্য যে আমরা বড় ধরনের আক্রমণ এবং প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করতে যাচ্ছি শক্রর যোগাযোগ রেখার কেন্দ্রের ওপর, যার ব্যাপারে সে স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল। সেটা ছিল বর্কল-সুভলং এলাকা যা কর্ণফুলি নদীর গতিপথ বরাবর গিরিসংকটকে নিয়ন্ত্রণ করছিল। এই সংবেদনশীল এলাকায় ও তার আশেপাশে এসএফএফ -এর জোরদার হানা চলতে থাকলে তা শক্রর প্রধান ঘাঁটি রাঙামাটি থেকে অতিরিক্ত শক্তি টেনে আনবেই। আর রাঙামাটিই হচ্ছে আমাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল। একই সঙ্গে আমাদের উত্তরের কলামগুলির দ্রুততার সাথে আঘাত হানার কথা শক্রর উত্তর দিককার কিছু পিছু-হটা আউটপোস্টকে এই অবস্থানের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য আর যেগুলি আমাদেরকে বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবে সেগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য। শক্রর বড় রকমের প্রতিরক্ষামূলক অবস্থানের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার মতো অস্ত্রসজ্জা বা প্রশিক্ষণ কোনওটাই আমাদের গেরিলা ফোর্সের ছিল না। আমরা আমাদের সশস্ত্র ক্যাডারদেরকে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য শক্রর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা ঘাঁটি রাঙামাটি ও চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের কলামগুলি যখন আঘাত হানবে তখন একই সময়ে তারাও আক্রমণ চালাবে, যাতে একই সাথে ভিতর থেকে এবং বাইরে থেকে আক্রান্ত হওয়ায় শক্রর মনে ভীতি ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করে তাকে জীবন রক্ষার জন্য পলায়নে প্রবুদ্ধ করে, অথবা সে মারা পড়ে।

বিরাট সংখ্যক গেরিলা মোতায়েন ছিল এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকাটিকে ভিতর থেকে সারাক্ষণ গুলি চালনার মধ্যে রাখার জন্য, অ্যামবুশ করার জন্য, শক্রর টহলগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এবং তাদের যোগাযোগ ও সরবরাহ লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য, যাতে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এটা হলে শক্রর প্রতিরক্ষা দল রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম থেকে বলবৃদ্ধির জন্য উপকরণ ও লোক চাইতে বাধ্য হবে। আমরা চাচ্ছিলাম এমনটাই যেন হয়।

মেজর সুরত সিং ভিএসএস -এর অধীনে এই কাজে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় কলামটি দুটি সাব-কলামে বিভক্ত হয়ে বর্কলের দিকে সাঁড়াশির আকারে এগিয়ে গেল। সাব-কলাম

দুটি পালাক্রমে মেজর সুরত সিং, মেজর এসআর ভাটিয়া, মেজর বিএস থাপা এবং মেজর এডিএস সানিয়াল কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল ধানুবাক, দিঘলছড়ি ও বরাইতাল শত্রুমুক্ত করে দক্ষিণে বর্কলের দিকে অগ্রসর হওয়া। মেজর এইচসি শর্মার জোগাড় করা কতগুলি স্থানীয় নৌকা নদী দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল যাতে এই কলাম নদী ধরে দক্ষিণে যাওয়ার জন্য বা বর্কল পাহাড়ের ওপরকার পোস্টগুলিকে উৎখাত করতে নদী পার হওয়ার জন্য নৌকাগুলি পেতে পারে। যে এনসিও এই নৌবহরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি ভয়শূন্যমনে সর্বোচ্চ গতিতে এগিয়ে পূর্ব নির্ধারিত স্থান পার হয়ে গেলেন এবং রাতের বেলায় একটা শত্রু অবস্থানের ঠিক বিপরীত দিকে পৌঁছলে তাকে চ্যালেঞ্জ করা হল, তিনি গুলিবিদ্ধ হলেন, গুরুতরো আহত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নৌকাগুলি ঘুরিয়ে দ্রুত গতিতে পূর্ব নির্ধারিত স্থানের দিকে এগিয়ে গেলেন। নৌকাগুলি নিরাপদে সেখানে পৌঁছল। এই বীর এনসিও কাজ শেষ করার পর ঢলে পড়লেন এবং নদীর মধ্যে পড়ে গেলেন। কয়েকদিন পরে তাঁর মৃতদেহ একটা খাড়ির মধ্যে আবিস্কৃত হল এবং অতীব সম্মানের সাথে দাহ করা হল।

এই ফোর্স ধানুবাক, দিঘলছড়ি এবং বরাইতালে হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে এই পোস্টগুলি দখল করল। একই ঘটনায় তারা কতগুলি এলএমজি, রাইফেল এবং কিছু গ্রেনেডও হস্তগত করল। এবার তারা প্রচণ্ড গোলাগুলির সম্মুখীন হল প্রথমে নদীর অপর পার থেকে এবং পরে কাছাকাছি থেকে। একজন জ্যেষ্ঠ বীর লীডার সাহসের সাথে দাঁড়িয়ে তাঁর লোকদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর পেটে গুলি লাগল। সেই সাহসী লীডারের আহত হওয়াতে এবং অপ্রত্যাশিত পরিমাণ মর্টার ও মেশিনগান -এর গোলাগুলির সম্মুখীন হওয়াতে হালকা অস্ত্রধারী অফিসার ও জওয়ানগণ সম্পূর্ণরূপে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। দায়িত্বপ্রাপ্ত আর্মি অফিসার সম্প্রতি দখল করা সকল পোস্ট ছেড়ে সরে আসার জন্য এবং প্রচলিত মিলিটারি কায়দায় সাইফার ডকুমেন্টগুলি পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমার কাছে অনুমতি চাইলেন। তিনি ছিলেন নতুন এবং গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক নীতিগুলি তখন পর্যন্ত আত্মস্থ করেননি। একজন গেরিলা হিশাবে আপনি কখনও ভূমি দখল করে রাখবেন না অথবা প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নেবেন না। আপনি শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে বা আগুন জ্বালিয়ে তাদের অবস্থান ধ্বংস করবেন। কিন্তু আপনি কখনও স্থিতিশীল হবেন না। আপনাকে হতে হবে অতিশয় চলমান। পরিস্থিতি দাবি করলে আপনি সরে পড়বেন বা পিছিয়ে আসবেন, তাতে লজ্জার কোনও ব্যাপার নেই। কেবলমাত্র একজন বোকাই নিহত হওয়ার জন্য বসে থাকবে।

কিন্তু এখানে সবচেয়ে খারাপ যা ঘটেছিল তা হচ্ছে অফিসাররা বাহিনীকে তাড়াহুড়া করে অপরিকল্পিতভাবে পশ্চাদপসরণ করাল, যাতে সকলে মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। আহত হয়েছিল মাত্র সাতজন। তাদের সবাইকে তুলে আনা হয়েছিল। মেডিকেল

অফিসার মেজর রমেশ চন্দ্রকে আহতদের চিকিৎসার জন্য যতদূর সম্ভব সামনে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত ঐ আহত লীডার মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁকে যথাযোগ্য সম্মানের সাথে ডেমাগিরিতে ফোর্সের সদর দফতরে দাহ করা হয়েছিল। অন্য আহতরা আমাদের হাসপাতালে শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠেছিল।

নদীর যে পারে শত্রু, সে পার থেকে সকল আদেশ বুঝিয়ে দিয়ে ফিরে আসার সময় আমি নিশ্চিত ছিলাম সকলেই চমৎকার ঝরঝরে। কিন্তু এটা ছিল তাদের প্রথম অ্যাকশন। বেশির ভাগ অফিসার এই ফোর্সে নতুন পোস্টেড ছিলেন এবং জওয়ানদের তাঁরা চিনতেন না। মনে মনে তাঁরা সেই সাধারণ রণকৌশল দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করছিলেন যা একজন সৈনিককে শেখানো হয়ে থাকে। গেরিলা যুদ্ধ ছিল তাঁদের কাছে মোটামুটি নতুন কিছু এবং তা সহজে বোঝার মতো ধারণা নয় যখন কিনা এভাবে মাত্র প্রায়-মিলিটারি কায়দায় হালকা অস্ত্রের সাহায্যে শত্রুর শক্ত ঘাঁটি কব্জা করার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আমার সন্দেহ ছিল এবং যখন আমি দিঘলছড়িতে তাদের জবর অ্যাকশনের খবর পেলাম তখন থেকেই শুরু করে যখন শুনলাম চাপের মুখে পশ্চাদপসরণ করে শুরুর স্থানে ফিরে এসেছে ততক্ষণই আমি উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম।

একটা ক্ষুদ্র এসকর্ট নিয়ে একটা ছোট্ট নৌকায় আমি আবার নদী পাড়ি দিলাম। যেখান থেকে শুরু করেছিল সেই সেতুবন্ধের স্থানে গোটা সাব-কলামটার ফিরে আসা দেখে বড্ড আঘাত পেলাম। আমি ক্ষিপ্ত হলাম, যুবক অফিসারদের ও লীডারদের একটা মনোবল হারানো শত্রুর সামনে তাদের কাপুরুষোচিত আচরণের জন্য প্রচণ্ড বকাঝকা করলাম। আমি অফিসারদের সঙ্গে, লীডারদের সঙ্গে ও জওয়ানদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলে গেরিলা কৌশলে তাদের নিজ নিজ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাদের ধারণা উন্নত করে তারপর তাদেরকে ছাড়লাম। তারা তাদের ভুলগুলি বুঝতে পারল, সেগুলির পুনরাবৃত্তি না করার প্রতিশ্রুতি দিল। তারা পরে আমাকে বলেছিল যে লড়াই -এর ভূমিতে এই তেজ-পূর্ণ কথাবার্তায় তাদের অপরিসীম উপকার হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল এই যুদ্ধে আমাদের ভূমিকার ক্ষেত্রে এটা ছিল এক চরম নির্ণায়ক মুহূর্ত। এখানে পরিস্থিতিকে ঠিকমতো বাগে আনতে না পারলে আমাদের সকল সম্ভাবনা গোল-য় যেত, স্রেফ ঝামেলা সৃষ্টি করা ছাড়া আমাদের কাজের আর কোনও মূল্যই থাকত না, যেমনটা কর্তৃপক্ষ আমাদের থেকে আশা করছিল। আমাদের সামর্থ্য সমন্ধে আমি নিজের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ অন্য রকম ধারণা গড়ে তুলেছিলাম এবং এই হীনকারী অবস্থা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমি জানতাম এই ফোর্সে আমার অফিসাররা ও লীডাররাও একই রকমের উদ্দীপনায় ভরপুর ছিল। এই জওয়ানরাই পরে একই লীডারদের কমান্ডের অধীনে বিস্ময়কর কাজ দেখিয়েছিল। কিন্তু এই সময়টা আমার জন্য ছিল এক সাংঘাতিক যন্ত্রণাকর ও হতাশাজনক মুহূর্ত। এই পরীক্ষায় পরে যখন সফলতা এল তখন তা

আমাকে ব্যক্তিগতভাবে হর্ষোৎফুল- করল। এই গ্রুপটা পুবের শৈলশিরা জুড়ে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল এবং পশ্চিম তীরের শত্রুসেনাদের জন্য এমন ভয়ের কারণ হয়ে উঠল যে তারা সাহায্যের জন্য চিৎকার তুলল এবং তাদের ঊর্ধ্বতন সদর দফতরকে বলল যে তারা হাজার হাজার সৈন্যের সম্মুখীন হয়েছে। এটা ছিল তাদের বিরাটভাবে অতিরঞ্জিত মূল্যায়ন। আমি তাদের (পাকিস্তানিদের) বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করে তাদের বিলাপ শুনতাম। জবাবে সদর দফতর থেকে তাদেরকে জেহাদির মতো খাড়া থাকতে তাগিদ দেওয়া হত এবং বলবৃদ্ধির জন্য লোকজন ও সরঞ্জামাদি তাদের দিকে এগুচ্ছে বলে নিশ্চয়তা দেওয়া হত। তার কিছু কিছু কখনও গন্তব্য পৌঁছেনি কারণ তা পথে আক্রান্ত হয়েছে এবং ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্য কলামটি লেফটেন্যান্ট-কর্নেল বিকে নারায়ণের কমান্ডের অধীনে বর্কলের সকল শত্রুকে ফাঁদে আটকানোর লক্ষ্যে চারদিক থেকে বর্কল ঘিরে ফেলার জন্য অগ্রসর হল। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল নারায়ণ ভালরকম সাহস ও কল্পনা শক্তিসম্পন্ন অফিসার ছিলেন। তাঁর কথা ছিল নিরাকপাড়া ও জাইলানপাড়ার শত্রু পোস্টগুলি উৎখাত করে বর্কলের দক্ষিণস্থ পাহাড় ১১৮৩ -এর দিকে অগ্রসর হওয়া। এই কলামটি অত্যন্ত সাহসের সাথে যুদ্ধ করে পোস্টগুলি শত্রুমুক্ত করল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাছেই চারদিকে নালায় বেষ্টিত একটি স্থানে তারা লুকাতে চাইল। ভুলক্রমে তারা ভেবেছিল যে ঐ নালাগুলি তাদের নিরাপত্তা দেবে। আমার মনে হয় তারা পরবর্তী দুঃসাহসিক অভিযানের জন্য ওখানে একটা ঘাঁটি করতে চেয়েছিল।

শত্রু শিগগিরই তাদের এই মনোভাব ধরে ফেলল এবং তাদেরকে উত্ত্যক্ত করতে এবং তাদের চারদিকে বুবি ট্র্যাপ পাততে শুরু করল। আমার জরুরি বার্তা সত্ত্বেও তারা তাদের লক্ষ্যস্থল বর্কলের দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হল না। তা করলে কলামের কেন্দ্র ভাগে চাপ কমত এবং শত্রু বর্কল থেকে হটে যেতে বাধ্য হত। এর মধ্যে বর্কলের দক্ষিণে ১১৮৩ পয়েন্টের শত্রু অবস্থানকে বলবৃদ্ধির মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করা হয়ে গিয়েছে। আমি লেফটেন্যান্ট-কর্নেল নারায়ণকে তাঁর অবস্থানের মধ্যখানে আমার হেলিকপ্টার নামিয়ে ঐ ফাঁদ থেকে বের করে আনতে সক্ষম হলাম যদিও তিনি তাতে জোর প্রতিবাদ করেছিলেন কারণ জায়গায়টায় গোলাগুলি চলছিল, সেখানে হেলিকপ্টার নামানো খুব ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

এই পর্যায়ে আমাদের বিমানবাহিনী আমার অনুরোধ গ্রহণ করল এবং শত্রুর এই শক্ত বিন্দুতে রকেট হামলা চালাল। আমি এবং লেফটেন্যান্ট-কর্নেল এএস আসসার এই রকেট হামলা খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করলাম। তা মারাত্মক রকমের লক্ষ্যভেদী ছিল। আমি এই দুর্দান্ত বৈমানিকদেরকে অভিনন্দন বার্তা পাঠালাম এবং লেফটেন্যান্ট-কর্নেল

আসসারকে বর্কল শত্রুমুক্ত করে সেখানে প্রবেশ করতে বললাম। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আসসার, তখনও শত্রুর মতলব সম্বন্ধে অনিশ্চিত, তাজ্জব হয়ে দেখলেন যে বর্কলের বেসামরিক জনগণ অপর পার থেকে তাদের সাজগোজ করার নৌকা নিয়ে বেরিয়ে এল ঘটা করে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শত্রু বর্কল ছেড়ে গিয়েছিল কিছু অস্ত্র ও গোলাগুলি পিছে ফেলে রেখে, যা যথারীতি হস্তগত করা হল। বর্কলের দখল আমাদের সকলের জন্য দারুণ মনোবল বৃদ্ধির ব্যাপার হয়েছিল।

আমাদের আকাশ-যুদ্ধ জাহাজ

হয়তো এটাই একমাত্র সুযোগ যখন বিমানবাহিনী আমাদের কিছু উপকারে আসবে এমনটা বুঝতে পেরে আমি আদেশ দিলাম আমাদের একটি এবং একমাত্র এমই-৪ হেলিকপ্টারটিকে আকাশের ব্যাটলশিপ হিশাবে প্রস্তুত করা হোক এর পিছনের ও সামনের কিছু অংশ বাদ দিয়ে এবং পিছনের দিকে বালির বস্তার আড়ালে একটা হালকা মেশিন গান চড়িয়ে। আমাদের জবরজং ব্যাটলশিপ যখন ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়ে গেল, দেখে আমি সন্তুষ্ট তো হলামই, এমনকি তার চেয়ে বেশি। আমরা গুলি চালাতে ও গ্রেনেড ছুড়তে পারলাম, বা এমনকি পেট্রোলভর্তি পিপা গড়িয়ে দিতে পারলাম যা ঠিক ঠিক জায়গায় নিয়ন্ত্রণহীন আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারত। আমার আকাশের ব্যাটলশিপকে শত্রু এমনই ঘৃণা করত যে যা কিছু তার হাতে ছিল তাই এর দিকে ছুড়ে মারত, যার মধ্যে মর্টার বোমাও ছিল। আসলে যতবার আমি এতে চড়ে বিচরণ করতাম, যা প্রায় প্রতিদিনই করতাম, আমি শুনতাম এর নিচে গুলির আঘাতের শব্দ, উপরের ঘুরক পাতেও গুলি লাগত। তাতে কম্পনের সৃষ্টি হত; এই নারকীয় মেশিনটার ঘনঘোর গোঙানিতে তা তলিয়ে যেত, এবং সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় ও নির্বিকারভাবে এর ভ্রমণ চলতে থাকত। যুদ্ধের শেষে এই হেলিকপ্টারটা একটা ভাল জাদুঘরের বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। আমাদের বেসামরিক এয়ার চীফ -এর তো এর দশা দেখে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়ার মতো অবস্থা এবং তখন তিনি এই ঐতিহাসিক ঘোষণাটি করেছিলেন– "মাই গড! একটা ভাল বিমানকে কেমন বেরহমের মতো বরবাদ করা হয়েছে।" ■

অধ্যায়—১৩

বর্কল-সুভলং ঘাঁটি হস্তগত হল কিভাবে

আমাদের অগ্রগতি ঠেকিয়ে রাখা শত্রুর বাংকারের ওপর রকেট হানার অব্যবহিত পরেই আমরা বর্কল-সুভলং গিরিসংকটের উঁচু উঁচু স্থানগুলিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য আক্রমণ করলাম। বর্কল-সুভলং গিরিসংকটের মধ্য দিয়েই বয়ে যাচ্ছিল কর্ণফুলি নদী। আমাদের জওয়ানরা খুব তেজোদীপ্ত ছিল। তারা এলাকাটা শত্রুমুক্ত করে ফেলল। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আসসার যখন বিজয় গর্বে স্থানীয় অভ্যর্থনা কমিটি কর্তৃক হাজির করা দারুণভাবে সাজানো নৌকায় করে বর্কল শহরে প্রবেশ করছিলেন তখন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল নারায়ণ তাঁর স্থানীয় নৌকার বহর গড়ে তুলছিলেন অতর্কিতে সুভলং দখল করে ফেলার জন্য। সুভলং ছিল খুব শক্ত অবস্থান, যার একদিকে ভাল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংবলিত উঁচু শৃঙ্গ।

আমি বেতারে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আসসার-কে আমার অভিনন্দন জানালাম। এখন রাঙামাটি দখলের চাবিকাঠি আমাদের হাতে তবে তার আগে প্রথমে আমাদেরকে সুভলং শত্রুমুক্ত করতে হবে। এই রাঙামাটিতেই ছিল প্রধান মিযো ক্যান্টনমেন্ট। সেখানে তাদের নেতা লালডেংগা সপরিবারে বসবাস করছিলেন।

এই পর্যায়ে ফীল্ড মার্শাল মানেকশ'র কাছ থেকে এই বেতার বার্তাটি পেলাম:

> স্যাম মানেকশ' -এর কাছ থেকে জেনারেল উবান -এর প্রতি। আমি তোমার অগ্রগতি এবং অর্জিত ফলফলে অত্যন্ত খুশি। ভাল কাজ করেছ, এবং এভাবে চালিয়ে যাও। তোমার বাহিনীর সবাইকে জানাও আমি তাদের উত্তম কাজের ব্যাপারে সজাগ। তাদেকে আমার পরম শুভেচ্ছা জানাও। তোমাদের জন্য সকল সৌভাগ্য কামনা করি।

এ ছিল দারুণ রকমের উৎসাহজনক। ফীল্ড মার্শাল নিজে গভীর আগ্রহের সাথে আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করছিলেন। আমি জানি তাঁর কম্প্যুটারের মতো মাথা থেকে কোনও খুঁটিনাটিও এড়িয়ে যাচ্ছিল না। এবং কারও দৈনন্দিন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ না করেও তাঁর প্রতিটি কমান্ডারকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করছিলেন।

শ্রী আরএন কাও প্রধানমন্ত্রীকে আমার ফোর্সের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত রাখছিলেন। এই ফোর্সের বিশিষ্ট চরিত্রের কারণে প্রত্যেককেই মনে হচ্ছিল এর ব্যাপারে আগ্রহী। বাজেভাবে সজ্জিত অল্প সংখ্যক মানুষের এই দলটি থেকে কেউই বেশি কিছু আশা করেনি। সুতরাং আমাদের প্রাপ্তি বিরাট রকমের প্রভাব সৃষ্টি করল। শ্রী কাও আমার

কাছে এই বার্তাটি পাঠালেন:

> ভাল অগ্রগতির জন্য অভিনন্দন। সর্বাংশে আপনার সাফল্য কামনা করি। আমার উর্ধ্বতনদের আমি অবহিত রাখছি।

সদ্য পৌছানো একজন গুর্খা অফিসার লেফটেন্যান্ট-কর্নেল জোশি কেন্দ্রীয় অংশে জোর চেপে এগোচ্ছিলেন। ভোরের দিকে তিনি গভীরভাবে খোঁড়া এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত বাংকার থেকে বর্ষিত বিপুল পরিমাণ গোলাগুলির সম্মুখীন হলেন। যে কোনও প্রস্তুত অবস্থান দিনের বেলায় আক্রমণ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, কিন্তু আমার বিপরীত নির্দেশনা সত্ত্বেও এই অকুতোভয় অফিসার ঐ অবস্থানটায় নিয়মিত আর্মি কায়দায় আক্রমণ চালালেন। তাঁর দুজন জওয়ান আহত হল। তাঁকে যোগাযোগ বন্ধ রেখে অন্যদিক থেকে অগ্রসর হওয়ায় আদেশ দেওয়া হল। তিনি শিগগিরই রাংগিপাড়ায় শক্রর এক বড় রকমের পোস্ট দখল করলেন, তার সাথে আরও তিনটি সহায়ক শক্র অবস্থান। আমি তাঁকে আমার অভিনন্দন জানালাম এবং তার সাহসী কাজের জন্য আমার স্বীকৃতি বিশেষভাবে প্রকাশের জন্য আমি তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করলাম, সাথে নিলাম বিশেষ ব্রান্ডের তামাক যা তিনি সবসময় পাইপে ভরে ফুকতেন। তিনি যারপরনাই খুশি হলেন, আর কিছুতে তিনি এমন খুশি হতেন না।

রেকিতে দেখা গেল সুভলং-কে শক্রমুক্ত করতে হলে আগে খাগড়াছড়ি আক্রমণ করে শক্রমুক্ত করা একান্তই আবশ্যক। খাগড়াছড়ির ঘাঁটি বর্কল ও সুভলং থেকে সমান দূরে এবং উভয়ের প্রতিরক্ষায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দশটি শক্র অবস্থান মিলে এই লক্ষ্যস্থলটি। এর একদিকে একটা খাল ভরে ওঠে একটা হ্রদে পরিণত। অন্যদিকে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের পাশ বরাবর এক সারিতে ছিল অবস্থানগুলি; তারা পাহাড়ের দিক থেকেই শক্র হামলা আশা করছিল। এর কয়েকটা অবস্থান এত কাছাকাছি যে একে অপরকে সমর্থন করতে পারছিল। সেগুলি পর পর দৃষ্টিসীমার মধ্যে ছিল।

এটা আমাদের সবচেয়ে ক্ষয়ক্ষতি-সাপেক্ষ অভিযানগুলির একটি হিশাবে দেখা দিয়েছিল। এ কাজটির জন্য আমি অবিলম্বে একটা নতুন কলাম দাঁড় করানোর জন্য যেসব কলাম অ্যাকশন শেষে বিশ্রামে ছিল তাদের থেকে কতগুলি কোম্পানিকে একত্রিত করলাম। সাহস ও দৃঢ়তার জন্য পরিচিত ৪৩ কোম্পানিকে ১৫ এবং ১৬ কোম্পানির সঙ্গে যোগ করা হল। দুর্দান্ত সাহসী লীডার ছাওয়ানকে কলাম লীডার করা হল, তাঁর সাথে দেওয়া হলে আরেকজন সাহসী অফিসার কোম্পানি কমান্ডার এসকে সুরি-কে। আমি অফিসার ও জওয়ানদের সামনে এক উদ্দীপনাময় বক্তব্য দিলাম এবং সাফল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলাম।

যখন আমাদের আক্রমণের সকল প্রস্তুতি শেষ হয়েছে, ঠিক সেই কঠিন মুহূর্তে বার্তা পেলাম আমার সিভিলিয়ান কর্তার সঙ্গে অপারেশন সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য অবিলম্বে

আমাকে দিল্লি- যেতে হবে। প্রথমে ভাবলাম একটা আবেদন পাঠিয়ে বিরক্তিকর ভ্রমণ থেকে অব্যাহতি চাই। কিন্তু আমি তো আমার বসকে জানতাম, আমি নিশ্চিত ছিলাম প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার না হলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠাতেন না।

দিল্লি-তে পৌঁছে আমি দেখলাম আমার গেরিলা কোম্পানিগুলির কতককে, যা আমার কাছে বাংলাদেশে পাঠানো উচিত ছিল, আসলে পাঠানো হয়েছে অন্যত্র রুটিন দায়িত্বে, যে সব দায়িত্ব এমনকি টেরিটোরিয়াল আর্মিও পালন করতে পারত। আমি প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে সোজা শ্রী কাও -এর বাড়িতে চলে গেলাম। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এটা আর্মি সদর দফতর করেছে এবং সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপে সম্মতি দিয়েছে। তিনি আরও মত প্রকাশ করলেন যে লোকেরা যখন শত শত মাইল দূরে তাদের গন্তব্যে চলে গিয়েছে তখন এই পর্যায়ে তাদের ফেরত পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। আমি একথা মানতে প্রস্তুত ছিলাম না, প্রস্তাব করলাম আমি আর্মি চীফ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং এই সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে নিই। তিনি বললেন আপত্তি নেই কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে এই লোকদের ফিরে পাওয়ার আশা তিনি করেন না।

যাহোক আমি চীফ -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং আগে থেকেই যেমন ভেবেছিলাম তিনি আমার যুক্তিতে প্রচুর যথার্থতা দেখতে পেলেন এবং অবিলম্বে তাদের ফেরত আনার আদেশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফীল্ড মার্শাল মানেকশ'র এ একটা গুণ যা তাকে ফীল্ড কমান্ডার হিশাবে অনন্য করে তোলে। তাঁর যদি প্রত্যয় হয় যে আপনি ঠিক বলছেন তাহলে তিনি নিজের আদেশ বাতিল করে দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। আমি বেশ খুশি হয়ে ফিরে আসলাম।

এই সাক্ষাতে জেনারেল মানেকশ' আমাকে প্রভূতভাবে অভিনন্দিত করলেন এবং আমাকে "মাই কমান্ডার ইন চীফ অব দি ঈস্ট" বলে অভিহিত করলেন। ভাইস চীফ অব আর্মি স্টাফ এবং ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ উভয়েই আমাকে আমার অর্জনে জন্য অভিনন্দন জানাতে জানাতে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন।

আর্মি চীফ আমার অপারেশনগত নির্দেশের পরিধি বর্ধিত করে চট্টগ্রাম বন্দর ও শহর দখল করা আমার দায়িত্বে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। এছাড়া তিনি আমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ব অর্ধাংশ থেকে পশ্চিম অর্ধাংশে সরে আসারও পরামর্শ দিলেন যাতে করে আর্মি কোর সদর দফতরের সমীপবর্তী হওয়ায় প্রশাসনিক দিকটা সহজতর হয়। সংশ্লিষ্ট অনমনীয় মন এবং সংকীর্ণ বিদ্বেষ ঐ সদর দফতরের সমীপবর্তী হওয়ার ফলে জাগ্রত হতে পারে জেনে একজন মানুষ প্লেগকে যতটা এড়াতে চায় আমি ঐ নৈকট্য ততটা এড়াতে চেয়েছিলাম। আমি তাঁর প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলাম। তিনি তাঁর সেই মোহাবিষ্ট করা হাসি হাসলেন এবং বললেন—"ওরে বদমাশ!"

তিনি জানতেন আমি ঐ টোপ গিলব না। বিপর্যয়টা কাটানো গেল এবং আমি নিজেকে ভারমুক্ত ও সুখী বোধ করলাম।

এই উল-াস স্বল্পস্থায়ী হল। আমার চীফ অব স্টাফ -এর কাছ থেকে এক বেতার বার্তায় আমি জানতে পারলাম যে অপারেশন থান্ডার বল্ট সফলভাবেই চালানো হয়েছে কিন্তু এর ফলে আমাদের একুশজন নিহত হয়েছে। খাগড়াছড়ির ওপর আমার আক্রমণের সাংকেতিন নাম ছিল থান্ডার বল্ট, যা আমি এত দারুণ যত্নের সাথে পরিকল্পনা করেছিলাম। তারা আমার দিলি- থেকে ফিরে আসার জন্য আর দুটি দিন অপেক্ষা করতে পারত এবং অপারেশনটা আমার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে হতে পারত। হয়তো হতাহতের সংখ্যার খুব একটা তফাৎ হত না কারণ লক্ষ্যস্থল ছিল শক্ত রকমের। কিন্তু আমার অন্তত এই সান্ত্বনা থাকত যে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি আমি পরীক্ষা করেছি। শ্রী কাও বিবেকবান মানুষ হওয়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমাকে অপারেশনের এলাকা থেকে টেনে আনার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন।

লীডাররা অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল, তাঁরা দেরি করতে পারেনি। তাঁরা এমনকি এই মৌলিক পূর্বসতর্কতাটাও ভুলে গিয়েছিল যে তাঁদের হয় সন্ধ্যায় না হয় ভোরে আক্রমণ করতে হবে। তাঁরা আক্রমণ করেছিল যখন সূর্য বেশ ওঠে গিয়েছে এবং সব কয়টা শত্রু পোস্ট ভাল রকম সতর্ক হয়ে গিয়েছে। আমার জওয়ানরা অতিরিক্ত প্রত্যয়ী হয়ে ওঠেছিল, তাদের লীডাররাও তাই। ছাওয়ান নিজে তাঁর বেয়াড়া হাসি নিয়ে এই আক্রমণের বর্ণনা দিল এমনভাবে যেন সেটা একটা বনভোজন পার্টি ছিল। তাদের ছোঁড়া হ্যান্ড গ্রেনেড শত্রুকে কাঁপিয়ে দেওয়ার পর তারা হাতের লাইট মেশিনগান থেকে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে ভরা দিনের আলোয় সবগুলি শত্রু অবস্থান একযোগে আক্রমণ করেছিল। তাদের রক্ত জমানো রণহুংকার আর তাদের পাশে ঝোলানো লম্বা লম্বা ছোরা শত্রুকে সন্ত্রস্ত করে তুলল, যার কতকে সেই ঠাণ্ডা ইস্পাত এড়াতে হ্রদের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল। তিনজন পাঠান ছাড়া আর কেউ জীবিত রইল না।

এই তিনজন ঝোপের মধ্যে লুকিয়েছিল, দুইদিনের অনাহারের পর তারা আত্মপ্রকাশ করল। তাদেরকে ঝটপট সবচেয়ে কাছের আর্মি ইউনিটে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কারণ আমরা যুদ্ধবন্দি রাখতাম না। আমাদের সে সুবিধাদি ছিল না। এই চমকপ্রদ বিজয়ের মূল্য একুশজন সাহসী জওয়ান। তাদের সাহস ও চরম আত্মত্যাগ পরে আমার জওয়ানদেরকে আরও বেশি দুঃসাহসী কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদের নাম চিরকাল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আমার স্ত্রী বাড়িতে একা ছিলেন। তিনি সারাক্ষণ প্রার্থনা করছিলেন। আমার নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা। আমার পুত্রের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা। আমার পুত্র মেজর গুরুদীপ সিং

উবান ফিরোজপুরের কাছে আর্টিলারি অফিসার হিশাবে লড়াই করছিল। আমাকে বলা হয়েছিল যে সে অতিমাত্রায় ভাল করছিল। আমাদের দুজনের কেউ জানতাম না অপরজনের ক্ষেত্রে কী ঘটছে। আমার কন্যা হার্শারান মেডিকাল অফিসার হিশাবে এক সামরিক হাসপাতালে কাজ করছিল। একই হাসপাতালে তার স্বামী স্কোয়াড্রন লীডার কেএ মিশ্র সার্জারি বিশেষজ্ঞ হিশাবে কাজ করছিল। পরে আমার কনিষ্ঠতর পুত্র জগদীপ সিং উবান এয়ার ফোর্সে যোগ দিয়েছিল। এটা পরিষ্কার হবে যে আমার গোটা পরিবার জাতিকে সেবা করছিল এবং পুরাপুরি নিবেদিতপ্রাণ ছিল। শান্তির জন্য একজন সৈনিকের ভালবাসা বুঝতে পারা কঠিন হওয়ার কথা নয়।

আমার স্ত্রী আমাকে সহিসালামতে দিলি- ফিরতে দেখে সুখী হলেও তিনি জানতেন আমি দুদিনের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক অপারেশনাল এলাকায় আরও ভারী দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি মিনিট পার হওয়ার সাথে সাথে তার উদ্বেগ বাড়ছিল, আমি সে ব্যাপারে কিছু করতে পারছিলাম না। তা ছাড়া আমি আর্মি কমান্ড, সিভিলিয়ান সেক্রেটারিয়েট ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী ডিপি ধর -এর সাথে সাক্ষাতে ব্যস্ত ছিলাম।

বাংলাদেশ অপারেশনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যাঁকে করা হয়েছিল সেই শ্রী ডিপি ধর ছিলেন একজন অত্যন্ত গতিময় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্য থেকে একটা আকর্ষণ শক্তি প্রকাশ পেত। আমাদের চীফ জেনারেল মানেকশ'র সাথে তাঁর ছিল পরম আন্তরিক সম্পর্ক। তিনি সারাক্ষণই আর্মি চীফ, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল অরোরা, শ্রী কাও, বাংলাদেশের সাময়িক সরকার, বাংলাদেশের যুবনেতাগণ এবং এই অপারেশনের সঙ্গে সংশি-ষ্ট অন্য শত শত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে রত থাকতেন।

তিনি হুইস্কির খুব ভক্ত ছিলেন, এবং আমি পান করি না শুনে একেবারে আঁতকে উঠলেন। পরে তিনি মনে হয় আরও একবার দারুণ ঘা খেলেন যখন তিনি আমাকে তাঁর নয়া-দিলি-স্থ ১৩ নম্বর সফদর জং রোডের বাসায় দুপুরের খানায় নিমন্ত্রণ করলেন এবং সেখানে আমার 'বস' তাঁকে বললেন যে আমি একজন নিরামিষভোজী এবং মাদক পানীয় সম্পূর্ণরূপে পরিহারকারী।

আমার প্রথম সাক্ষাৎকারের শেষে আমি বুঝতে পারলাম শ্রী ধর একজন স্থিরপ্রতিজ্ঞ মানুষ যিনি লক্ষ্য অর্জনে নিরবচ্ছিন্নভাবে লেগে থাকেন। তিনি একজন কম্যুনিস্ট হিশাবে পরিচিত ছিলেন, সম্পূর্ণরূপে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আস্থা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে দীর্ঘ-মেয়াদি ইন্দো-সোভিয়েত বন্ধুত্ব চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে এক মূল কারিকা হিশাবে ধরা হয়। এই সেই চুক্তি যা বাংলাদেশে যুদ্ধের সময় বঙ্গোপসাগরে মার্কিন সপ্তম নৌবহরের হুমকিকে ব্যর্থ করে দিতে আমাদের দেশের পক্ষে দারুণ উপকারে এসেছিল। এ সময়টা ছিল তাঁর উপরে ওঠার সময় যখন তিনি কোনও ভুল করতে

পারেন না। আমার বর্তমান কাজের জন্য তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মন্ত্রীর বাসায় আমার এই সাক্ষাতে আমি তাঁর সঙ্গে এক ঘণ্টা ব্যয় করলাম। আমার অপারেশন মানচিত্র দেখিয়ে আমার চট্টগ্রাম দখলের পরিকল্পনার কথা বললাম এবং বললাম চট্টগ্রাম থেকে গোপনে ঢাকায় প্রবেশের পরিকল্পনার কথা যেখানে ইতিমধ্যে মুজিববাহিনীর দুই হাজার ছেলে আমাদের আগমনের অপেক্ষা করছে। ঢাকায় প্রবেশ করলে আমরা সেখানে এই দেশপ্রেমিকদের সাহায্য নিয়ে এমন গোলযোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করতাম যে ঢাকাস্থ এবং ঢাকার আশপাশের আর্মি ফর্মেশনগুলি প্রথম যে ভারতীয় সৈন্যদেরই দৃশ্যপটে হাজির হতে দেখত তাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করত। আসলে আমার আশা ছিল কোনও ভারতীয় আর্মি ইউনিট পৌঁছনোর আগেই আত্মসমর্পণ গ্রহণ করার। এই অংশটা মুজিববাহিনীর ছেলেদের নিয়ে মহড়া দেওয়া হয়েছিল এবং শেখ ফজলুল হক মনি আস্থাবান ছিলেন, স্থানীয় বিষয়ে তাঁর বিশদ জানাশোনা এবং ঢাকার অভ্যন্তরে তাঁর ক্যাডারদের নিয়ন্ত্রণের কারণে, যে আমরা দারুণভাবে সফল হব এবং ইতিহাস সৃষ্টি করব। আমরা দুজনেই ছিলাম প্রকৃতিগতভাবে আশাবাদী এবং এখানে আমাদের আশাবাদ ছিল অতীব অনুকূল পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে।

মন্ত্রী আবিষ্ট হয়ে অখণ্ড মনোযোগে আমার কথা শোনার পর বললেন–"আপনি মনে করেন আপনি এটা করতে পারেন?" আমি যখন বললাম–"হ্যাঁ", তিনি বললেন তিনি জেনারেল মানকেশ'র সাথে কথা বলবেন এবং এসব কাজ যাতে আমার জন্য বরাদ্দ হয় সে ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন যদি কিনা আমি যথেষ্ট অগ্রগতি প্রদর্শন করতে থাকি, অথবা যদি এবং যখন ভারতীয় আর্মি কোনও অভাবিতপূর্ব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। আমি এতে নিশ্চয়তা লাভ করলাম এবং যারপরনাই সন্তুষ্ট হলাম কিন্তু আমার ঢাকায় প্রবেশের পরিকল্পনায় আর্মি চীফের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে তেমন নিশ্চিত বোধ করলাম না। আমি ইতিপূর্বে এটা তার কাছে প্রকাশ করিনি এবং আমি তা করতে চাচ্ছিলাম আমার চট্টগ্রাম দখলের পর, যখন তাঁর মনের অবস্থা অনুকূল হয়ে উঠবে। আমার প্রথম উচ্চাশার–চট্টগ্রাম দখলের–ব্যাপারে তাঁর প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যে পাওয়া গিয়েছে, এখন আমি উৎসুক হয়ে কী হয় না হয় তার জন্য অপেক্ষা করতে এবং সর্বোত্তম ফল যাতে অর্জিত হয় সেই আশায় থাকতে পারি।

দিল্লি- থেকে আকাশযানে ফেরত যাওয়ার সময় আমি ভারতীয় বিমানবাহিনীর গ্রুপ ক্যাপ্টেন ল্যাটে এবং স্কোয়াড্রন লীডার ভার্মার সঙ্গে কুম্ভিগ্রামে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কাছে আমার লক্ষ্যস্থলগুলি ব্যাখ্যা করে বললাম। আমি চাইলাম বর্কলের কাছের উঁচু স্থানগুলিতে ছাড়াও রাঙামাটি এবং কাপ্তাইতে যেন রকেট হানা হয়। তাঁরা দেখলাম অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ এবং সহায়ক। তাঁরা বললেন যে আমি যেসব দিনে চাচ্ছি সেসব দিনে

অন্য কোনও পূর্বনির্ধারিত কাজ নেই এবং তাঁরা আমার লক্ষ্যস্থলগুলিতে রকেট হানতে এবং গোলাগুলি চালাতে পারবেন। আমি অত্যন্ত খুশি হলাম।

আমার সদর দফতরে পৌঁছনোর পর আমি কোর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট-জেনারেল সগত সিং-কে ফোন করলাম। তাঁর কোরের পার্শ্বদেশ আমি রক্ষা করছিলাম। তিনি বললেন তিনি আমার লিখিত আনুষ্ঠানিক অনুরোধের জন্য অপেক্ষা করবেন। এবং আমার দাবি পূরণের কোনও আশা দিলেন না যদিও বিমানবাহিনী ট্যাকটিকাল সদর দফতর আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে তাদের ঐসব দিনে অন্য কোনও কাজ নেই। শেষ পর্যন্ত কোনও বিমান সমর্থন আসল না। জেনারেল মানেকশ'র প্রণোদনাতেও কোনও কাজ হল না। আমাদের নগণ্য ফোর্স যেন সমতুল্য ফোর্সের পর্যায়ে ওঠে গিয়েছে যা অগ্রগমণের গতিতে পার্শ্ববর্তী IV আর্মি কোর -এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। এই কোর -এর রয়েছে তিনটি ডিভিশন, সব মিলে প্রায় ৬০ হাজার সৈন্য, সাথে ভাল রকমের আর্মার এবং ভারী অস্ত্র। এই কোর সকল বিমান হানা নিয়ন্ত্রণ করত। আমাদের সাহায্যের জন্য কোনও বিমান হানা এই কোর মঞ্জুর করল না, যাতে করে আমাদের দেরি হয় এবং তারা আগে চট্টগ্রাম পৌঁছে তার আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে পারে। একটা জাতির জীবন -এরণ সংগ্রামের মধ্যেও মনের সংকীর্ণতার পরিচয় অপ্রচুর নয়।

গুরুতরো প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে মুজিববাহিনীকে এবং এই সময়ে এমনকি স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স -কে শ্রী ডিপি ধর -এর মনোনীত একজন, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল সরকার -এর অধীনে আনার জন্য, সব মুক্তিবাহিনী ও গেরিলা কার্যক্রমকে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধীনে আনয়নের নাম করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা স্বতন্ত্র কমান্ডের কণ্টক দূর করতে, কারণ সেই কমান্ড তার আশপাশের ফর্মেশনগুলির তুলনায় অতি মাত্রায় ভাল করছে।

আমি শ্রী কাও -এর কাছে আর্মি কমান্ডের অনমনীয় কোডের অধীনে কাজ করায় আমার অস্বীকৃতির সংকেত জানলাম। এসএফএফ বা মুজিববাহিনী অন্য কোনও কমান্ডারের অধীনে কাজ করতে প্রস্তুত নয় জেনে আমার কর্তা এই সংকীর্ণ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দিয়ে আমাকে স্বাধীন ভূমিকার নিশ্চয়তা দিলেন।

ভারতীয় আর্মি এ সময় খুব চাপ দিচ্ছিল এবং প্রত্যেক কমান্ডার সর্বাগ্রে ঢাকায় পৌঁছার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। আমাদের পার্শ্বভাগে লড়াইরত IV আর্মি কোর -এর সবচেয়ে ভাল সুযোগ ছিল কারণ তারা ছিল ঢাকার সবচেয়ে কাছাকাছি এবং তাদের হাতে ভাল রকম বিমানবাহিনীর সমর্থন ছিল।

স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যভাগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিল। উত্তর কলাম তাদের অগ্রগতির অবিমিশ্র ভাল খবর পাঠাচ্ছিল। রাঙামাটি

আক্রমণের আগে দক্ষিণে কাপ্তাইকে হুমকির মুখে ফেলার জন্য আমি ২শ' জনের মতো মুজিববাহিনীর ছেলেকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। শেখ মুজিব -এর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি চট্টগ্রাম ও ঢাকার পথে আমার সঙ্গে থাকার জন্য এসে পৌঁছেছিলেন সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী যা আমি ছকে ফেলেছিলাম এবং মুজিববাহিনীর ছেলেদের সঙ্গে যার মহড়া দিয়েছিলাম। সেসব ছেলেরা ইতিমধ্যে ঢাকা পৌঁছে গিয়েছিল। পাকিস্তান গায়ে পড়ে যুদ্ধ ঘোষণা করার সাথে সাথে ভারত বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে দিল। একটা সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিশাবে বাংলাদেশের মর্যাদা আমরা উদযাপন করলাম। জনাব মনি এবং আরও কয়েকজন তাঁদের মুক্তিতে ভারত যে ভূমিকা পালন করছে তার সহৃদয় উলে-খ করলেন। আমার বক্তৃতার পর বাঙালি তরুণরা গান গাইল ও নাচল।

পরদিন সকালে মুজিববাহিনীর ছেলেরা তাদের যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার জন্য বেরিয়ে পড়ল। তারা ছিল খুবই কম বয়সি এবং অনভিজ্ঞ, আমি তাদের পরিণতির কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছিলাম। পরে আমি এটা জেনে আঁৎকে উঠেছিলাম যে নিজেদের পরিচয় গোপন করার জন্য তাদের মধ্যে কতকে তাদের অস্ত্র নদীতে ছেড়ে দিয়েছিল যখন ছোট ছোট নৌকায় নদী পার হওয়ার সময় তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। অবশ্য পরে তারা তাদের সম্মান পুনরুদ্ধার করেছিল ঐ একই নদী পার হতে উদ্যত পলায়নপর মিযোদের চ্যালেঞ্জ করে তাদের কিছু অস্ত্র দখল করার মাধ্যমে।

আমি হেলিকপ্টারে উড়ে লাংলেহ গেলাম অ্যাডভান্স মিলিটারি হসপিটালে আহত এসএফএফ জওয়ানদের দেখতে। তাদের ঐ অবস্থা সত্ত্বেও তারা আনন্দে ভরপুর ছিল এবং এমনভাবে বিছানায় শুয়ে ছিল যেন আহত বাঘেরা শুয়ে আছে। কোনও আর্তস্বর নয়, কোনও অভিযোগ নয়, বরং তাদের মুখে মৃদু হাসির আভা এবং সবাই উদগ্রীব হয়ে ছিল ফিরে এসে যেন নিজের থেকেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে শত্রুর সাথে পাঞ্জা লড়ে তাকে নিজেদের তেজ দেখিয়ে দিতে।

এর পরে অতিশীঘ্রই আমি কর্নেল নারায়ণের কাছ থেকে বেতার বার্তায় জানতে পারলাম কর্ণফুলি নদী ধরে বাঁকাচোরা নৌকায় করে চালিত তাঁর আক্রমণে শত্রু চমকে গিয়েছিল এবং তিনি সুভলং দখল করেছেন। আমি তাঁকে আমার অভিনন্দন এবং “ওয়েল ডান” জানালাম। সুভলং দখল করার মাধ্যমে আমরা কাসালং খাল বরাবর অবস্থিত শত্রুর পোস্টগুলির পালানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছিলাম কারণ কাসালং খাল ছিল রাঙামাটির সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান পথ। বর্কল-সুভলং -এর অ্যানভিল এখন আমাদের হাতে প্রস্তুত একই পথ বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসরমান হ্যামার কলাম থেকে এড়িয়ে যাওয়া পলাতকদের গ্রহণ করার জন্য। ফাঁদ টেনে লাগানো হয়ে গিয়েছে, শত্রুর আর পলায়নের কোনও আশা রইল না।

জেনারেল মানেকশ' আমাদেরকে আরেকটা অভিনন্দনজ্ঞাপক সংকেত পাঠালেন:

> জেন উবান সিওএএস -এর নিকট থেকে ওয়েল ডান এবং ভাল কাজ চালিয়ে যাও, তোমার কাছ থেকে বড় বড় জিনিশ আশা করছি।

এই সময়ে আমরা কিছু ৮১ -এমএম মর্টার, রিকয়েললেস (আরসিএল) বন্দুক এবং কিছু বিএমজি পেলাম, কিন্তু সবই গোলাগুলি ছাড়া। আমাদের এই মর্টারের গোলা কোনও অ্যামুনিশন ডিপোতেই ছিল না। চেয়ে-চিন্তে মাত্র অল্প কতক রাউন্ড, যা ঘণ্টা দুয়েকের দ্রুত ফায়ার পর্যন্ত টিকবে না, জোগাড় করা গেল বিভিন্ন উৎস থেকে যারা সবাই তাদের অপারগতার কথা বলল। অতএব প্রত্যেকটা রাউন্ড ছিল মহামূল্যবান, ফল লাভে নিশ্চিত হয়ে সেগুলো ফায়ার করা হয়েছিল। রিকয়েললেস বন্দুকগুলি শত্রুর নৌকা ও রাস্তায় চলা যানবাহনসমূহের বিরুদ্ধে বেশ সুবিধাজনক হল। বিএমজি-গুলি প্রায় কেবলমাত্র আকস্মিকতা অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

এতকাল পরে শেষ পর্যন্ত আমরা মোটর বোর্ড ইঞ্জিনও কিছু পেলাম যদিও সেগুলি মেরামতের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হল। আর যা-ই হোক এগুলি প্রচণ্ড শব্দ করত। আর আমরা তো সম্পূর্ণভাবে আকস্মিকতার চমকের ওপর নির্ভর করতাম। স্থানীয় ধরনের দাঁড় টানা নৌকাই কেবল আমরা ব্যবহার করতে পারতাম। কিন্তু সেগুলির প্রায় সবই শত্রুপক্ষ কব্জা করে রেখেছিল, আমাদের জন্য বাকি ছিল শুধু আমরা নিজেদের বুদ্ধিতে যা তাৎক্ষণিকভাবে বানাতাম তাই।

অপেক্ষাকৃত ভারী অস্ত্র-গুলি আমাদের একমাত্র হেলিকপ্টারটিতে করে এখান থেকে ওখানে টেনে বেড়াতে হত যাতে যখন যে কোম্পানিগুলির জন্য সেগুলি সবচেয়ে বেশি দরকার তাদের হাতে তখন তা দেওয়া যায়। যে কমান্ডাররা এগুলি থেকে বঞ্চিত হত তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করতেন কিন্তু তা শোনার মতো সময় আমার খুব কমই ছিল। আসলে আমি আদেশ করেছিলাম যে, কলাম দ্রুত অগ্রগতি অর্জন করবে, আমার হেলিকপ্টার শুধু তার জন্য জিনিশপত্র বয়ে নিয়ে যাবে এবং তার মধ্য থেকেই হতাহতদের সরিয়ে নিয়ে আসবে। ধীরগতি এবং স্থৈতিক কলামগুলিকে তাদের পালা আসার জন্য অপেক্ষা করতে হবে যদিও তার মানে হচ্ছে তাদেরকে অনেক কষ্ট সইতে হবে। কেন্দ্রীয় কলামটি একবার তিনদিনের জন্য তাদের রেশন পায়নি এবং তাদেরকে অতি সামান্য সদ্য ধরা মাছ খেয়ে থাকতে হয়েছিল কারণ তারা মাছ ধরার কৌশল জানত না এবং তার জন্য দরকারি উপযুক্ত জিনিশপত্রও তাদের ছিল না।

শত্রুকে সফলভাবে আক্রমণ করে তাদের রেশন দখল করা বা তা না হলেও সফল অপারেশনের দ্বারা অগ্রাধিকার অর্জন করাই নতুন রসদ লাভের একমাত্র উপায় জেনে তারা একের পর এক দুটি শত্রু অবস্থানে প্রায় খালি পেটে আক্রমণ করে সফল

হয়েছিল। আমি হেলিকপ্টার ভরতি সরবরাহ নিয়ে ছুটে গিয়ে তাদের সাথে খানায় যোগ দিলাম– অনেক দিনের ব্যবধানে তাদের প্রথম গরম খানা।

রেশন সরবরাহ আমাদের নিজেদের বিমানবাহিনীকে বাছাই করা বিভিন্ন পয়েন্টে আকাশ থেকে ফেলতে হত (এই সরবরাহের ভাল একটা অংশ কখনও তুলে আনা যায়নি কারণ তা পড়েছিল নদীর বা গভীর স্রোতস্বিনীর মধ্যখানে)। তারপর তা যেমন একমাত্র হেলিকপ্টারটিতে করে সরাসরি দ্রুত অগ্রসরমান কলামের জন্য উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হত তেমনি মানুষের শরীরেও বহন করতে হত। এই সব এবং তার সাথে গোলাগুলি সরবরাহ, একটা মস্ত প্রশাসনিক সমস্যা ছিল এবং আমার স্টাফকে প্রায় সব সময় উদ্বেগপূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায় রাখত।

দিল্লি-তে উর্ধ্বতন সংস্থাগুলি এড়ানো-যেতে-পারত এমন কিছু সমস্যা এর সঙ্গে যোগ করে দিত। একবার স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এসএফএফ) -এর একটা খালি একজন সিগনাল অফিসারকে পোস্টিং দেওয়া হল যিনি একটা বাজে মাল হিশাবে পরিচিত ছিলেন। আমার চীফ সিগনাল অফিসার মেজর দত্ত (একজন পরম দক্ষ ও সুষম সিগনালস অফিসার) আমাকে বললেন যে সবাই জানে এই অফিসারটি যেখানেই যাবে সেখানেই নিজেকে শুধুমাত্র এক আপদ হিশাবে প্রতীয়মান করবে। তবু এই ঘোরতরো লড়াই -এর সময়ে তাঁকে আমাদের কাছে পাঠানো হল। তাঁর রকম অনুযায়ী তিনি তাঁর উর্ধ্বতনদেরকে মান্য করতে অস্বীকার করলেন। আমাদের কোর্ট মার্শাল করার মতো সময় ছিল না। আমরা তাঁকে ত্বরায় ফেরত পাঠালাম কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদে প্রচুর মূল্যবান সময় নষ্ট করা হয়ে গিয়েছিল।

জেনারেল মানেকশ' আমার সাম্প্রতিক দিল্লি- ভ্রমণের সময় আমাকে বিমান সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং ডিরেক্টর অব মিলিটারি অপারেশনস (এক অসাধারণ সৈনিক, জেনালের গিল) -কে বলেছিলেন তার জন্য বিশদ পরিকল্পনা ছকে ফেলতে কিন্তু তার থেকে কিছুই আসেনি। কমান্ড এবং কোর সদর দফতর প্রত্যেকটি বিমান হামলা নিজেদের জন্য কাজে লাগাল এবং অন্তরে খোঁচা অনুভব করা ছাড়া আমাদের আর কিছু জুটল না। আমরা এ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিলাম এবং আরও বেশি করে আমাদের উদ্ভাবনি ক্ষমতা এবং সাহসের ওপর নির্ভর করতে লাগলাম। ■

অধ্যায়–১৪

হাতুড়ির ঘা

উত্তর কলাম -এর বীরত্বপূর্ণ কাজ

কেন্দ্রীয় কলাম যখন বর্কল-সুভলং এলাকায় নিজেদেরকে সুবিন্যস্ত ও শক্তিশালী করে অ্যানভিল গঠনে ব্যস্ত ছিল, তখন উত্তর কলাম কর্নেল পিসি পুরকায়স্থের অধীনে মিযোরাম সীমান্তের মারপাড়ায় নিজেদেরকে কেন্দ্রীভূত করছিল। এই কলামের হাতে ছিল সবচেয়ে শক্ত কাজ, কাসালং খাল বরাবর সকল শত্রু অবস্থানকে ধ্বংস করা। কাসালং খালটি সুভলং -এ কর্ণফুলি নদীর সঙ্গে মিলিত। এ সময়ে তা ফুলে ওঠে বিপুল বিস্তৃত জলাশয়ে পরিণত হয়েছিল। শত্রুর পোস্টগুলি ছিল মিযোদের দ্বারা গঠিত, পাঠান ও বেলুচিদের দ্বারা শক্তকৃত। এরা গোটা অঞ্চলটাকে জিম্মি করে রেখেছিল। কর্নেল পুরকায়স্থ ছিলেন লম্বা, সুগঠিত এবং দুঃসাহসী অফিসার। মেজর আরকে মালহোত্রা এবং মেজর জিএস মান ছিলেন তাঁর দুই সাব-কলামের কমান্ডার। এই দুই মেজরের সক্ষম সহযোগিতায় তিনি তাঁর দায়িত্ব বিশিষ্ট যোগ্যতার সাথে পালন করছিলেন। এই দুঃসাহসিক অভিযানে লীডার রাযু ছিলেন তাঁর জন্য এক শক্তির মিনার। আকস্মিক ও হিংস্র এক আক্রমণে চমকে যাওয়ার পর শত্রু সারাক্ষণ ছুটাছুটির মধ্যে ছিল। মাহমুয়াম রুলুই, মাসালাং গঙ্গারাম ড়, টিনটিল-া এবং মের্শিয়া -এর পোস্টগুলির পরপর খুব দ্রুত পতন ঘটল। দুটি সাব-কলাম দুসসুরি খাল মোহনায় মিলিত হল এবং মাহিলিয়া হয়ে মিয়ানিমুখ-খাল মোহনার দিকে অগ্রসর হল।

মিয়ানিমুখ -এর দিকে যেতে হত বিশাল বিস্তৃত জলাশয়ের মধ্য দিয়ে। কর্নেল পুরকায়স্থ উর্ধ্ব গতিতে অগ্রসর হওয়ার পর চাইলেন এ পর্যায়ে তাঁর লোকেরা একটু বিশ্রাম নিক। কিন্তু আমি বললাম বিশ্রাম ও পুনর্গঠন হবে কেবলমাত্র মিয়ানিমুখ দখলের পর। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে আমি এমনকি অনুমতি দিলেও তিনি বিশ্রাম নিতে পারতেন না কারণ মের্শিয়াতে তাঁর কোম্পানি শত্রুর ৮১ এমএম মর্টারের দ্বারা প্রতি-আক্রমণের সম্মুখীন হওয়ায় সেখানে কিছু হতাহত হয়েছিল। শত্রু অবশ্য কঠিনভাবে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল। তারা ৬ জন পাঠান ও ৪ জন মিযোর মৃতদেহ ফেলে রেখে চারটি জীপে ভর্তি করে অন্যান্য হতাহতদেরকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি আমাদের নিজেদের ১০ জন আহত জওয়ানকে একটা হেলিকপ্টারে করে সরিয়ে নিতে ব্যগ্র ছিলাম। এরকম ব্যবস্থা ঠিক হল যে নির্দিষ্ট সময়ে তাদের কাছে একটা হেলিকপ্টার পাঠানো হবে, সেটাকে পথ দেখানোর জন্য এসএফএফ -এর ছেলেরা আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সংকেত তৈরি করবে। আমি ভাবলাম লড়াই চলাকালে শত্রু

এলাকায় পাইলট ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পারভেয জামাসজি -এর প্রথমে উড়ালে আমি সঙ্গে থাকি। ভাবলাম, যারা এমন শৌর্যপূর্ণ লড়াই করছে তাদের মধ্যে আমার উপস্থিতি দারুণভাবে মনোবল বৃদ্ধির কাজ করবে এবং হেলিকপ্টারে করে আহতদের দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাকে প্রত্যেকে উচ্চ প্রশংসা করবে।

আমার চীফ অব স্টাফ কর্নেল ইকবাল এই বিপজ্জনক অভিযান থেকে আমাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন। তিনি যা বললেন তা এরকম: যুদ্ধে একটি হেলিকপ্টার হচ্ছে শত্রু যোদ্ধাদের জন্য বসে থাকা হাঁসের মতো। আমাদের হেলিকপ্টারটা অনেক দিনের পুরনো। শত্রু এলাকায় এটা বিকল হয়েও পড়তে পারে, তাতে ব্যাপার আরও খারাপ হয়ে পড়বে।

যদি আমি মনে করি যে শত্রু এলাকার মধ্যে প্রথম উড়ালে একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে থাকা আবশ্যক তাহলে তিনি নিজেই যাবেন বলে প্রকৃতপক্ষেই তিনি প্রস্তাব করলেন।

আহতদের একটা হেলিকপ্টারে করে নিয়ে আসার জন্য আমি লড়াই -এর স্থানে যাচ্ছি শুনে সর্বজ্যেষ্ঠ এসএফএফ লীডার জেকে তাঁর ব্যাংকার থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলেন। তিনি আমার সিদ্ধান্তের বিচক্ষণতা নিয়ে আমার সঙ্গে যুক্তিতর্ক শুরু করলেন যদিও এটা মানলেন যে তাতে জওয়ানদের মনোবল সীমাহীনভাবে বেড়ে যাবে। কিন্তু তিনি প্রশ্ন করলেন–"আপনার হেলিকপ্টারের সঙ্গে আপনি যদি গুলি খেয়ে পড়ে যান তাহলে গোটা অপারেশনটার কী হবে?"

আমি আমার সদর দফতরের বাংকারে বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম, আমার একটু তাজা বাতাসের দরকার ছিল এবং এটাই ছিল তার জন্য সবচেয়ে ভাল সুযোগ। তাছাড়া আমি ভীষণভাবে চাচ্ছিলাম কর্নেল পুরকায়স্থ যে এলাকায় আরও অগ্রসর হবেন সে এলাকাটা পরিদর্শন করতে যদিও সেটা ছিল রীতিমতো এক বিভীষিকা। তদুপরি আমি চাচ্ছিলম কলাম কমান্ডারের সঙ্গে ভবিষ্যৎ অপারেশন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে, যা সবচেয়ে ভাল করা যায় আক্রান্ত গ্রাউন্ডের উপরে একটা অনুকূল স্থান থেকে।

যাই হোক, আমি হেলিকপ্টারে চড়লাম। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট পারভেয জামাসজি তাতে খুশি। তিনি মেশিনে স্টার্ট দিলেন। আমরা যতখানি সম্ভব আমাদের নিজেদের এলাকার পাহাড়ি রেঞ্জ অনুসরণ করে চললাম কারণ আমরা শত্রুর অঞ্চলে আমাদের অবস্থানের সময়কাল যতদূর সম্ভব কমাতে চাচ্ছিলাম। জামাসজি তাঁর ম্যাপ লক্ষ্য করে যে পয়েন্টে শত্রুর অঞ্চলে ঢুকতে হবে সেই পয়েন্টে পৌছার পর আমাকে শুধু বললেন–"স্যার, আমরা এখন শত্রুর এলাকায় ঢুকলাম।" আমি ভূমিতে ধোঁয়ায় সংকেত দেখার জন্য দৃষ্টি মেলে দিলাম। আমার হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর হল। ধোঁয়ার সংকেত আমাদের

নিজেদের লোকদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্ব নির্ধারিত স্থানের দিকে আমাদেরকে পথ দেখাবে। ঘটনাক্রমে এ সময়টা ছিল সকালের খাবারের সময়। দূরে দেখা যাচ্ছিল ধোঁয়ার অনেকগুলি স্তম্ভ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে। আমাদের জানার উপায় ছিল না কোনটা আমাদের জন্য। খাবারের সময়ে ধোঁয়াকে আমাদের সংকেত হিশাবে বাছাই করে আমরা গাধার মতো কাজ করেছি। আমরা জানতাম আমাদের লক্ষিত এলাকায় জনবসতি ছিল। এখন আর কিছু করার নেই।

ঠিক তখন জামাসজি বললেন: "স্যার, আমি শুনতে পারছি শত্রুর যুদ্ধ বিমানের পাইলট বলছে সে আমাদের হেলিকপ্টারটি শনাক্ত করতে পেরেছে।" আমি বললাম: "ভয় পেয়ো না। সোজা ঐ দিকটার ধোঁয়াটার দিকে চলে যাও" (সাথে সাথে আমি লাঠি দিয়ে সবচে' কাছের গাছের ঝাড়ের মধ্য থেকে ওঠে আসা ধোঁয়ার স্তম্ভটার দিকে নির্দেশ করলাম)।

আমার নির্দেশিত ধোঁয়ার কাছে পৌঁছে আমরা দেখলাম আমাদের কিছু জওয়ান একটা কুঁড়েঘরের দিকে দৌড়াচ্ছে। আরেকটু নিচে নেমে এলে তাদের পোশাক চিনতে পারলাম। আমরা একটা বৃত্তাকার ভূমিখণ্ডে ল্যান্ড করতে চেষ্টা করলাম। ঐ ভূমিখণ্ডের একদিকে ছাড়া আর সব দিকে পানি। জামাসজি মেশিনটাকে মাটিতে স্পর্শ করালেন। ইঞ্জিনটা চালু রইল। আমরা নেমে একটু দূরে গাছগাছালির দিকে ছুটলাম কোনও যুদ্ধবিমানের বা মর্টারের ফায়ার এড়ানোর জন্য।

কর্নেল পুরকায়স্থ তাঁর অন্য গ্রুপ অফিসারদের নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। লীডার আমার খাওয়ার জন্য একটা পাকা আনারস নিয়ে এলেন। আমি লুব্ধ বোধ করলাম কারণ অনেকগুলি সপ্তাহের মধ্যে এই প্রথম আমি তাজা ফল দেখলাম, কিন্তু আমি ভাবলাম এটা আমার সদর দফতরে মেসে নিয়ে যাই যাতে আমার স্টাফ অফিসাররা আমার সাথে এই লোভনীয় খাবার ভাগ করতে পারেন।

আহতদের যখন হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছিল তখন আমি কর্নেল পুরকায়স্থের সঙ্গে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাসমূহ আলোচনা করছিলাম। সাথে চলছিল গরম এক কাপ চা, আমার সম্মানে তাড়াতাড়ি করে বানানো। দূরের একটা কুঁড়েঘর থেকে আহতদের আনতে হচ্ছিল কাজেই তাতে বেশ কিছুটা সময় লেগে গেল। জামাসজি এই দেরির জন্য এবং শত্রুর যুদ্ধবিমানসমূহের ভয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। আমিও এ ব্যাপারে কম সচেতন ছিলাম না।

শিগগিরই হেলিকপ্টার ওড়ার জন্য তৈরি হয়ে গেল। আমি যখন উত্তর কলামের অফিসার ও জওয়ানদের ছেড়ে আসলাম তখন তারা দারুণভাবে উদ্দীপিত। এখন তারা জানল যে আমরা হেলিকপ্টারে করে অল্প সময়ের মধ্যে খরচ হওয়া গোলাগুলির পুনর্ভরণ

তো করতে পারি, হতাহতদেরও সরিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এই পরিদর্শন আমার নিজেরসহ প্রত্যেকের জন্য দারুণভাবে মনোবলবর্ধক হয়েছিল। আমার নিজের সদর দফতরের অফিসার ও জওয়ানরা ঐ দিন থেকে আরও অনেক বেশি সম্মানের চোখে আমার দিকে তাকাত। আমরা ঐ দিন আহতদেরকে লাংলেহতে ফরওয়ার্ড হসপিটালে নামিয়ে দিয়ে শিগগিরই আমাদের সদর দফতরে ফিরে গিয়েছিলাম।

শত্রুর যুদ্ধ বিমানগুলি আমার হেলিকপ্টারটি শনাক্ত করার পরও কেন সেটা আক্রমণ করল না আমি তার কারণ আন্দাজ করতে পারি না। আমরা এই যুদ্ধে যে বহুসংখ্যক বিস্ময়কর ব্যাপারের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম এ ছিল তার মধ্যে একটা।

ফীল্ড মার্শাল আমাদেরকে সম্মানিত করলেন

অবিরাম শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে আমাদের প্রতিদিনকার সাফল্যে খুশি হয়ে ফীল্ড মার্শাল মানেকশ' আমার প্রতি নতুন একটা 'ইন্সস্ট্রাকশন' পাঠালেন। তাতে চট্টগ্রাম বন্দর এবং শহর দখল করা আমাদের লক্ষ্য হিশাবে নির্ধারণ করা হল। এই নতুন সম্মানে আমার সদর দফতরে দারুণ উচ্ছ্বাসের সাড়া পড়ে গেল। আমাদের তেজের ভাল রকম পরীক্ষা নিয়ে আর্মি চীফ আমাদের মূল্যের স্বীকৃতি দিলেন। এ ছিল এক সর্বোচ্চ পর্যায়ের অসাধারণ স্বীকৃতি। শুধু গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি ফোর্স যা যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে হালকা-অস্ত্রধারী ৮শ' -এর বেশি লোক নামাতে পারে না, সেই ফোর্সকে চীনাদের দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ৩ হাজার মিযোর প্রতিরক্ষা ধ্বংস করে রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম থেকে হটানোর এবং তারপর পাকিস্তান আর্মি ব্রিগেড গ্রুপকে ধাওয়া করে তাদেরকে তাদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমি চট্টগ্রাম থেকে হটিয়ে তা দখল করার দায়িত্ব দেওয়া– এ যে কত বড় স্বীকৃতি তা সহজেই অনুমেয়।

ঐ দিন আমি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামাসজি-কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনা আনারসটা কেটে প্রথম টুকরাটা নিজে খেয়ে বাকিটা মেসের অন্য অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করে দিতে বললাম। আমি চাইছিলাম হেলিকপ্টারে আহতদের সরিয়ে আনতে সাহায্য করে জামাসজি যে সাহসের কাজটি করেছেন তা অন্যদের সামনে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরতে যাতে তাঁরাও তাঁদের জন্য অপেক্ষমান সর্বাধিক বিপজ্জনক কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এটা করার জন্য একটা আনারসের চেয়ে ভাল কিছু আমার হাতে ছিল না। ঐ দিনই আমি এই সাহসী অফিসারকে অবিলম্বে বীর চক্র পদক প্রদানের সুপারিশ করে পাঠালাম এবং সাথে সাথেই একটা সংকেতের মাধ্যমে আর্মি চীফ পদক প্রদান নিশ্চিত করলেন–একটা চমৎকার আর্মি প্রোসিডিওর যা একটা ফোর্সের মধ্যে নতুন জীবনের সঞ্চার করতে পারে।

অনুষ্ঠানাদি শেষ, এবার আমি ভাবতে বসলাম কিভাবে রাঙামাটি দখল করা যায়। রাঙামাটি চট্টগ্রাম -এর উত্তরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ কেন্দ্র, এর দখল বিখ্যাত কাপ্তাই বাঁধ দখলের ক্ষেত্রে যেমন, চট্টগ্রাম দখলের ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্বপূর্ণ।

এমনই ভাগ্য, ঠিক এই সময়েই রাঙামাটি, কাপ্তাই ও চট্টগ্রাম এই তিনটি লক্ষ্যস্থলকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর দায়িত্ব থেকে বাদ দেওয়া হল। চট্টগ্রাম নৌবাহিনীর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যস্থল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা ভারতীয় নৌবাহিনীর এয়ার উইং -এর প্রাধান্যের আওতায় চলে গেল। তাতে করে আমার যে কমান্ডোরা এই বন্দর দখল করবে তাদের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে গুরুতরো সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু ঐ সময় রাঙামাটি ও কাপ্তাই নৌবাহিনীর আকাশযানের পাল-ার বাইরে ছিল। সুতরাং আমি অনুরোধ জানালাম আমাদের অগ্রগমন সহজতর করার জন্য কুম্ভিগ্রামস্থ আমাদের এয়ার স্ট্রাইক ফোর্স-কে যেন এই লক্ষ্যবস্তুগুলিতে হামলা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

আমার অনেকগুলি সংকেত স্রেফ নথিভুক্ত করা হল। প্রত্যেকে বললেন–"তিনি তো বিমান সমর্থন ছাড়াও কাজ চালাতে পারেন; ঢাকার মধ্যে ও আশেপাশে বিমান হামলা আমাদের জন্য জরুরি প্রয়োজন।" সুতরাং যেমনটা আশা করেছিলাম তাই ঘটল। আর্মি চীফ নৌবাহিনীর সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করেছিলেন যে তারা আমাদের বিমান সমর্থন দেবে, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হল না।

এই সময় আমাদের দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটি কাজ করতে শুরু করল। সুভলং থেকে শত্রু রাঙামাটিতে হটে গিয়েছিল কিন্তু কাসালং খাল বরাবর অনেকগুলি পোস্ট তখনও তারা ধরে রেখেছিল। আমি অনুভব করলাম কিছু লোককে দ্রুত হেলিকপ্টারে করে রাঙামাটির কাছে তার উত্তর-পশ্চিম দিকটাতে নিয়ে গেলে শহরটাকে ঘিরে ফেলা হবে এবং ইতিমধ্যে শহরটিতে অনুপ্রবেশকারী মুজিববাহিনীর ছেলেদের সাথে তারা একযোগে অ্যাকশন চালালে শত্রু ভয় পেয়ে শহর ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে চলে যেতে পারে। সময় শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং ঐ দিনই আমি দুই হেলিকপ্টার ভর্তি লোক রাঙামাটির উত্তর-পশ্চিমের জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলাম। হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে মর্টার নিক্ষেপ করা হয়েছিল কিন্তু কেউ আঘাত পায়নি। বোমার কিছু ধাতব টুকরা বহন করে হেলিকপ্টার ফিরে এল। হেলিকপ্টারের গা তেমন পুরু না হওয়ায় সেগুলি তাকে ভেদ করেছিল। আমার গেরিলারা ভাল রকম মহড়া করা পরিকল্পনা অনুযায়ী ছড়িয়ে পড়ে রাঙামাটি ঘিরে ফেলল, যার অভ্যন্তরে আমাদের মুজিববাহিনীর ছেলেরা ইতিমধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল।

কোর সদর দপ্তর কর্তৃক বিশ্বাসভঙ্গ

যখন আমরা রাঙামাটির দখল নিতে যাব ঠিক এই পর্যায়ে কোর সদর দফতর থেকে এই মর্মে সংকেত বার্তা এল যে আমাদের রাঙামাটি দখল করার দরকার নেই, সে কাজটা

করতে যাচ্ছে মুক্তিবাহিনী কমান্ড (এই কোর -এর অধীনে কর্মরত)। আমাকে বলা হল যে সাময়িক সরকার চায় মুক্তিবাহিনী এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটা দখল করুক, বাহ্যিকভাবে কিছু রাজনৈতিক কারণে। আমি জানতাম যে ঐ এলাকায় মুক্তিবাহিনী ফোর্সের কেউ ছিল না, তারা আমাদের প্রচেষ্টার সুফল নিজেরা ভোগ করতে চায়। সুতরাং আমি পাল্টা এই বলে সংকেত বার্তা পাঠালাম–"এসএফএফ জওয়ানরা এলাকাটা ঘিরে আছে, তাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না এমন যে কাউকে দেখা মাত্র গুলি করতে। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা যদি শত্রুর দালাল বলে সন্দেহভাজন হয়ে হতাহত হয় তাহলে তার জন্য আমি দায়ী থাকব না।"

ঐ শেষ আমরা ঐ এলাকায় মুক্তিবাহিনীর কথা শুনেছিলাম। এসএফএফ -এর স্থানীয় নৌকার বহর লেফটেন্যান্ট-কর্নেল বিকে নারায়ণের যোগ্য নেতৃত্বে রাঙামাটি শহরে প্রবেশ করল কিছুটা বাধার সম্মুখীন হয়ে। পরে আমরা জানলাম মিযো কমান্ডার শ্রী লালডেংগা সপরিবারে রাঙামাটিতে বসবাসরত ছিলেন এবং শত্রুপক্ষ রাঙামাটি থেকে সরে যেতে পারার আগেই তারা তাঁকে আরও দক্ষিণে চট্টগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিল।

রাঙামাটিতে শত্রুকে যেটা আরও বেশি সন্ত্রস্ত করেছিল তা হচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে আমার হেলিকপ্টারটির অনবরত ঘোরাফেরা, যা শত্রুর মেশিনগান ও রাইফেলের ফায়ার দিয়েও ঠেকানো যায়নি; এবং কাপ্তাই -এর দক্ষিণ-পূর্বে দুমদুমিয়া এলাকায় কতগুলি উড়াল যেখানে এক কোম্পানি সৈন্য জড়ো করছিলাম কাপ্তাই এলাকা আক্রমণ করার পর চট্টগ্রাম -এর দিকে অগ্রসর হতে। ঐ দিকে প্রায় ২শ' মুজিববাহিনীর ছেলেকে আগেই পায়ে হেঁটে অগ্রসর হওয়ার জন্য ছাড়া হয়েছিল। পিছনভাগে এই নতুন হুমকি শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলল এবং তারা রাঙামাটি ছেড়ে হটে গেল, পিছনে ফেলে গেল রেশন, পেট্রল, তেল ও লুব্রিক্যান্ট ছাড়াও নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাগুলির বিশাল ভাণ্ডার।

রাঙামাটিতে সরে আসা, সেখানে নাগরিক সংবর্ধনা

আমি অবিলম্বে আমার সদর দফতর রাঙামাটিতে সরিয়ে নেওয়ার আদেশ দিলাম। শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি, যিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমার জন্য একটা যোগ্য নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করার জন্য রাঙামাটি রওনা হয়ে গেলেন। আমি তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু তিনি বললেন যে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। শহরের মধ্যকার বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে পৌছা মাত্র আমি দেখলাম হাজার হাজার বেসামরিক লোক আমার জন্য অপেক্ষা করছে। হর্ষোৎফুল- শেখ ফজলুল হক মনি বাংলা ভাষায় অত্যন্ত আবেগঘন এক বক্তৃতা দিলেন। আমি সেই মিষ্টি সুরেলা ভাষার বেশ

কিছুটা বুঝতে পারলাম। নাগরিকরা তাদের দেশের মুক্তিতে ভারতের ভূমিকার দারুণ প্রশংসা করছিল। ঐ দিন অপরাহ্নে স্থানীয় একটা কলেজের অধ্যক্ষ আমাকে চা খেতে ডাকলেন এবং দু'চোখে পানি নিয়ে বর্ণনা করলেন কি করে দুজন পাক সৈন্য তাঁকে বেঁধে রেখে ভরা দিনের আলোয় তার সামনে তাঁর স্ত্রীকে বলাৎকার করেছিল। যে ভয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন তার থেকে মুক্তি পাওয়াতে তিনি বারবার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

পরে বিকাল বেলায় স্থানীয় বৌদ্ধ উপজাতীয়গণ (চাকমাগণ), একটা বৌদ্ধ মন্দিরে একটা অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে এই নতুন স্বাধীনতায় তাদের আনন্দ প্রকাশ করল। তারা তাদের নেতা রাজা ত্রিদিব রায় তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের মন্ত্রী থাকাতে এতদিন পাকিস্তানের পক্ষে ছিল। তার পাকিস্তানি সৈন্যদের নির্যাতন ও বলাৎকারের কিছু ঘটনার কষ্টদায়ক বর্ণনা দিল এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য স্থানীয় রাজার দুই ছেলেকে দায়ী করল। এই দুজন রাজপুত্রকে স্থানীয় জনগণ পিটিয়ে মেরে ফেলতে পারে এটা অনুমান করে আমি তাদেরকে নিরাপদ হেফাজতে নেওয়ার আদেশ দিলাম আর তাদের মাতা রানিকে আশ্বাস দিলাম স্থিতাবস্থা ফিরে আসলে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।

এক ব্রিটিশ চা-বাগানকর্তা কর্নেল হিউম, যিনি একজন স্থানীয় রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন, তাঁর অন্তঃস্বত্তা স্ত্রীর জন্য চিকিৎসা সহায়তা এবং 'কার' ব্যবহারের সুযোগের জন্য আমার কাছে অনুরোধ নিয়ে আসলেন। (নিরাপত্তার স্বার্থে কিছুকালের জন্য সবগুলি 'কার' বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল)। আমি সানন্দে তাঁর দুটি অনুরোধেই সম্মত হলাম। আমাদের নিজেদের মেডিকাল অফিসার শিশুটির প্রসবে সাহায্য করলেন। এতে কর্নেল হিউম এবং রাজার পরিবার অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হলেন।

আমরা রাঙামাটি প্রবেশ করার আগে এবং ফেঁপে ফুলে ওঠা নদীর পানি সহজে বয়ে নিয়ে যাবে বুঝতে পেরে আমি যখন আরও কিছু কমান্ডো নগরের মধ্যখানে নামানোর উদ্দেশ্যে স্থানীয় নৌকার একটা বহর সংগ্রহ করছিলাম, তখন আমি আর্মি চীফের কাছ থেকে একটা জরুরি সংকেত বার্তা পেয়েছিলাম। তাতে বলা হয়েছিল যে শত্রুর যে বেতার বার্তা ধরা পড়েছে তাতে ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে যে তারা ঢাকা থেকে নৌপথে চট্টগ্রামে যাবে এবং সেখান থেকে আরাকান রোড ধরে বার্মায় পালাবে সুতরাং আমাকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে দোহাজারি এলাকায় একটি শক্তিশালী কমান্ডো দল পাঠিয়ে এই আরাকান রোড অবরোধ করতে। আর্মি চীফ আমাকে দুদিনের সময় দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে কুড়িকে কুড়ি মাইল ভিতরের এলাকায় যেতে হবে যার পথ-ঘাট জানা নেই, কোথায় শত্রু ওৎ পেতে আছে তার ঠিক নেই। তিনি স্বীকার করেছেন যে খুব অল্প সময়ের নোটিশে এটা করতে বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি যোগ করেছেন:

আমি জানি যে আমার পঞ্চম আর্মি কাজটা করতে সক্ষম।

আমাদের চীফের দ্বারা আমরা একটা 'আর্মি'র মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলাম। তিনি এখন আমাদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেক বেশি উচ্চ ধারণা পোষণ করছিলেন। আমরা শুধু বিমান সমর্থন ও বন্দুক ছাড়া রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম দখল করতে পারি তাই নয়, আমরা ভূত-প্রেতের মতো চলতে পারি, দোহাজারি পৌঁছতে পারি, ঐ পয়েন্টে সাংগু নদীর ওপরকার সেতু ধ্বংস করে পাক আর্মির আরাকান রোড ধরে বার্মায় পলায়ন ঠেকাতে পারি।

আমাদের মাত্র দুটি হেলিকপ্টার (এমই ৪) কাজ করছিল। পাইলটরা অস্ত্র ও গোলাগুলিসহ বড় জোর ৮ জন করে কমান্ডো বহন করতে প্রস্তুত ছিলেন। আমার দরকার ছিল প্রতিটিতে ১৩ জন করে। সুতরাং আমরা হেলিকপ্টারের মধ্যে যা কিছু অনাবশ্যক মনে করলাম তা সব খুলে নামিয়ে ফেললাম এবং ১৩ জন করে লোক তাতে ভরলাম। তারা ক্যাচ ক্যাচ শব্দ তুলল কিন্তু ইঞ্জিন তাদের ঠিকই উড়িয়ে নিতে পারল। আমি অনবরত আরও হেলিকপ্টার চাচ্ছিলাম। তারা অনতিদূরে বিনা কাজে বসেও ছিল। কিন্তু আমার কাছে তা কখনও পৌঁছয়নি। হেলিকপ্টারের স্থানে আমরা আমাদের চীফ -এর কাছ থেকে একটা নতুন অভিনন্দন বার্তা পেলাম যাতে বলা ছিল:

আমার নতুন আর্মির ওপর আমার অন্তর্নিহিত বিশ্বাস আছে।

এতে করে স্বাভাবিকভাবেই আমরা অসম্ভবের পথে পা বাড়াতে উদ্যোগী হলাম।

আমরা আরাকান রোড -এ প্রাধান্য বিস্তার করতে দক্ষিণ অভিমুখে ছুটলাম, ওদিকে আমাদের উত্তর কলাম রাঙামাটির উত্তরে শত্রু কর্তৃক তখন পযন্ত ধরে রাখা পোস্টগুলির সকল অবশেষ ধ্বংস করতে ব্যস্ত রইল। আমাদের চীফ -এর কাছ থেকে আমরা আরেকটা সংকেত বার্তা পেলাম:

তোমাদের জন্য আমার বিমুগ্ধ প্রশংসা। সাবাস, ওয়েল ডান। দ্রুত অগ্রসর হতে থাকো।

উত্তরে আমার কমান্ডারের আরেকটি বিজয় যার পরিপ্রেক্ষিতে চীফ -এর কাছ থেকে আরেকটা অভিনন্দনজ্ঞাপক সংকেত বার্তা এল:

সাবাস, এভাবে ফাটিয়ে চলো। তোমার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা।

এ সময়ে প্রথম হেলিকপ্টারটা ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে দোহাজারি সেতুর দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়ি স্থান উদ্দেশ্য করে উড্ডয়ন করেছে। ঐ সেতুটা ধ্বংস করা আমার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। সাংগু নদীর ওপর ঐ সেতুটা উড়িয়ে দিতে পারলে শত্রুর পক্ষে বার্মায় পালানোর সুযোগ খুব কমই থাকবে। সুতরাং আমার সম্পূর্ণ মনোযোগ এই কাজটায় কেন্দ্রীভূত ছিল। যা-ই হোক আর্মি চীফ ১২ ডিসেম্বর সকালের মধ্যে দোহাজারি সেতুর

মতো সবগুলি সেতুরই ধ্বংস আশা করছিলেন।

আমি ভাবলাম দোহাজারি সেতু ধ্বংস করার কাজে কেন্দ্রীভূত হতে থাকা অগ্রগামী কোম্পানিটির সঙ্গে আমার থাকাটা ভাল হবে। প্রথম হেলিকপ্টারটিতে যে লোকেরা উড়ে গিয়েছে তাদের কাছ থেকে একটা অল ক্লিয়ার সংকেতের জন্য অপেক্ষা করার মতো সময় আমার ছিল না। সুতরাং আমি দ্বিতীয় হেলিকপ্টারটিতে চড়ে বসলাম। প্রথমটার পাঁচ মিনিট পরে এটা উড্ডয়ন করল, যাতে সেখানে ২৬ জনের একটা পে-টূন গড়ে ওঠার কথা। প্রথমটার কাজ ছিল আমাদের অবতরণের স্থান বিপদমুক্ত করা এবং সম্ভব হলে অতর্কিত হামলায় ধ্বংস করার জন্য দোহাজারি সেতুর দিকে অগ্রসর হওয়া। মেজর এসএস নেগি-কে, যিনি পরে বীর চক্র পদক অর্জন করেছিলেন, আমি আদেশ করেছিলাম অবতরণের পরেই একটা শক্ত সমর্থ প্যাট্রল বান্দরবনের দিকে পাঠিয়ে দিতে। জানা গিয়েছিল যে সেখানে প্রায় ২০০ জন পাঠান ছিল এবং তাদের সমর্থন দিচ্ছিলেন স্থানীয় রাজা (বোমং সরদার) যিনি নাকি পাকিস্তানপন্থী ছিলেন এবং শহরে তাঁর প্রাসাদে বাস করছিলেন। মেজর নেগি-কে আরও আদেশ দেওয়া হয়েছিল একটা পে-টূন সাংগু নদীর বাঁকের দিকে পাঠাতে এবং অন্য একটা পে-টূন দোহাজারির সেতুর দিকে পাঠিয়ে অতিসত্বর সেটা ধ্বংস করতে। এই সড়ক বরাবর নৌবাহিনীর আকাশযান থেকে বোমাবর্ষণ করা ও কামান দাগা হচ্ছিল যা মেজর নেগির কাজে এসেছিল। উক্ত হামলায় এমনকি সেতুটার এক প্রান্তও আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাতে করে আমাদের কমান্ডোরা সেতুর কাছে ঘনিয়ে আসতে পারল, সেতুর প্রতিরক্ষায় মোতায়েন পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা ও উৎখাত করতে সক্ষম হল। আমাদের আক্রমণ শত্রুকে এমনভাবে মনোবলহীন করে দিল যে যারা বেঁচে গিয়েছিল তারা চট্টগ্রামের দিকে ছুটতে লাগল তাদের পিছনে সবগুলি সেতু উড়িয়ে দিতে দিতে, যে কাজটা আমাদেরকে অনেক কষ্ট কসরত করে করতে হত।

বান্দরবানে পাঠানরা নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে স্থানীয় নৌকায় করে সাংগু নদী ধরে দক্ষিণে রুমার দিকে এবং রুমা ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে চলে গেল। তাদেরকে স্থানীয় চাকমা ও মিযোরা পথ দেখিয়ে নিচ্ছিল। তারা আমাদের হেলিকপ্টার শক্তি সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিল, ভেবেছিল কুড়িকে কুড়ি বার হেলিকপ্টার ভরতি করে বিরাটসংখ্যক কমান্ডো আনা হচ্ছে বান্দরবান ঘিরে ফেলার জন্য। আসল ঘটনা হচ্ছে আমি আমার হেলিকপ্টারকে বান্দরবান শহর ও তার আশপাশের নদী ও পাহাড় এলাকার ওপর দিয়ে চষে বেড়াতে বলেছিলাম। সেখানে রাজার প্রাসাদটা সবচেয়ে বড় ভবন, সেটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করায় আমি তার ছাদের খুব কাছ দিয়ে বার বার উড়ে গিয়েছি অসাধারণ কোনও কার্যকলাপের নিশানা চোখে পড়ে কিনা দেখার জন্য। পরে ঠিক এই

প্রাসাদেই রাজা আমাদের চা -এর জন্য নিমন্ত্রণ করে প্রাসাদের ওপর হেলিকপ্টারের আসা-যাওয়ায় তারা কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে মজার গল্প বলেছেন। তিনি প্রতিবার আশঙ্কা করছিলেন প্রাসাদটা ধ্বংস করার জন্য একটা বোমা ফেলা হবে।

অনেক সুযোগ নষ্ট হল

যথেষ্ট আকাশযানের অভাবের কারণে আমরা শত্রুদের বন্দি করার ও তাদের অস্ত্রশস্ত্র দখল করার অজস্র সুযোগ নষ্ট করলাম। আমি সংকেতের পর সংকেত পাঠিয়ে চললাম আরও দুটি হেলিকপ্টারের জন্য আবেদন করে, যাতে করে আমাদের যে দুটি আছে তার পাশাপাশি তা বাছাই করা লক্ষিত এলাকায় উপযুক্ত সংখ্যায় লোকবল পৌছানোর কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু কোনও কাজ হল না। একটা এলাকায় অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ গমন করে আমরা সেখানে যে ভীতির সৃষ্টি করেছিলাম তা আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না। এক ঘটনায় আমি পায়ে হাঁটিয়ে মাত্র এক সেকশন শক্তির লোকবল পাঠিয়েছিলাম ২৫০ জন পাঠানের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে, যারা আমাদেরকে বিরাট বাহিনী মনে করে আত্মসমর্পণের অঙ্গীকার পাঠিয়েছিল। এই ধোঁকা মাঝে মাঝে কাজ করত। অনেক সময়ই কাজ করত না।

শত্রুর পলায়নের আশা ধ্বংস হল

দোহাজারি সেতু ধ্বংস করা এবং বান্দরবান এলাকায় সাংগু নদী শত্রুমুক্ত করার পর আমরা আর্মি চীফ-কে একথা বলার অবস্থায় আসলাম যে আরাকান রোড শত্রুকে ব্যবহার করতে না দেওয়ার এবং সাংগু নদীতে শত্রুর পরিবহন বন্ধ করে দেওয়ার অতিরিক্ত কাজ সময় অনেক হাতে থাকতেই হাসিল করা হয়ে গিয়েছে এবং তিনি এখন শত্রু কমান্ডারকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দিতে পারেন যে এ অঞ্চলটা একটা মৃত্যুর ফাঁদে পরিণত করা হয়েছে, এর মধ্যে দিয়ে কেউ আর পালাতে পারবে না। আমাদের এই নিশ্চয়তা দানের পরই পাক জেনারেল নিয়াযি-কে দেওয়া আমাদের আর্মি চীফের হুঁশিয়ারি ফলপ্রসূ হল, পাক জেনারেল শর্তহীন আত্মসমর্পণের কথা গুরুত্বের সাথে চিন্তা করতে শুরু করলেন। স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স ন্যায়সংগতভাবে শত্রুর আত্মসমর্পণে একটা বড় ভূমিকা দাবি করতে পারে।

আমি আর্মি চীফ -এর কাছ থেকে নিচের সংকেত বাণীটি পেলাম:

তোমার অর্জনসমূহের ব্যাপারে আমি গর্বিত। আমার অভিনন্দন। চলতে থাকো এবং পুরস্কার তোমারই হবে।

চট্টগ্রাম নিয়ে কাড়াকাড়ি

চট্টগ্রাম বন্দর ও শহরে আগেই অনুপ্রবেশ করা মুজিববাহিনীর ছেলেরা আমার ফোর্সের নদী পাড়ি দিয়ে রাতের বেলায় চট্টগ্রামে নামার জন্য নৌকার ব্যবস্থা করল। তারা বেতার কেন্দ্র দখল করল। বেতার কেন্দ্রের স্টাফের মধ্যে তাদের সমর্থন ছিল। তারা এমনকি পাক সৈন্যদের আত্মসমর্পণও ঘোষণা করল।

ঠিক এই সময় আমি আর্মি সদর দফতর থেকে সংকেত বার্তা পেলাম যে আমার ফোর্স কর্ণফুলি নদী পাড়ি দেবে না এবং তার দক্ষিণ দিকে থাকবে। এ হচ্ছে আমাকে চট্টগ্রামে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করা; চট্টগ্রাম হচ্ছে কর্ণফুলি নদীর উত্তর পারে। সংকেত বার্তা এও বলল যে চট্টগ্রামস্থ পাক আর্মির সেনাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণের জন্য দুটি আর্মি ব্রিগেড চট্টগ্রামের পথে রয়েছে।

একটা ছোট গেরিলা ফোর্সকে সেখানকার পাক সৈন্যদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে দেওয়া এবং তারা এই মস্ত বন্দর নগরীটি দখল করেছে এই কথা বলার সুযোগ দেওয়া বোধ করি আর্মির পক্ষে একটু বেশি হয়ে যাচ্ছিল। আমরা সাংঘাতিক রকম হতাশ হলাম। এতে বিস্ময় ও ক্রোধ প্রকাশ করতে শেখ ফজলুল হক মনি যা মুখে এসেছে তাই বলেছিলেন। ■

অধ্যায়–১৫

নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ

জেনারেল নিয়াযি তাঁর সৈন্যদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে সম্মত হওয়ার পর ভারতের দিকে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জেএস অরোরা এবং পাকিস্তানের দিকে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল নিয়াযি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে ১৬.৩১ ঘটিকায় যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। পাক সৈন্যরা যেখানেই লড়াই করতে মনস্থ করেছে সেখানে ভালই লড়েছে এবং চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই। এমন প্রকৃতির একটা যুদ্ধে জয়লাভ খুব কমই সম্ভব– একটা চরম প্রতিকূল ভূমিতে, যেখানে জনগণ পুরাপুরি শত্রুভাবাপন্ন এবং মূল ঘাঁটি থেকে অপারেশনের ভূমি সহস্রাধিক মাইল বিস্তৃত একটি শত্রু রাষ্ট্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন। সমরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহিরের ধর্মান্ধ জোশে তাদের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়েছিল, তারা দেখতে পায়নি তাদের আশাহীন অবস্থা এমন একটা দেশের বিপরীতে যা তাদের তুলনায় আয়তনে পাঁচগুণ বড়, জনশক্তিতে নয় গুণ শক্তিশালী এবং সম্পদে বহুকুড়িগুণ ধনী।

ভারত অত্যন্ত উৎফুল- হয়েছিল, কিন্তু ইচ্ছা করেই তা দেখিয়েছে খুব কম করে। ভারতের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। সমগ্র এশিয়া এবার ভীতিমিশ্রিত বিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। পাকিস্তানের তথাকথিত বন্ধুরা তাদের পলিসি নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবতে বসল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যিনি এমন রাষ্ট্রনায়কতা ও সাহস দেখালেন তাঁকে প্রেসিডেন্ট ভারতরত্ন উপাধি দিলেন কৃতজ্ঞ ও হর্ষধ্বনিতে মুখর জাতীয় সংসদের সর্বসম্মত সুপারিশে। জেনারেল স্যাম মানেকশ' যিনি ছিলেন এই সমগ্র অপারেশনের পিছনে বুদ্ধি ও অনুপ্রাণনা–, তিনি ভারতের প্রথম ফীল্ড মার্শাল হলেন। সিমলা চুক্তি হল এই যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিশাবে, যাতে সৃষ্টি হল এক নতুন জাতি-রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং চিরতরে ধ্বংস হল ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্ব (যা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্তির ভিত্তি হয়েছিল)। ভারত ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দির সঙ্গে দখলকৃত পাকিস্তানি ভূমি ছেড়ে দিল, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দাবি করল না এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে একতরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করল।

এই যুদ্ধের ফলে ভারত লাভ করল আর কিছু নয় শুধু ভুট্টোর শুভেচ্ছা; যিনি ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত চিৎকার করতে থাকতেন কাশ্মিরের অধিকার সংক্রান্ত অনেক আগেই নিষ্পত্তি হওয়া কলহের নিষ্পত্তির দাবি তুলে এবং আর লাভ করল একটু আশা যে হিন্দু ভারত জয় করে অতীতের মুসলমান আক্রমণকারীদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করার বাতিক থেকে পাকিস্তান বেরিয়ে আসবে।

বাংলাদেশের নতুন শাসক শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর স্বধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নিজের

ভাবমূর্তি ঘষে মেজে ঠিক করে নিতে এবং বিভিন্ন বিশ্ব ফোরামে তাঁর নতুন জাতির পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত হলেন।

তাঁর দেশ ধ্বংসযজ্ঞের নিচে চাপা পড়ে ছিল, কোষাগার ছিল শূন্য এবং মানবিক দুর্দশার সমস্যা ছিল অনতিক্রম্য। বেসামরিক প্রশাসন ও পুলিশের অবকাঠামোর সাংগঠনিক অবস্থা অতীব দুর্দশাগ্রস্ত, কিছু ক্ষেত্রে অনির্ভরযোগ্য, ফলে তাঁর অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং আইন-শৃঙ্খলা স্থাপনের কাজে তাঁর খুব একটা সাহায্যে আসার মতো ছিল না। আর্মি তখনও নিজ পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ছিল এবং পাকিস্তান আর্মি থেকে দেশান্তরিত হয়ে আসা সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ বাঙালি অফিসারদের আত্তীকরণের সম্ভাবনায় ভীত ছিল। সর্বপ্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ তখনও একটা নতুন স্বাধীনতা পাওয়া দেশের দায়িত্বশীল শাসক দলের ভূমিকায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়নি, যে স্বাধীনতা অর্জিত হল প্রধানত সব রকম মত ও পথের মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা। মওলানা ভাসানী তাঁর ভাগ দাবি করার সেই পুরনো খেলা খেলতে শুরু করলেন। বামপন্থী ও মার্কসবাদীরা তাদের সংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশ কিছু বেশি মাত্রায়ই তাদের নিজেদের চাপ প্রয়োগ করতে লাগল। যুবকরা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের আশঙ্কায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র ধরে রাখল। জীবনের অবশ্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব বাড়তে লাগল। জনগণের চাওয়াও বাড়তে লাগল। তারা যে কোনও মূল্যে এই বিভীষিকাময় অবস্থার অবসান কামনা করল।

স্থিতিশীলতা ও গোলযোগ এই দুই -এর মাঝখানে দাঁড়ানোর মতো কারিশমা একমাত্র শেখ মুজিবের ছিল। মুজিব শৃঙ্খলা এবং সমগ্র জাতির কঠিন পরিশ্রম দাবি করলেন এবং সর্বোপরি সময় চাইলেন। কিন্তু সেই অতীব আবেগপ্রবণ ও সহজে উত্তেজিত জাতি কি তাঁকে সেই সময় দেবে? এই ছিল এক প্রশ্ন। নতুন জাতিকে ঠিকভাবে চলতে শুরু করানোর জন্য ভারত সর্বাত্মক চেষ্টা করছিল কিন্তু তাকে সংহতিনাশক বিরাট শক্তিসমূহের মোকাবিলা করতে হল। সে সব শক্তি ভারতের ক্ষমতার সর্বশেষ অবস্থাকে দেখল কিছুটা ভীতির সঙ্গে, ভারতের সঙ্গে মুজিবের বন্ধুত্বকে তারা ঘৃণা করল।

স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স -এর নতুন ভূমিকা

আমার সৈন্যরা তখনও গোলাগুলির সম্মুখীন হচ্ছিল। মিযো, রাযাকার এবং চাকমাসহ অনেক প্যারা মিলিটারি বাহিনীর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কিন্তু সশস্ত্র লোক পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো গেরিলা যুদ্ধের আদর্শ ভূমিতে বিচরণ করছিল– আর্মি চীফ -এর আদেশে আমি যুদ্ধ-বিরতির আদেশ দিয়েছিলাম। আমি চাইলাম তাঁর কাছে আমার অবস্থা পরিষ্কার করতে। আর্মি চীফকে আমার উভয়-সংকটের কথা বললাম এবং পরিষ্কার করে বলতে বললাম আমাদেরকে গুলি করা হলে এবং পাক কমান্ড না মানা বিচরণশীল মিযো দুর্বৃত্ত দলবলের ব্যাপারে আমাদের কী করতে হবে। তিনি বললেন আমাদের শুধু আত্মরক্ষার্থে

গুলি করতে হবে কিন্তু আমাকে আদেশ দিলেন যদি মিযোরা তাদের পাক হাই কমান্ডকে মান্য করে আত্মসমর্পণ করতে রাজি না থাকে তাহলে তাদেরকে ধাওয়া করে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বের করে দেওয়ার জন্য। চীফ আরও বললেন:

তুমি প্রতিদিন নতুন ও কৌতূহলোদ্দীপক দুঃসাহসিক কাজের সম্মুখীন হচ্ছ। বেস্ট অব লাক।

আমরা যখন এলাকাটা পরিষ্কার করে মিযোদেরকে মিযোরাম সীমান্ত বরাবর আমাদের পোস্টগুলিতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলাম, আর্মি চীফ আমাকে নিচের সংকেত বার্তাটি পাঠালেন:

তোমার পাঠানো প্রতিটি বার্তার পাঠ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হচ্ছে। মিযোদের বিরুদ্ধে তোমার সাফল্যে পরমানন্দিত। বিবেচনা করো তুমি এখন তোমার অর্জিত জয়ের সম্মান নিয়ে বিশ্রাম করতে পার। তোমার ভারতে ফেরত আসার ব্যাপারে নির্দেশসমূহের জন্য অপেক্ষা করো।

লড়াই থামল না। মিযোদের বিরুদ্ধে আমাদের আরও কিছু কাজ করতে হল। চীফ আমাদের উৎসাহিত করলেন আরেকটি মর্মস্পর্শী বার্তার দ্বারা যা সর্বস্তরের সবাইকে অভিভূত করল:

সিওএএস তোমাকে জোর অনুমোদন জানাচ্ছেন এবং তোমার ফোর্স যে অসাধারণ কাজ করেছে তার জন্য অভিনন্দন।

রাঙামাটি, কাপ্তাই এবং অন্যান্য শহরে নাগরিক সংবর্ধনা লাভ করে আমরা অনুভব করলাম যে বাংলাদেশের জনগণ তাদের মুক্তির জন্য আমাদের যে স্বার্থ ত্যাগ, সে ব্যাপারে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। একটা প্রতিনিধি দল শেখ মনির কাছে প্রস্তাব করল আমরা এমন সাংঘাতিক প্রতিকূলতার মধ্যে যা করেছি তার জন্য তারা আমাকে ও আমার ফোর্সকে সম্মানিত করতে চায়। আমি ভাবলাম আমার যে সব স্টাফ নয়া দিল্লি-তে বসে এই কষ্টসাধ্য অভিযানের সময়টায় প্রচার ও প্রশংসা ছাড়া শুধু কষ্ট করে গিয়েছেন তাঁদেরকে যদি চট্টগ্রামে এই নাগরিক সংবর্ধনায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেয়া যায় তাহলে একটা সঠিক কাজ করা হয়। আমাদের কর্মকাণ্ডের এলাকাটা পরিদর্শন করাও তাঁদের উচিত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য, যা তাঁদের পেশাগত জীবনের পথে সহায়ক হতে পারে। আমি চেয়েছিলাম শ্রী আরএন কাও আসুন। কিন্তু সব সময় আলোকসম্পাতের থেকে দূরে থাকা তাঁর স্বভাবগত, সুতরাং তিনি এর থেকে অব্যহতি চাইলেন। তবে তিনি অত্যন্ত সদয় হয়ে আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ব্রিগেডিয়ার বিবি ভাটনাগরকে, যিনি এসএফএফ সদর দফতরে তাঁর বিশিষ্ট কাজের জন্য অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেলে ভূষিত হয়েছিলেন, ব্রিগেডিয়ার (পেরে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল) টিএস ওবেরয়কে, যিনি

আমাদের মুজিববাহিনীর ছেলেদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন, এবং ফোর্সের প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্নেল বিডি কৌশলকে পাঠালেন। আমি আমার চীফ অব স্টাফ কর্নেল ইকবাল সিং যিনি মেনশন ইন ডেসপ্যাচেস লাভ করেছিলেন, কর্নেল পুরকায়স্থ বীর চক্র এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল খান্নার নাম উলে-খ করেছিলাম সংবর্ধনার সময় আমার সঙ্গদাতা হিশাবে।

এমনকি এখানেও কোর সদর দফতর শুরুতে আমাকে ও আমার ফোর্সকে সংবর্ধনা দেওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করল। আমাকে বলা হল যে তারা এটা করেছে বিদ্বেষের বশে কারণ তারা চায় তাদের কোর কমান্ডারের সম্মানে সংবর্ধনা দেওয়া হোক। তাদের সৈন্যরা সেখানে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেছে, আর বেসামরিক নেতারা, যারা আওয়ামী লীগের লোক, চায় আমাকে ও আমার ফোর্সকে আগে সংবর্ধনা দিতে কারণ তারা জানে ঐ এলাকায় কে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। সত্যি বলতে কী শেখ মনি আমাদের আর্মির এই আচরণে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন– "চট্টগ্রামে কোনও সামরিক নেতাকেই সংবর্ধনা দেওয়া না হয় তা আমি দেখব।"

যা হোক পরে কিছুটা বলা কওয়ায় আর্মি কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি বিশেষ পক্ষপাতী এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হওয়ায় মত দিল। ব্রিগেডিয়ার ওবেরয় ঐ সদর দফতরে তাঁর এক জ্যেষ্ঠ বন্ধুকে যখন বললেন যে এই সংবর্ধনা হতে না দিলে তার গুরুতরো রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হবে, তারপর তারা রাজি হল।

আমরা একটা ভাল রকম সাজানো প-াটফর্মে শেখ ফজলুল হক মনি, ঐ এলাকার এমএনএ জনাব আবু সালেহ এবং অন্যান্য নেতাদের দ্বারা বৃত হলাম। তারা অত্যন্ত উচ্চ প্রশংসায় ভরা বক্তৃতা দিলেন। আমার দেশ ও আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করলেন। আমি আমার বক্তৃতা শুরু করলাম বাংলায়। আমার উদ্দেশে বিপুল উল-াস ধ্বনি উঠল। প্রথম কয়েকটা বাক্য আমি নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করার পর আমার বাকি বক্তৃতাটা ইংরেজিতে চালিয়ে গেলাম, মনি সাহেব তা বাংলায় তর্জমা করে দিলেন। অশেষ জনতা এমন উদ্দীপনা প্রকাশ করছিল, কেউ মুক্তি অর্জন করলেই যা করতে পারে। শত শত ট্রাক ও কার বহু মাইল দীর্ঘ মিছিলের সৃষ্টি করেছিল। আমাকে আওয়ামী লীগের প্রতীক স্বরূপ একটা ইপিএনএস নৌকার সঙ্গে একটা সম্মাননা লিপি এবং শেখ মুজিবর রহমানের একটা ফটো উপহার দেওয়া হল। সম্মাননা লিপিটি বাংলা ভাষায় হাতে লেখা, তাতে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা যা আমার উচ্চ প্রশংসায় ভরা ছিল।

তারপর আমাদের বিনোদনের জন্য ঢাকার বেতার শিল্পীদের পরিবেশিত সংগীত শোনানো হল। আমাদের সকলের জন্য সে এক স্মরণীয় দিন ছিল। ■

অধ্যায়–১৬

রণনীতিগত ধারণাসমূহ এবং প্রচলিত যুদ্ধ

আত্মসমর্পণ

পাকিস্তানের যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ৫ দিন পরে বাংলাদেশে পরিস্থিতি পাকিস্তানি আর্মির কাছে অত্যন্ত কঠিন মনে হতে শুরু করে। মনে হচ্ছিল ভারতীয় আর্মি ঢাকার দিকে চেপে আসছে। ৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ ঢাকা থেকে বিদেশে নাগরিকদেরকে বিমানে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি চাইল। ৯ ডিসেম্বর গভর্নর মালেক এবং জেনারেল নিয়াযি ইসলামাবাদে একই সঙ্গে আলাদা আলাদা বার্তা পাঠালেন যে পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতরো এবং গভর্নর মালেক তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতির ও রাজনৈতিক নিষ্পত্তির অনুমতি চাইলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সম্মত হতে দ্বিধা করলেন না। তখন গভর্নর মালেক ঢাকায় জাতিসংঘের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল হেনরিকে ধরে তাঁকে একটা যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। স্বভাবতই এই খবর ছড়িয়ে পড়ল এবং অনেকগুলি বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হল। জেনারেল মানেকশ'ও পাকিস্তান ফোর্সের উদ্দেশ্যে একটা বিশেষ বার্তা প্রচার করে বললেন যে তারা নিজেদের নিরাপত্তা চাইলে তক্ষুনি তাদের আত্মসমর্পণ করা উচিত। পাকিস্তানি সৈন্যরা ও তাদের কমান্ডারা এ পর্যায়ে বুঝল যে তারা হেরে গিয়েছে, কিন্তু সরকারি বিবৃতির অপেক্ষার সময় গুনতে লাগল।

মাহেন্দ্রক্ষণ এসে গেল যখন ঢাকায় গভর্নমেন্ট হাউযের যে হলে গভর্নর মালেক গুরুত্বপূর্ণ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে একটা সভা করছিলেন তখন, বেলা ১১ টার সময়, সেই হলেই ছাদের ওপর ভারতীয় মিগগুলি আঘাত হানল। তার একটু আগেই ইসলামাবাদে পাঠানো তারবার্তা ভারতীয় পক্ষের কাছে ধরা পড়েছিল এবং বিমানবাহিনী তাদের নিখুঁত বোম্বিং -এর প্রমাণ দেওয়ার জন্য একটা সুযোগ পেল। গভর্নর ও তাঁর উপদেষ্টারা দৌড়ে এয়ার রেইড শেল্টারে গিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। এয়ার রেইড শেল্টার -এ বসে গভর্নর তাঁর পদত্যাগ পত্র লিখলেন এবং বোমাবর্ষণ শেষ হলে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের নিরাপত্তায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গিয়ে উঠলেন।

মিগগুলি বেসামরিক কর্মকর্তাদের কাঁপিয়ে দিয়ে আত্মসমর্পণে প্রবুদ্ধ করলেও পাকিস্তানি আর্মির তাদের জিনিশপত্র বাঁধাছাদা করার আগে ঢাকার মধ্যে ভারতীয় আর্মির বড় বড় দলের আগমনের পক্ষে কিছু শক্ত প্রমাণ দরকার ছিল। যখন অকুতোভয় জেনারেল সগত মেঘনা নদীর অপর পাড়ে তার ফর্মেশনগুলিকে জড়ো করার জন্য তখনও সংগ্রাম করে যাচ্ছিলেন তখন মাউন্টেন গানাররা (ভারতীয় আর্টিলারির এলিট অংশ) ৬৫

মাউন্টেন রেজিমেন্টের গানগুলিকে খুলে ঘাড়ে করে নিয়ে এসে ঢাকার ভিতরের লক্ষ্যবস্তুগুলিতে গোলা দাগাল। তাতে শুধু ৫৭ ইনফ্রান্ট্রি ডিভিশনের ঢাকার উপকণ্ঠে আগমন ঘোষিত হল না। পাকিস্তানি প্রতিরক্ষাকারীদের বাঁধাছাদা করার অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথাও ঘোষিত হল।

ঘটনাক্রমে জেনারেল চৌধুরী (ডাকনাম মুচু) দেশভাগের অব্যবহিত পরে হায়দ্রাবাদে পুলিশ অ্যাকশনের সময় ধর্মান্ধ রাযাকারদেরকে (যারা শেষ গুলি ও শেষ যোদ্ধা পর্যন্ত লড়তে চেয়েছিল) একই চাতুরি দ্বারা জান নিয়ে পলায়নে মনস্থ করতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ৪০ মিডিয়াম রেজিমেন্টের একজন সৈন্য দিয়ে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাগুলির ওপর শেষ দাগিয়েছিলেন, তারপর পদাতিকদেরকে অগ্রসর হতে দিয়েছিলেন। মাত্র চারটা ২০০ পাউন্ডের শেল দমাদম ঠিক ঠিক জায়গামতো পড়তেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল, তারপর শুধু সাঁই সাঁই করে এগিয়ে যাওয়া।

জেনারেল নিয়াযি ঢাকাস্থ মার্কিন কন্সাল জেনারেল মি. স্পিভাক -এর মাধ্যমে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব পাঠানোয় এবং মি. স্পিভাক প্রতিটি বার্তা ওয়াশিংটনের মাধ্যমে পাকিস্তানে বা ভারতে পৌছাতেন বলে মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের পাকিস্তান ফোর্সের মনোবলের অবস্থা জানতে বাকি রইল না, ফলে তাদের উদ্ধারে সপ্তম নৌবহরের অগ্রগমণ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে তাদের উৎসাহ মিইয়ে গেল।

মেজর জেনারেল নাগরা, বীর ভারতীয় জেনারেল, যখন পাকিস্তানি সেন্যদের আত্মসমর্পণের শর্তাবলি আলোচনা করতে জেনারেল এ কে কে নিয়াযির সদর দফতরে গাড়িতে করে গেলেন তখন তাঁর কাছে নিয়াযির প্রথম মন্তব্য ছিল, "পিন্ডিতে বসে থাকা হারামজাদারা যুক্তরাষ্ট্রকে চেটে চুপসে দিয়েছে।" পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চীফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব অতঃপর খুব শিগগিরই পাকিস্তান আর্মির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলের খসড়া সহ সেখানে পৌছলেন। এর পরে খুব শিগগিরই একটা হেলিকপ্টার ফর্মেশন জেনারেল অরোরা ও তাঁর স্ত্রী, এয়ার মার্শাল দেওয়ান, ভাইস অ্যাডমিরাল কৃষ্ণান, লেফটেন্যান্ট-জেনারেল সগত সিং ও তার ডিভিশনাল কমান্ডারগণ—এঁদেরকে বহন করে সেখানে যায়। শ্রীমতী অরোরা বাদে এঁরা সবাই ছিলেন বাংলাদেশ যুদ্ধের নায়ক। জেনারেল অরোরা সম্ভবত শ্রীমতী অরোরাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন যাতে নিয়াযির কাছে আত্মসমর্পণের মর্মাঘাতটা একটু নরম হয়। ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে এক দর্শনীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল নিয়াযি ও লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। তখন উপস্থিত ছিল লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি যাদের কেউ কেউ তাদের সাবেক অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রাগে টগবগ করছিল। এর সাথে ৯০ হাজারের বেশি যুদ্ধবন্দি

ভারতীয় আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তিবাহিনী এবং অন্য যারা দুর্ভোগ ভূগেছিল তাদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য আবেদন করল। এটা দুঃখজনক যে কর্নেল এমএজি ওসমানী, যিনি ১৩ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে বাংলাদেশের সাময়িক সরকার কর্তৃক মুক্তিবাহিনীর চীফ হিশাবে নিয়োজিত হয়েছিলেন, যিনি মুক্তিবাহিনীর সংগঠনে এত কিছু করেছেন, এই আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না যদিও তাঁর উপস্থিত থাকার হক ছিল। গ্রুপ ক্যাপ্টেন খন্দকার বাংলাদেশ বাহিনীগুলির প্রতিনিধিত্ব করলেন। কেউ একজন নৈতিক ভুলটা করে বাংলাদেশ আর্মির সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার একটা ঐতিহাসিক সুযোগ নষ্ট করেছিল।

এসব কী করে ঘটল?

আমার যখন শিলং -এ ২২ মাউন্টেন রেজিমেন্টের কমান্ডে পোস্টিং ছিল তখন একবার বাংলাদেশ (তখন পূর্ব পাকিস্তান বলে পরিচিত) -এর সীমান্ত পরিদর্শন করা হয়েছিল আমার। সেখানে অনেকগুলি স্রোতস্বিনী পরস্পরকে ছেদ করে বয়ে যাচ্ছিল, স্থানটা গাছপালায় ঠাসা ও ছায়াচ্ছন্ন ছিল। এই দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে এমন স্থানে অল্প কিছু সংখ্যক দৃঢ়সংকল্প ও উত্তমরূপে সশস্ত্র লোক, ফর্মেশনসমূহ ও ডিভিশনসমূহের অগ্রগমণ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্বিত করতে পারে। ট্যাংক খুব কমই কাজ লাগবে এবং বিমানবাহিনী খুবই কম সমর্থন জোগাতে পারবে এত গাছপালা ও ছায়াচ্ছন্নতার কারণে। বৃষ্টিবহুল এলাকা হওয়ায় এখানে ফীল্ড গান ও ভারী কামান কাদায় আটকে যাবে। এটা একটা অতি উত্তম গেরিলা যুদ্ধের স্থান যেখানে জন্তুর পিঠে বওয়া মাউন্টেন গানের সমর্থনে শক্তসমর্থ পদাতিক সৈন্যই একমাত্র সম্ভাবনা। আমি আসলে গর্ব করেই একটা সভায় বলেছিলাম যে আমাকে একটা পদাতিক ডিভিশন নিয়ে এই এলাকাটার প্রতিরক্ষার ভার দিলে আমি যে কোনও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকাল ধরে লড়াই চালাতে পারব এবং এই ভূমিতে, বিশেষত বর্ষাকালে, মেকানাইযড ফর্মেশনগুলি সামান্যই ভূমিকা রাখতে পারবে অথবা কোনও ভূমিকাই রাখতে পারবে না।

তাহলে ৫টি ডিভিশনের বেশি সুসজ্জিত ও শক্তসমর্থ পাকিস্তানি সৈন্য লড়াই -এর ১৪ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করল, এটা কেমন করে হল?

স্ট্র্যাটেজিক ডিরেকশন

ভারত

সব যুদ্ধই হচেছ মূলত মনের লড়াই–শুধু পরস্পর বিরোধী ফর্মেশন কমান্ডারদের মনের নয় বরং যে বেসামরিক রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের আগে যুদ্ধের সময়ে এবং যুদ্ধের

পরে জাতিসমূহের জীবন -এরণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে তাদেরও মনের। ভারতের সৌভাগ্য হয়েছিল যে সে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, সাহসী ও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম একজন মহিলা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী হিশাবে পেয়েছিল। তিনি সহায়তা লাভ করেছিলেন এই অপারেশনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী ডিপি ধর -এর মতো একজন নিবেদিতপ্রাণ রাজনীতিকের, শ্রী পিএন হাকসার -এর মতো কয়েকজন সবচেয়ে পারদর্শী সিভিল অফিসারের, একজন অসাধারণ বিদেশ সচিব শ্রী টিএন কাউল -এর।

বহির্দেশীয় গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল শ্রী আরএন কাও -এর দক্ষ হাতে। অভিজ্ঞতা ও মেধায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

যাতে পরাশক্তির জড়িয়ে পড়ার ভয় আছে এমন একটা যুদ্ধ চালানোর জন্য উপরিস্তরে এর চেয়ে ভাল ও এর চেয়ে সুসমন্বিত সমাহার কোনও দেশ কামনা করতে পারে না। এই নেতাদেরকে ঠাণ্ডা ও ধীরস্থির মনে হত এবং প্রায়ই একটা অ্যাকাডেমিক পরিষদের মতো মনে হত কিন্তু তাঁদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার সামনে দিয়ে কোনও কিছু এড়িয়ে যেতে পারত না। কোনও ব্যাপারেই সিদ্ধান্ত, তা যতই ঝুঁকিপূর্ণ হোক, গ্রহণে তঁদের কখনও দেরি হত না।

প্রতিরক্ষা সেট-আপও একই রকম সুসমন্বিত এবং সুক্ষম ছিল। জেনারেল (এখন ফীল্ড মার্শাল) এসএইচএফ জে মানেকশ' এমসি-কে তার ব্যক্তিগত আকর্ষণি ক্ষমতা এবং দক্ষতার জন্য তাঁর সহকর্মী বিমানবাহিনীর এয়ার চীফ মার্শাল পি সি লাল ডিএফসি এবং নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল এস এম নন্দ ভালবাসতেন ও সম্মান করতেন। এই সব ক'জনেরই অবস্থান ছিল দিলি-তে সুতরাং পরামর্শের জন্য সকলকেই পাওয়া যেত। চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ সিস্টেম যাতে তিনটি সার্ভিসই একজন ব্যক্তির কমান্ডের অধীনে আসে, তার পক্ষে অনেক কথাই বলা হয়েছে। এর সুবিধা ও অসুবিধা দুইই আছে এবং আমি মনে করি ভারতের জন্য এটা একান্ত আবশ্যক নয়। আমাদের যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু আছে যাতে চীফস অব স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব চক্রায়িত হয়ে একেক টার্মের জন্য আর্মি নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর চীফদের মধ্যে ঘুরতে থাকে, তা মুক্ত আলোচনা ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার সৃষ্টি করে, ফলে তার পক্ষে সুপারিশমূলক অনেক কিছু বলার থাকে। এই সময় কালে ফীল্ড মার্শাল মানেকশ' ছিলেন চেয়ারম্যান এবং তিনি বিস্ময়করভাবে কাজ চালিয়েছিলেন। রণরঙ্গমঞ্চ পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বিদ্যমান ছিল। বাংলাদেশ অপারেশনসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জিওসি-ইন-সি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জে এস অরোরা শিলং -এ এয়ার মার্শাল এসি দেওয়ান পিভিএসএম এবং ভিসাখাপটনম -এ ভাইস অ্যাডমিরাল এন কৃষ্ণান -এর সঙ্গে একত্রে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য তাঁদের সঙ্গে সংস্পর্শ বজায় রাখতেন। হয়তো তিনজনই

একটি স্থানে, যেমন কলকাতায়, সংস্থিত হলেই আরও ভাল হত, কিন্তু তাতে সমস্যা ছিল এবং বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদর দফতর যেখানে তার কমান্ড সবচেয়ে ভালভাবে কার্যকর করা যায় সেই সেই স্থানে সরিয়ে দেওয়াই সবচেয়ে ভাল বলে মনে করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই এই তিন বাহুর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের জন্য লিয়োযোঁ অফিসাররা পূর্বাঞ্চল কমান্ড সদর দফতরেই অবস্থান করতেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি ইউনিটগুলি যেমন ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ঈস্ট পাকিস্তান রাইফেলস মুক্তিবাহিনীর ভলান্টিয়ারদের সাথে সাথে বিভিন্ন সীমান্তে ছড়িয়ে যাওয়া ফর্মেশনগুলির কমান্ডের অধীনে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল আর তাদের চীফ কর্নেল ওসমানী কলকাতায় জেনারেল অরোরার সদর দফতরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাকতেন।

পাকিস্তান

পাকিস্তানের কোনও বেসামরিক সেট-আপ ছিল না। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ছিলেন রাষ্ট্রপতি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং সবগুলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধান। এমন পরিস্থিতিতে একটা মানুষ যদি ক্ষমতার সবগুলি আসন দখল করে থাকে তবে সে এ অবস্থায় যেমন, তার চেয়ে বেশি করুণাযোগ্য আর কোনও অবস্থায় হতে পারে না, বিশেষত যদি তার যোগ্যতা অত্যধিক সীমিত থাকে। একমাত্র রাজনৈতিক নেতা জনাব যেড এ ভুট্টো তাঁর সকল উপযোগিতা নিঃশেষ করেছিলেন রাজনৈতিক প্রশ্ন মীমাংসায় সাহায্য করতে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে লোক দেখানো সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গী হয়ে এবং শেষে চট্টগ্রামে টিক্কা খানের পাইকারি হত্যাযজ্ঞ অনুমোদনপূর্বক এই কথা বলে যে–"খোদাকে ধন্যবাদ। এই হত্যাযজ্ঞের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানকে রক্ষা করা হল।" পাকিস্তানি জেনারেলদেরকে সমর্থনের খেসারত পরে তাঁকে দিতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি পাখায় ভর করে অপেক্ষা করছিলেন পরিস্থিতি অনুকূল হলেই পাকিস্তানের পরবর্তী বেসামরিক একাধিকপতি হিশাবে ক্ষমতা গ্রহণের আশায়। ইতিমধ্যে তিনি ৫ নভেম্বর একটা পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে পিকিং গেলেন যুদ্ধে তাদের সমর্থন চাইতে।

রণনীতি

চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সমঝোতা ঘটানোয় পাকিস্তানের ভূমিকার পুরস্কার হিশাবে তারা এই দুটি দেশ থেকে শক্তিশালী সমর্থন আশা করছিল, যার ওপর ভিত্তিশীল ছিল তাদের রণনীতি। ৯ আগস্ট ১৯৭১ -এ স্বাক্ষরিত ইন্দো-সোভিয়েত বন্ধুত্ব চুক্তিতে অপেক্ষমান বিপর্যয়ে কোনও প্রভাব সৃষ্টির ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের নতুন

অক্ষের কার্যকারিতা কাটাকাটি হয়ে গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের (বা তাদের অনুরোধে জাতিসংঘের) হস্তক্ষেপের আশা পাকিস্তানে চালু ছিল, তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল একটা প্রতিরক্ষামূলক লড়াই লড়ে যাওয়ার, যাতে তাদের জেতার কোনও আশা ছিল না। তার ওপরে নিয়াযি এমন এক টেকনিক বেছে নিলেন যাতে এমনকি তাদের পরাজয়ে বিলম্ব হবে না এবং তাদের বন্ধুরা তাদের সাহায্যে আসারও সুযোগ পাবে না।

নিয়াযি সদ্য পদোন্নতি পেয়ে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল হয়ে এসেছিলেন। তাকে কাজ দেওয়া হয়েছিল "অভ্যন্তরীণ নাশকতা ঠেকাতে এবং বহিরাগ্রাসন থেকে পাকিস্তানকে রক্ষা করতে।" প্রথম অংশ, অভ্যন্তরীণ নাশকতা ঠেকানো একটা নিয়মিত বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষত যখন সমগ্র জনগণ তীব্র অসন্তোষে টগবগ করছে এবং ভিন্ন জনগোষ্ঠীর দখলদার বাহিনীর প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছু পোষণ করছে না।

"বহিরাগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা" কাজটা রাজনৈতিক বা সামরিক কোনও পরিভাষাতেই পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত ছিল না। কোনও লিখিত ডিরেক্টিভ বা ইন্স্ট্রাকশন জেনারেল নিয়াযিকে দেওয়া হয়নি। তাঁকে কেউ ব্রীফ করেনি। এটা সত্যি তাজ্জবের ব্যাপার যে জেনারেল নিয়াযি এই অবস্থার মধ্যে নিজের সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাতে কোনও লিখিত ব্রীফ বা ইন্স্ট্রাকশন -এর জন্য তাগিদ দেওয়া থেকে বিরত থাকলেন। ঐ পর্যায়ের একজন সামরিক কমান্ডারের একটা লিখিত ব্রীফ বা ইন্স্ট্রাকশন ছাড়া এক পা-ও অগ্রসর হওয়ার কথা নয়।

যদিও সেপ্টেম্বর ১৯৭১ -এ দায়িত্ব নেওয়ার সময় জেনারেল নিয়াযির কাছে এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা যে তাঁর উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় আর্মি উন্মুখ ও প্রস্তুত হয়ে আছে, তবু তিনি নিজেকে এই বিশ্বাসে প্রবুদ্ধ করলেন যে ভারতীয় আর্মির একমাত্র লক্ষ্য পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে পাকিস্তানি শরণার্থীদের সরিয়ে আনার ও একটা সাময়িক বাংলাদেশ সরকার বসিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট বড় এলাকায় ঘাঁটি গাড়া। সুতরাং তিনি শত্রুর এই লক্ষ্য অর্জন ঠেকাতে তাঁর দায়িত্বাধীন প্রতি ইঞ্চি ভূমির সামগ্রিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিলেন। বিশেষত তিনি চাইলেন ভারতীয় আর্মি যেন কোনও গুরুত্বপূর্ণ শহর হস্তগত না করে। কারণ তাতে করে রাজনৈতিক হেডলাইন -এর সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং তিনি যেখানে গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে সেই পর্যন্ত বড় বড় লড়াই চালানোর জন্য তার সৈন্যদেরকে ছড়িয়ে দিলেন। শহরের প্রতিরক্ষা দারুণ ব্যাপার, অনেক শহরের প্রতিরক্ষা ইতিহাসের বিখ্যাত ল্যান্ডমার্কে পরিণত হয়েছে যেমন স্তালিনগ্রাদের প্রতিরক্ষা। সুতরাং তিনি সীমান্ত বরাবর সড়কগুলির গায়ে পড়ে এমন শহর যেমন চট্টগ্রাম, কুমিল-া, ভৈরববাজার, সিলেট, ময়মনসিংহ, জামালপুর, রংপুর, বগুড়া, ঝিনাইদহ এবং যশোর বাছাই করলেন। এবং

সেগুলিকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে প্রয়োজনে শেষ গুলি এবং শেষ মানুষটি পর্যন্ত সেগুলি রক্ষা করতে হবে এমন আদেশ দিলেন।

জেনারেল নিয়াযির পরিকল্পনা পাক আর্মি সদর দফতরে অনুমোদিত হল। পাকিস্তান আর্মির কমান্ডার-ইন-চীফ জেনারেল হামিদ জেনারেল নিয়াযি কর্তৃক দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে এসেছিলেন এবং তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তিনি অবশ্য বলেছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় ঢাকাকে চূড়ান্ত রকমের গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে। এটা অবশ্য সুস্পষ্টভাবেই বোধগম্য। আমি নিশ্চিত যে নিয়াযি এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং তাঁর সৈন্যরা প্রয়োজনে ঢাকার প্রতিরক্ষায় হটে আসুক সেটা তাঁর পকিল্পনার মধ্যে ছিল কিন্তু তিনি তাঁর কোনও অধস্তন কমান্ডারকে কখনও এর বিন্দুমাত্র আভা দেখাননি পাছে তাঁদের মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা যথাসময়ের আগেই হটে আসতে শুরু করে। অবশ্য এই দায়িত্বে মোতায়েন তাঁর ৩৬ পদাতিক ডিভিশনের অবশিষ্টাংশ এবং ঢাকার কাছাকাছি অন্যান্য ফর্মেশনগুলির সাহায্যে ঢাকার প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারার কোনও কারণ ছিল না।

এই শহরগুলিই ভারতীয় আর্মি ফর্মেশনগুলির প্রথম লক্ষ্যস্থল করা হবে নিয়াযির এই হিশাব ঠিক ছিল কিন্তু ভারতীয় আর্মি কখনও এগুলিকে পাশ কাটিয়ে রণাঙ্গনের কেন্দ্রস্থল ঢাকার দিকে অগ্রসর হবে না এটা ভাবা তাঁর ভুল হয়েছিল।

পাকিস্তানি সৈন্যদের নিম্নরূপে মোতায়েন করা হয়েছিল।

উত্তর-পশ্চিম সেক্টর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই সেক্টরে শিলিগুড়ি করিডোর যা পূর্বাঞ্চলকে ভারতের সমগ্র বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করে এবং যা চুম্বি উপত্যকার চীনা ঘাঁটিগুলির অনায়াস নাগালের মধ্যে। এই সেক্টরে আরও দক্ষিণে হিলি-গাইবান্ধায় ছিল আরেকটি করিডোর যা সমগ্র পাকিস্তানি বাহিনীকে দক্ষিণে আটকে রাখতে পারে এবং সকল শর্ত পূর্ণ করে একটা সীমিত আক্রমণের যা ভারত আশা করছিল। ১৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল নযর হোসোইন শাহ-কে এই সেক্টরে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তার জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ১০টা পদাতিক ব্যাটালিয়ন, একটা মুজাহিদ ব্যাটালিয়ন এবং এক রেজিমেন্ট চাফী ট্যাংক।

দক্ষিণ-পশ্চিম সেক্টর। গোয়ালন্দ ঘাট ফেরি এর মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এই গোয়ালন্দ ঘাট ফেরি হয়ে পুরনো পথে কোলকাতা থেকে ঢাকা নিকটতম দূরত্বে অবস্থিত। গুরুত্বপূর্ণ শহর যশোর ও খুলনা ছাড়াও চালনা বন্দর এর মধ্যে পড়ে। এর প্রতিরক্ষায় ছিল মেজর জেনারেল এম এইচ আনসারির ডিভিশনের ৮টি পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং এক স্কোয়াড্রন চাফী ট্যাংক।

কেন্দ্রীয় সেক্টর। এই সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল টাঙ্গাইল ও ঢাকা। এটা সব দিকেই নদী দিয়ে ঘেরা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ। এর প্রতিরক্ষা দেওয়া হয়েছিল ৩৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল জামশেদ খান-কে। মাত্র দুটি পদাতিক ব্যাটালিয়ান এবং একটা মর্টার ব্যাটারি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এবং কোনও আর্মার নয়।

পূর্ব সেক্টর। এখান থেকেই ঢাকার দিকে হ্রস্বতম পথ। উত্তর দিকে সিলেট মুক্তিবাহিনীর অপারেশন চালানোর চমৎকার সুযোগ দিয়েছিল আর দক্ষিণে চট্টগ্রাম একমাত্র বন্দর যা শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আনয়ন এবং উদ্ধার কাজে ব্যবহার করা যেত সুতরাং একে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের উর্ধ্ব স্থানে রাখার যোগ্য বলে বিবেচনা করা হল। জেনারেল নিয়াযি এই সেক্টরের দায়িত্বে দেন দুটি ডিভিশনকে যাতে ছিল ১৪টা পদাতিক ব্যাটালিয়ন এবং এক স্কোয়াড্রন আর্মার। চট্টগ্রামের প্রতিরক্ষার কাজে একটা বিগ্রেড গ্রুপকে লাগানো হয়েছিল। নভেম্বরে এই দক্ষিণ অংশে বলবৃদ্ধি করা হয়েছিল কারণ তখন নিয়াযি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতের তরফ থেকে প্রধান ধাক্কাটা এই দিক দিয়েই আসছে। নিয়মিত সৈন্য ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামজুড়ে বিরাটসংখ্যক চীনা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মিযো এবং পাকিস্তান থেকে আসা আধা-সামরিক বাহিনীসমূহ মোতায়েন করা হয়েছিল, শুধু বন্দরটির নিরাপত্তার জন্যই নয়, আবশ্যক হলে চূড়ান্ত পশ্চাদপসরণের জন্য চট্টগ্রাম থেকে বার্মার দিকে যাওয়া আরাকান রোড -কে মুক্ত রাখার জন্যও। মিযো ন্যাশনাল ফ্রন্ট নেতা লাল ডেংগা তাঁর সদর দফতর রেখেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটিতে। পাক আধা-সামরিক বাহিনীগুলি পর্বতসারি বরাবর একবারে কক্সবাজার পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল।

পাকিস্তানি আর্মি তার উদ্ধারের অতীত ধ্বংসের জন্য এইভাবে নিজেকে বিন্যস্ত করেছিল। তারা সামরিক আবশ্যকতাকে রাজনৈতিক কাম্যতার অধীন করেছিল। তারা ভারতীয় মহানগরগুলিতে বোমাবর্ষণের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য সময় বেছে নিল মৌসুমি বৃষ্টির সময় নয় যখন ভারতীয় আর্মি কাদায় আটকে যেত এবং প-াবনে উপচে পড়া নদীগুলির পারাপারে আটকে থাকত কারণ কোনও যোগাযোগ ব্যবস্থাই কাজ করত না। যুদ্ধ ঘোষণা তারা করল ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ -এ যখন যন্ত্রায়িত ভারতীয় আর্মি ভূমির ওপর দিয়ে শঁ শঁ করে এগিয়ে যেতে পারত, তা করার জন্য সম্পূর্ণ তৈরিও ছিল, যখন উত্তরের গিরিপথগুলি তুষারপাতে আটকে গিয়েছিল ফলে চীনারা এমনকি ইচ্ছা করলেও পাকিস্তানকে সাহায্য করার অবস্থায় ছিল না।

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি

কিছু সামরিক পরাকৌশলী বাতলেছিলেন যে এপ্রিল (১৯৭১) -এর প্রথম ভাগই ছিল ভারতীয় আক্রমণের জন্য সবচেয়ে ভাল সময় কারণ তখন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র

প্রায় এক ডিভিশনের সমান শক্তি ছিল, উত্তরের গিরিপথগুলি তখনও তুষারে আটকানো ছিল, এবং আক্রমণের এলাকার কাছে-পিঠে ভারতীয় আর্মির যথেষ্ট সৈন্য উপস্থিত ছিল। বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী ডিসেম্বরে যা করেছিল তেমনই কার্যকারী ভূমিকা তখনও রাখতে পারত। আমি অনুভব করি তখন যদি জয়লাভ হতও, এমন দর্শনীয় বিজয় হত না এবং যথেষ্ট পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতির অভাবের কারণে আমাদের আক্রমণ ব্যর্থও হতে পারত। পরিপূর্ণ প্রস্তুতি পর অপারেশন হাতে নেওয়ার জন্য পূর্ণ কৃতিত্ব ফীল্ড মার্শাল মানেকশ'-কে দেওয়া উচিত। তিনি জনমত বা রাজনৈতিক চাপের খপ্পরে পড়ে গেলে বিশাল বিজয়ের দ্বারা তিনি যে উচ্চতা লাভ করেছেন তা করতেন না।

পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সদর দফতরে পরিকল্পনা হয়েছিল খুঁটিনাটি ব্যাপারে পর্যন্ত অতি সতর্কতার সাথে। অন্য রকম হওয়ার যো ছিল না কারণ চীফ অব স্টাফ লেফটেন্যান্ট-জেনারেল জে এফ আর জ্যাকব ছিলেন একজন দক্ষ অফিসার। জেনারেল অরোরার বিশেষ যোগ্যতাও ছিল পরিকল্পনায় এবং প্রশিক্ষণে। সার্ভিস জীবনে এ দুটিতে তাঁর ভাল রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

পরিকল্পনাটা যথেষ্ট সাহসী পরিকল্পনা ছিল না এই মর্মে যে সমালোচনা করা হয়ে থাকে তার মধ্যে কিছু সারবস্তু রয়েছে। পরিকল্পনা ততটা সাহসী হতে পারে যতটা তার কার্যনির্বাহের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডাররা ও সৈন্যরা সাহসী এবং উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য ব্যবহার্য সাজসরঞ্জামাদির প্রাপ্যতা যতখানি। এই যুদ্ধের একজন প্রখ্যাত কমান্ডার জেনারেল লক্ষ্মণ সিং তার অসাধারণ বই *ভিক্টরি ইন বাংলাদেশ* -এ মন্তব্য করেছেন যে ভারতীয় আর্মিকে জারি কর আদেশাবলিতে ঢাকা দখলের কোনও উলে-খ ছিল না সুতরাং নদীর বাধাসমূহ অতিক্রম করার অথবা হেলিকপ্টারের সাহায্যে ওপর থেকে ঢাকাকে আচ্ছাদনের পরিকল্পনার অভাব ছিল।

আমাদের কোনও হেলিকপ্টার বহর ছিল না এবং আমাদের যে সীমিত সংখ্যক এমই-৪ হেলিকপ্টার ছিল তা আর্মির প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারের অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল না। প্রাথমিকভাবে সেগুলি ছিল প্রশাসনিক কাজে এবং হতাহতদের সরিয়ে নেওয়ার কাজে ব্যবহার্য বিমানবাহিনীর দায়িত্বাধীন হেলিকপ্টার। আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপারে এটা একটা গুরুতরো শূন্যতা এবং এর একটা সমাধান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত। কিন্তু ১৯৭১ -এ যুদ্ধে একটা আবশ্যিক প্রয়োজন হিশাবে আর্মি এগুলি চাওয়ার কোনও প্রচেষ্টাই নেয়নি বা এই দিকটির কোনও প্রশিক্ষণই চালায়নি। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে আমাদের জেনারেল সগত সিং এবং জেনারেল গনযালভেস ছিলেন প্যারাট্রুপার এবং তাঁরা তাঁদেরকে দেওয়া অল্পসংখ্যক হেলিকপ্টারের চমৎকার ব্যবহার করেছেন মেঘনা নদী পাড়ি দিতে ও ঢাকায় পৌছতে। আসলে জেনারেল সগত তাঁকে দেওয়া হেলিকপ্টারগুলি কখনও তার নজরের বাইরে যেতে দেননি এবং ঠিক এই উদ্দেশ্যে

সেগুলি ব্যবহারের সুযোগের জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন। তার পার্শ্বে থেকে অসম সাহসের সাথে লড়াই -এ রত আমার স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সকে একটিও হেলিকপ্টার না দেওয়ার জন্য জেনারেল সগতের বিরুদ্ধে আমার নিজের অভিযোগের উৎস এই সূত্রটিই।

আর্মি বা কমান্ড সদর দফতর ঢাকাকে লক্ষ্যস্থল হিশাবে উলে-খ করেনি এই মর্মে জেনারেল লক্ষ্মনের অভিযোগের প্রতি সম্মান রেখেই আমি বলব যে যদিও ঢাকা বাংলাদেশের রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল, কিন্তু সেটা পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক দুর্গনগর ছিল না। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডারকে প্রদত্ত করণীয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনীগুলির বিপুলাংশকে ধ্বংস করা। এই লক্ষ্য একবার অর্জিত হয়ে গেলে ঢাকাতে হেঁটে গিয়ে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দেওয়াটাই বাকি থাকে। ঘটনাক্রমে পাকিস্তানি সৈন্যরা সর্বত্র পরাজিত হওয়ার পরও ৪ কোর সঠিক সময়ে ঢাকার পথে পা বাড়ায়নি। এটা ঠিক যে বাংলাদেশের অপারেশনের মতো মস্ত অপারেশনের প্রথম পর্যায় শুরু করার পর প্রথম পর্যায়টা সমাপ্ত হওয়ার ফলে বা আগে থেকে আন্দাজ না করা কোনও ঘটনাচক্রে, চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থলের ক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন হল কি না সে সম্বন্ধে সিনিয়র কমান্ডাররা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, প্রায়ই এমনটা হয়। কিন্তু সবগুলি সম্ভাব্য-চূড়ান্ত-লক্ষ্য পরিস্থিতির জন্য আলাদা আলাদা বিকল্প পরিকল্পনা রণরঙ্গমঞ্চের কমান্ডাররা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আগে থেকেই ভালভাবেই চিন্তা করে রাখেন। যা হোক, অনেক আগে থেকে সৈন্যদের বিশেষত যারা ঢাকার সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল তাদের দ্রুত নদী পার হওয়ার কোনও প্রস্তুতি না রাখার পক্ষে কোনও চলনসই কৈফিয়ত বা ওজর নেই। ঢাকাকে উপরে থেকে আচ্ছাদনের অর্থাৎ ঢাকাতে ওপর থেকে অবতরণের কোনও পূর্ব-বন্দোবস্ত না রাখা সম্বন্ধেও একই কথা। আমি সত্যি বিস্ময়ে চমকে গিয়েছিলাম এটা জেনে যে ফর্মেশনগুলির কাছে প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনা তুলে দেওয়া হয়েছিল সে অনুযায়ী কাজ করে যাওয়ার জন্য, কিন্তু নিচের ফর্মেশনগুলি যে সচরাচর নিজ নিজ পরিকল্পনা তৈরির অনুশীলন করে থাকে এবং উচ্চতর পর্যায়গুলিতে সেগুলির সমন্বয় করে থাকে তেমন কিছু করা হয়নি। তার জন্য প্রচুর সময় ছিল আর লড়াই -এর দায়িত্বে যাঁরা থাকবেন তাঁদেরকে আগেই পরিকল্পনায় সংশি-ষ্ট করলে নিশ্চয়ই ভাল হত। সে যাই হোক ভারতীয় আর্মিকে নিম্নলিখিত বিন্যাসে মোতায়েন করা হয়েছিল।

উত্তর পশ্চিম সেক্টর। ৩৩ কোর -এর জিওসি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল থাপার ছিলেন পূর্বাঞ্চলে একমাত্র জেনারেল অফিসার যিনি আগের কোনও লড়াই -এ ডিভিশন কমান্ড করেছিলেন। তাঁকে দেওয়া হল হিলি-গাইবান্ধা করিডোরের কটিরেখা বরাবর কেটে দক্ষিণে বগুড়া ও উত্তরে রংপুর দখল করার কাজ। অধিকন্তু তাঁর জন্য ২০ মাউন্টেন ডিভিশন, একটা অতিরিক্ত পদাতিক ব্যাটালিয়ান, এক-স্কোয়াড্রন-কম দুটি আর্মারড

রেজিমেন্ট এবং একটা ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড। তদুপরি উত্তর দিক থেকে ৭১ মাউন্টেন ব্রিগেডের কাজ করার কথা রইল।

রণনীতিগত দিক থেকে এটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর সুতরাং শত্রুর মোতায়েনকৃত শক্তি এবং ভালভাবে প্রস্তুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাসমূহ বরাবর তার প্রতিরোধ, দুই-ই ছিল সবচেয়ে ভারী। এই সেক্টরে প্রধান আক্রমণটি চালিয়েছিল মেজর জেনারেল লক্ষ্মণ সিং বীর চক্র -এর অধীন ২০ মাউন্টেন ডিভিশন। তিনি আর্মারের ব্যবহারে ও তাৎক্ষণিক উদ্ভাবনে দারুণ চমৎকারিত্ব দেখালেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কোর এবং ডিভিশনাল কমান্ডের উপদেশের বিরুদ্ধে জেনারেল অরোরা নিজে হিলির সজাগ প্রতিরক্ষাসমূহের বিরুদ্ধে একটা সরসরি আঘাত হানার আদেশ দিলেন যাতে তিনি আর্মার -এর ব্যবহারও নিষেধ করলেন। এই আক্রমণ এবং হিলির বিরুদ্ধে আরও কিছু সামনাসামনি আক্রমণ ব্যর্থ হল, যেমন হওয়ার কথা ছিল, এবং এতে ভারী রকমের ক্ষয়ক্ষতি সংঘটিত হল। পরে স্থানীয় কমান্ডারদের অনুরোধে কমান্ড সদর দফতর থেকে পরিকল্পনাসমূহ সংশোধন করা হল। এটা ছিল সবচেয়ে শক্ত লড়াইসমূহের একটা এবং এটা ২৩ নভেম্বর থেকে আত্মসমর্পণের দিন পর্যন্ত চলেছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম সেক্টর। কোলকাতার সবচেয়ে কাছের সেক্টরটি দেওয়া হল সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট-জেনারেল ২-কোর -এর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল টি এন রায়না এমভিসি-কে। তিনি ১৯৬২ -এর চীনা যুদ্ধের একজন পক্ব সৈনিক। পরে তিনি ভারতীয় আর্মির চীফ অব স্টাফ হয়েছিলেন। কোর সদর দফতরটিকে অক্টোবরে দুটি ডিভিশন, এক-ব্যাটালিয়নকম এক প্যারাশুট ব্রিগেড এবং অতিরিক্ত এক স্কোয়াড্রনসহ এক আর্মারড রেজিমেন্ট -এর নিয়ন্ত্রকে উন্নীত করা হয়েছিল। যশোর ও খুলনায়-চালনা দখল তাদের কাজ ছিল। পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড এই কোর -এর বিভিন্ন ফর্মেশনকে সময় বাঁধা লক্ষ্য অর্জনের দায়িত্ব দিয়েছিল এবং তাদের চোখ থাকার কথা ছিল ঢাকার দিকে। সময় বাঁধা দায়িত্ব দেওয়া একটা সঠিক কাজ ছিল। মেজর জেনারেল এমএস ব্রার -এর কমান্ডে ৪ মাউন্টেন ডিভিশন (রেড ঈগল) এবং ৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল দলবীর সিং -এর কমান্ডে উক্ত ডিভিশন কতকগুলি শক্ত রকমের লড়াইয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে ঝিনাইদহ সেক্টর ও যশোর সেক্টর হস্তগত করেছিল।

কেন্দ্রীয় সেক্টর। এই সেক্টর ছিল ঢাকার সবচেয়ে কাছে তবু যুধ্যমান উভয় পক্ষই একে সবচেয়ে কম অগ্রাধিকার দিয়েছিল। এই সেক্টরের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এখানে ছিলেন বাঘা সিদ্দিকী, একজন বাঙালি গেরিলা নেতা যিনি পাকিস্তানি বাহিনীগুলির সঙ্গে টেক্কা দিয়ে তাঁর টাঙ্গাইল এলাকাকে শত্রু সৈন্য থেকে মুক্ত রেখেছিলেন। এই দেশপ্রেমিক পরে অগ্রসরমান ভারতীয় আর্মির সঙ্গে যোগ দিয়ে

তাদেরকে দারুণভাবে সহযোগিতা দিলেন। পাকিস্তানি আর্মির আত্মসমর্পণের খুব অল্প পরেই ঢাকায় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল।

১০১ কমিউনিকেশন যোন -এর মেজর জেনারেল গার্বক্স সিং গিল -কে জেনারেল অরোরার সরাসরি কমান্ডের অধীনে এই এলাকাটা শত্রুমুক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। ব্রিগেডিয়ার এস কে খার -এর অধীনে ৯৫ মাউন্টেন ব্রিগেড এবং ব্রিগেডিয়ার সন্ত সিং -এর অধীনে এফ টি সেক্টর তাঁর সঙ্গে ছিল, আরও ছিল একটি মাউন্টেন রেজিমেন্ট, ভারী মর্টারের দুটি ব্যাটারি এবং একটা ফীল্ড কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ারস। জেনারেল একটা মাইন বিস্ফোরণে গুরুতরো আহত হলে তাঁর জায়গায় আসলেন জেনারেল জি সি নাগরা। তিনি আরও শিগগির ঢাকা পৌছনোর জন্য আরও শক্তিবৃদ্ধির অনুরোধ করে উত্তরে রীতিমতো ধমক খেলেন। সাহসী অফিসার সুলতান আহমেদ -এর অধীনে পাকিস্তানিরা ভাল লড়াই দিল। জেনারেল নাগরা উত্তর দিক থকে ঢাকার দিকে দ্রুত অগ্রসর হলেন। টাঙ্গাইল এলাকায় প্যারাশুটে করে ভারতীয় সৈন্য নামতে দেখে পাকিস্তানি সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে ফেলল। টাঙ্গাইল এলাকা আগে থেকেই সিদ্দিকীর অধীনে মুক্ত এলাকা ছিল।

পূর্ব সেক্টর। এই সেক্টর ঢাকার সবচেয়ে কাছাকাছি। এর জন্য ছিলেন ৪ কোর -এর কমান্ড নিয়ে লেফটেন্যান্ট-জেনারেল সগত সিং যিনি জানতেন কখন সাহসের সাথে কাজ করতে হয়। এই কোর -এর জন্য বরাদ্দ ছিল এক বিগ্রেড কম তিনটি ডিভিশন (৫৭ মাউন্টেন ডিভিশন, ২৩ মাউন্টেন ডিভিশন এক ব্রিগেডকম ৮ মাউন্টেন ডিভিশন)।

কিলো সেক্টর বরাদ্দ করা হয়েছিল ৭টি ঈস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ব্যাটালিয়ন, আধা-সামরিক বাহিনীসমূহ ও মুক্তিবাহিনীকে। ৮ মাউন্টেন ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল কৃষ্ণ রাও-কে সিলেট সেক্টর শত্রুমুক্ত করার কাজ দেওয়া হয়েছিল। আগে তিনি ছয়টি পদাতিক ব্রিগেড নিয়ে নাগাল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। পরে বিস্তর অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি চীফ অব আর্মি স্টাফ -এর কাজ করেছেন।

এই সেক্টরে অনেক কিছু নতুন প্রবর্তন করা হয়েছিল। জেনারেল সগত ৪/৫ গুর্খা রাইফেলসকে হেলিকপ্টারে করে সিলেটের কাছে নামানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। নয়টা এমআই-৪ দেওয়া হয়েছিল দেড় ঘণ্টার মধ্যে এক কোম্পানি শক্তির বেশি লোক সেখানে জড়ো করতে। পরে দুটি মাউন্টেনগানও হেলিকপ্টারে করে সেখানে নেওয়া হল কিন্তু শত্রু আরও বেশি সৈন্য হেলিকপ্টারে নিয়ে অবতরণ করানো অসম্ভব করে তুলল। ১৬ ডিসেম্বর ভোরবেলায় সিলেট কৃষ্ণ রাও -এর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

ভৈরব বাজার সেক্টর। মেজর জেনারেল বি এফ গনযালভেস আখাউড়া দখলের পর তার সমান দুঃসাহসী কোর কমান্ডার সগত সিং -এর সাথে পরামর্শ ক্রমে কমান্ড সদর

দফতরের পাঠানো মূল পরিকল্পনা থেকে দিক পরিবর্তন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বদলে দাউদকান্দির দিকে গেলেন। এর ফলে মেঘনা নদী ও ঢাকার অধিকতর কাছাকাছি পৌঁছলেন। আর্টিলারি পিছনে ফেলে রেখে আসা হয়েছিল, তেমনি আরও অনেক আবশ্যক খুচরা জিনিশ যা দ্রুততায় তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারত না।

এর খুব শীঘ্র পরেই জেনারেল সগত সিং এই সিদ্ধান্তে আসলেন যে শত্রু সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে ফলে হেলিকপ্টারে করে মেঘনা পাড়ি দিয়ে ঢাকার দিকে কাছিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সামনে চলে আসছে। সগত ও গনযালভেস উভয়ই ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে বাগে এনে এবং তাকে কাটিয়ে গিয়ে মেঘনা পাড়ি দিয়ে দ্রুত ফল অর্জনের জন্য ঢাকা পৌঁছনোর ব্যাপারে একমত হলেন।

এখানেই স্থানীয় কমান্ডারদের উদ্যোগ ও সাহস বিজয়কে এত তাড়াতাড়ি আমাদের নাগালের মধ্যে এনে দিল। নরসিংদি এলাকা শত্রুর আর্টিলারি ফায়ারের নাগালের বাইরে ছিল এবং দ্রুত পাক আগমনের মতো কোনও সড়ক দ্বারাও যুক্ত ছিল না। এই নরসিংদিকে মেঘনা পারাপারে সেতুবন্ধ হিশাবে নির্বাচন করা হল। জেনারেল গনযালভেস একজন খ্যাতিমান বিমান পর্যবেক্ষণ পোস্ট অফিসার এবং একজন অভিজ্ঞ প্যারাট্রুপার ছিলেন। তিনি ৫৭ ডিভিশনের সৈন্যদের এই অগ্রযাত্রা কমান্ড করছিলেন। সাহসের জন্য পরিচিত গ্রুপ ক্যাপ্টেন চন্দন সিং এই আকাশ বাহিত অপারেশনে সহায়তা করলেন। এ একটা সফল অপারেশন হল এবং যুদ্ধের গতি ঘুরিয়ে দিল। আমার ঝোঁক এই বিশ্বাসে যে সগত গনযালভেস ও চন্দনের মতো অফিসারদের একত্র হওয়া পরিকল্পিত ছিল, ঘটনাচক্রে তা হয়নি।

চাঁদপুর সেক্টর। ২৩ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আর বি হিরা, এমভিসি এর ভার পেয়েছিলেন। কাজ ছিল কুমিল-া, লাকসাম ও চাঁদপুর বাধাহীন করা।

শক্তিশালী শত্রু অবস্থানসমূকে সামলে এবং পাশ কাটিয়ে আমাদের সৈন্যরা চাঁদপুর পৌঁছল; ৯ ডিসেম্বর শত্রু স্থানটা ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বর সকালে ময়নামতী ১৮১ ব্রিগেডের কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং ৪ কোর -এর সৈন্যরা আত্মসমর্পণের ঘোষণার পর ১৭ ডিসেম্বর কোনও লড়াই ছাড়া চট্টগ্রামে প্রবেশ করল।

চট্টগ্রাম। এই যুদ্ধে চট্টগ্রামের গুরুত্ব এত যে তা বাড়িয়ে বলার উপায় নেই। চট্টগ্রাম শুধু বাংলাদেশের সবচেয়ে দুরধিগম্য ভূমির প্রাণকেন্দ্র নয়, পাকিস্তানি ফোর্সের বলবৃদ্ধি আনয়নের প্রধান বন্দর, তাদের জীবন রক্ষার রশি। চট্টগ্রাম পাক সৈন্যদের পলায়নের একমাত্র স্থলপথ আরাকান রোডকে আগলাত ও নিয়ন্ত্রণ করত। এই আরাকান রোড কক্সবাজারের কাছে বার্মায় প্রবেশ করেছে। এটা একটা আদর্শ এলাকা যেখানে দ্রব্যসামগ্রীতে ভাল রকম মজুতসম্পন্ন পাক সৈন্য ও আধা-সামরিক বাহিনীসমূহ প্রায়

অনির্দিষ্ট কাল লড়ে যেতে পারত যদি তারা রুখে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিত; এমনকি মার্কিন সপ্তম নৌবহর তাদের তুলে নিতে পারত। এই নৌবহর আত্মসমর্পণের সময় চট্টগ্রাম থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে ছিল। এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ভার আস্থার সাথে সঁপে দেওয়া হয়েছিল মেজর জেনারেল এস এস উবানের কমান্ডের অধীনে পাহাড়ি মানুষদের মধ্য থেকে গ্রহণ করা স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স -এর গেরিলাদের হাতে। এই মেজর জেনারেল উবান পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁর সদর দফতর থেকে সমগ্র বাংলাদেশজুড়ে মুজিববাহিনীর কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতেন।

৪ কোর -এর প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল চট্টগ্রাম। জেনারেল উবান ফীল্ড মার্শাল মানেকশ'র কাছে আবেদন করেছিলেন চট্টগ্রাম দখলের কাজটা তাঁর অপ্রচলিত বাহিনীর ওপর ন্যস্ত করা হোক। তিনি মানেকশ'কে বিশ্বাস করাতে পারেননি যে প্রায় এক ব্যাটালিয়ান শক্তির এক গেরিলা দল মর্টার আর্টিলারি বা বিমান সমর্থন ছাড়া এবং নদী পার হওয়ার কোনও উপকরণ ছাড়া ঐ লক্ষ্যস্থলটি দখল করতে পারবে। উবান তখন মন্ত্রী ডিপি ধর-কে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করলেন। তিনি এমন একটা কঠিন কাজ একটা গেরিলা ফোর্স কর্তৃক গ্রহণের সম্ভাবনায় রোমাঞ্চিত হয়ে মানেকশ'কে বুঝিয়ে বলার অঙ্গীকার করলেন। পরে অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রামে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স -এর অসাধারণ সাফল্য এই ফোর্সের সম্ভাবনাকে পুনর্মূল্যায়ন করতে আর্মি চীফকে উদ্বুদ্ধ করল। তখন তিনি এই ফোর্সকে "পুবের আর্মি" বলে অভিহিত করে মূল্যবান পুরস্কার চট্টগ্রামকে তাদের লক্ষ্যস্থল হিশাবে দিতে সম্মত হলেন। কিসব কারণে তা করলেন, এই বই -এ তার বিবরণ আছে। ■

অধ্যায়–১৭
আমি ঢাকায় গেলাম

বাংলদেশ তখন মুক্ত। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তখন নিবেদিতপ্রাণ নেতা তাজুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রীত্বের অধীনে পূর্ণাঙ্গ সরকার হিশাবে ঢাকায় কাজ করতে শুরু করেছে। শেখ মনি প্রস্তাব করলেন আমার ঢাকায় যাওয়া উচিত মুজিববাহিনীর সেই শত শত ছেলের সঙ্গে দেখা করতে যারা আগে থেকে অনুপ্রবেশ করে বিপুল আত্মত্যাগের সাহায্যে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর মনোবল ভেঙে দিয়েছিল। সম্প্রতি নাটকীয় ঘটনাবলির মধ্যে দিয়ে একজন ভারতীয় মেজর বেগম মুজিবকে পাকিস্তানি হেফাজত থেকে মুক্ত করেছেন। শেখ মনি চাইলেন আমি সেই বেগম মুজিব -এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তিনি ঢাকায় গিয়ে রাজনৈতিক আবহাওয়া বুঝে দেখতে চাইলেন। ভুট্টো তখনও শেখ মুজিবকে মুক্ত করে দেননি এবং শেখ মনি নিশ্চিত ছিলেন না তিনি কখনও তা দেবেন কি না।

যাহোক, আমি যখন আমার হেলিকপ্টারে উঠছিলাম তখন দেখি মনি একটা কম বয়সি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমার আকাশযানের দিকে আসছেন। ছেলেটি এমন ভীষণভাবে খুড়িয়ে খুড়িয়ে আসছিল যে তাকে কোনও মতে খাড়া রাখার জন্য অন্য দুজন ছেলেকে দুদিক থেকে তাকে ধরে নিয়ে আসতে হচ্ছিল। আমি তাকে চিনলাম। সে আমাদের কাছে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিল, বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল, ধরা পড়েছিল এবং তাকে বৈদ্যুতিক শক দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছিল। তারা তার কাছে থেকে কোনও তথ্য বের করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তাকে এখন ঢাকার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যুবকটি আমার কাছে আসতেই দেখি তার মুখে প্রচুর হাসি, সে আমার পা ছোঁয়ার চেষ্টা করল– সকল বাঙালির মধ্যে সাধারণভাবে চালু জ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মানসূচক অভিবাদন। আমি তাকে আলিঙ্গন করে বললাম– "তুমি একটা বাঘ।" সে বলল– "স্যার, আপনার অধীনে প্রশিক্ষণের সময় আপনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।" আমরা ছেলেটাকে আমাদের সঙ্গে নিলাম এবং ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। সেখানে দেখা গেল হাজার হাজার মুজিববাহিনীর ছেলে ও তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, যারা আমার অপরিচিত, আমাকে মুক্ত ঢাকায় সংবর্ধিত করার উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। গোটা এয়ারফীল্ডটা মানুষে পরিপূর্ণ মনে হচ্ছিল। জনতা আমাকে ঘিরে ফেলল। অনেকে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। কেউ কেউ আমার সঙ্গে ফটো তুলিয়ে নিল। যখন আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল -এ পৌঁছলাম, আমি আবিষ্কার করলাম যে শ্রী ডিপি ধর, জেনারেল মানেকশ', শ্রী কাও এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি ইতিমধ্যে পৌঁছেছেন এবং হোটেলটিতে অবস্থান করছেন। আর্মি চীফ সকল ফীল্ড কমান্ডারকে একটা ভোজে

আপ্যায়িত করতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি একজন অপ্রচলিত সৈনিক হওয়ায় তাতে নিমন্ত্রিত ছিলাম না। পরে যখন তারা দেখলেন আমি পৌছেছি, লাঞ্চের জন্য আমাকে শেষ মুহূর্তের নিমন্ত্রণ দেওয়া হল এবং আনুষ্ঠানিক খানা টেবিলে আমার জন্য একটা আসন রাখা হল। আর্মি জেনারেলেরা যেমন সাধারণত হয়, আত্মগরিমায় আর তাঁরা প্রত্যেকে এই বিরাট বিজয়ে যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তার তৃপ্তিতে ভরপুর ছিলেন। তাঁদের এমন ভাব যেন কোনও কালে আমার কথা বা পার্বত্য চট্টগ্রামের যুদ্ধের কথা শোনেননি। সে সম্বন্ধে শুধু আর্মি চীফ ও জেনারেল অরোরা জানতেন আর কোর সদর দফতর জানত। আমি তাঁদের দোষ দিই না। সে এক অতুলনীয় বিজয় ছিল, তা অনেকগুলি মাথাই ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

আমি আর্মি চীফ -এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি শ্রী ডিপি ধর ও শ্রী কাও -এর সঙ্গে বসা ছিলেন। আর্মি চীফ ও শ্রী ধর আমাকে অজস্র অজস্র অভিনন্দন জানালেন। আমি যা কিছু অর্জন করেছি তার ব্যাপারে মুগ্ধতা প্রকাশের জন্য আমাকে আলিঙ্গন করার প্রবল ইচ্ছা সংবরণ করতে পারলেন না শ্রী কাও। এসএফএফ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্য সর্বোচ্চ কৃতিত্ব বয়ে এনেছে। তিনি বললেন–"আমি জানি এমনটা করা হয় না (মানে একজন ঊর্ধ্বতন সিভিলিয়ান একজন আর্মি জেনারেল-কে আলিঙ্গন করেন না) কিন্তু এভাবে আমার মুগ্ধতা প্রকাশ না করে আমি পারলাম না।" শ্রী ডি পি ধর এবং উপস্থিত সকলের কাছে ঢাকায় আমার অঘোষিত আগমনের জন্য ক্ষমা চাইলাম। শ্রী ধর আমাকে স্থানীয় ইংরেজি দৈনিকগুলি দেখালেন। সেগুলিতে আমার আপাদমস্তক ফটো ছাপা হয়েছে এবং ঢাকা বিমানবন্দরে আমার অভ্যর্থনায় যে বিপুল হৈ হৈ কাণ্ড হল তার কথা বলা হয়েছে। তিনি বললেন– "সারা দুনিয়া জানে যে শীর্ষ গেরিলা নেতা ঢাকায় হাজির। আমরা যখন এসেছি, কেউ আমাদের প্রতি সামান্যও লক্ষ করেনি। এমনকি আর্মি চীফও লাল গালিচা সংবর্ধনা পাননি যা আপনি পেয়েছেন। আপনি বাংলাদেশের বিপ-বী যুবাদের হৃদয় জয় করেছেন।"

আমি নীরবে এই প্রশস্তি শুনলাম। তারপর তিনি আমাকে একদিকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আমি আমার চার নেতা মনি, তোফায়েল, রাজ্জাক, সিরাজ -এর মধ্যে একজনকে নবগঠিত বাংলাদেশ মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে প্রবুদ্ধ করতে পারি কি না। আমি কথা দিলাম চেষ্টা করব।

চারজন নেতা সবাই শেখ মুজিবের বাসায় আমার সঙ্গে গেলেন। বাসাটা তখন একটা তীর্থস্থানে পরিণত। বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য বেগম মুজিবের (তাঁকে সবাই সস্নেহে ভাবি বলে ডাকতেন) কাছে সবাই আসতেন। আমি বেগম মুজিবের সঙ্গে এক কাপ চা খেলাম। শেখ মুজিবের সবচেয়ে ছোট ছেলে রাসেল -এর সঙ্গে আমার দেখা হল। শেখের দ্বিতীয় ছেলে জামাল কঠিন দিনগুলিতে আমার সঙ্গে থেকেছে এবং আমাদের

কাছে থেকে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পেয়েছে। সে তার মা -এর কাছে আমার ও আমার পরিবার সম্বন্ধে এত কথা বলেছে যে ওখানে আমার সঙ্গে পরিবারের একজন সদস্যের মতো ব্যবহার করা হল। সবচেয়ে বড় ছেলে কামাল কথা দিয়েছিল বাংলাদেশের মুক্তির পর রাঙামাটিতে আমার অবকাশ যাপনের ব্যবস্থা করবে। আমি এখন পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম সে রাঙামাটিতে অবকাশ যাপনে যেতে চায় কি না। উলে-খ্য রাঙামাটি তখনও আমার সদর দফতর। আমরা আনন্দপূর্ণ কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটালাম। কিন্তু পাক কাস্টডি থেকে শেখ মুজিব জীবিত ফিরবেন কি না সে ব্যাপারে তখনও অনিশ্চয়তা ছিল।

বেগম মুজিবের সঙ্গে পরামর্শক্রমে চার নেতা ঠিক করলেন মুজিব না ফেরা পর্যন্ত সরকারে যোগ দেবেন না এবং যদি তিনি না ফেরেন তাহলে পরে তাঁরা তাঁদের নতুন পন্থা ঠিক করবেন। যখন আমি এই নেতাদের সঙ্গে আমার আলাপের ফলাফল জানালাম, শ্রী ডিপি ধর দারুণ হতাশ হলেন।

নতুন বাংলাদেশ সরকার অননুমোদিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সকল অস্ত্র উদ্ধারের আদেশ দিল। কিন্তু সর্বপ্রথম যাদেরকে তাদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিতে বাধ্য করা হল তারা হচ্ছে মুজিববাহিনীর ছেলেরা। মনি এতে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন। তিনি আমার কাছে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অভিযোগ করলেন যে তাজউদ্দিন যে পলিসি নিয়েছেন তা, তাঁর মতে, ক্ষমতায় থাকার জন্য ও বামপন্থী বাহিনীসমূহ গড়ে তোলার জন্য। তিনি এমনকি আমাকে কিছু সশস্ত্র কম্যুনিস্ট যুবককে দেখালেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল -এর করিডোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের মাথায় কালো কাপড়ের ব্যান্ড বাঁধা।

অস্ত্র সংক্রান্ত এই প্রশ্নে শ্রী ধর এবং মনি'র মধ্যে অত্যন্ত কড়া বাক্য বিনিময়ের একজন সাক্ষী আমি হয়েছিলাম। মনি শ্রী ধরকে বলেছিলেন যে শেখ মুজিব ঢাকায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁরা কখনও অস্ত্র জমা দেবেন না এবং তেমন প্রয়োজন হলে এক গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে দেবেন। এই সময় মনি যে সাহস দেখিয়েছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। শ্রী ধর মুষড়ে পড়েছিলেন তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। মনি পরে আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর আগের এই মত নিশ্চিতি পেয়েছে যে শ্রী ধর তাঁর দেশের সবচেয়ে বড় শত্রু। পরে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কে এর প্রভাব পড়েছিল। এটা খুবই জানা কথা যে শেখ মুজিব ক্ষমতা নেওয়ার পর তাঁর সরকারের কাছে শ্রী ডিপি ধর একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হয়ে পড়েছিলেন। এক পর্যায়ে বাংলাদেশ তাঁকে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিশাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল। শ্রীমতি গান্ধী ব্যাপারটা মসৃণ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ তিনি বাংলাদেশের জন্য যা করেছিলেন তার জন্য শেখ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন।

সব মিলিয়ে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে ঢাকার আবহাওয়া আমার কাছে মেঘলা বলে মনে হল। সরকারকে মনে হচ্ছিল যেন তার প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব নেই বা সেই ছটা নেই

যা জনপ্রিয় জননেতারা প্রদর্শন করে থাকেন। আমি ভারী মনে রাঙামাটি ফিরে এলাম। আমরা যত আত্মত্যাগ করলাম তা সব কি মুজিবের অভাবে বৃথা যেতে বসেছে? এবং মুজিবের দেশে ও ক্ষমতায় ফেরার সম্ভাবনা কতটুকু?

আমি বান্দরবান রাজার (বোমং সর্দার -এর) দেওয়া এক সংবর্ধনায় শরিক হতে গেলাম। এই সেদিন পর্যন্ত তিনি আমাদের শত্রু ছিলেন এবং পাঠান ও মিযোদেরকে আতিথ্য দান করছিলেন। তিনি তাঁর ভাই সহ বিমান অবতরণ ক্ষেত্র পর্যন্ত আসলেন আমাকে নিয়ে যেতে। তিনি আমার জন্য উপহার হিশাবে একটা শাল নিয়ে এসেছিলেন। আমি সেটা সেখানেই একজন গরিব মানুষের হাতে ধরিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে চা দিলেন, এবং নতুন জাতির প্রতি আনুগত্যের নিশ্চয়তা অনেক করে প্রকাশ করলেন। আত্মসমর্পণের চিহ্ন হিশাবে কর্নেল পুরকায়স্থের মাধ্যমে তিনি তাঁর তলোয়ার আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি সেটা শেখ মুজিবের কাছে পাঠিয়ে দিলাম পাক কর্তৃপক্ষের প্রতি তাঁর অতীতের সমর্থনের ব্যাপারে রাজাকে ক্ষমাপ্রদর্শনের সুপারিশসহ।

আমি কক্সবাজারে উড়ে গেলা। খবর ছিল সেখানে কাছের পাহাড়গুলিতে প্রায় ৪শ' বর্মি ডাকাত এসেছে এবং বাংলাদেশ থেকে কিছু রাযাকার তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জানা গেল যে বর্মি ব্রিগেড তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে এই অবাঞ্ছনীয় লোকদের প্রবেশ ঠেকানোর জন্য। কক্সবাজারের আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদেরকে এ ব্যাপারে খুব অস্থির ও উদ্বিগ্ন মনে হল। আমি এই নতুন উৎপাতের ব্যাপারটা হাতে নিতে পারতাম কিন্তু আমাদের তখন প্রত্যাহৃত হয়ে ভারতে ফেরত যাওয়ার কথা।

কাপ্তাই -এ একটা সংবর্ধনায় আমাকে হাজির হতে হল। আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, জনাব সুলতান আহমদ এবং অন্যরা আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের সম্মানে কালেক্টরের আয়োজন করা একটা সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী দেখলাম আমরা। এসব হচ্ছিল ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে নববর্ষের আগের দিন। আমি ভারতে আমার সব বন্ধুকে নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ড পাঠালাম। সুন্দর কথা লেখা আছে বলে আমার মনে ধরেছিল এমন একটা কার্ড আমি প্রধানমন্ত্রীকে পাঠালাম।

পয়লা জানুয়ারিতে আমি অফিসারের আরও একটা তালিকা সাহসিকতার পদকের জন্য সুপারিশসহ পাঠিয়ে দিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা ছয়টা বীর চক্র পেলাম কর্নেল পি সি পুরকায়স্থ, মেজর আর কে মালহোত্রা, মেজর এস সি শর্মা, মেজর এস এস নেগি এসিসি, জি বি বলংকর এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামাসজি -এর জন্য। এঁরা অসম্ভব রকম ভাল করেছিলেন। পাঁচটি বিশিষ্ট সেবা মেডেল যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমাদের বিখ্যাত সার্জন মেজর পি সি মেহতা। বাংলাদেশের পীড়িত ভাই-বোনের প্রতি ভারতের সশস্ত্র বাহিনীগুলির সমবেদনার কথা জনমনে ছড়িয়ে দিতে তিনি অনেক কিছু করেছেন। একটি বিশিষ্ট সেবা মেডেল পেলেন কর্নেল কে এল

বসুদেব বিভিন্ন সীমান্ত বরাবর আর্মির সঙ্গে অসাধারণ সমন্বয় কাজের জন্য। এছাড়া পাঁচটা সেনা মেডেল এবং এগারোটা মেনশন ইন ডেসপ্যাচেস প্রদান করা হল। আমাকে দেওয়া পরম বিশিষ্ট সেবা মেডেল এবং ব্রিগেডিয়ার বি বি ভাটনাগর-কে দেওয়া অতি বিশিষ্ট সেবা মেডেল ধরে পুরস্কারের সংখ্যা দাঁড়াল মোট ২৯। চরম দুরূহ পরিস্থিতিতে বেতার যোগাযোগ চালু রাখার জন্য কমান্ডার অব সিগনালস মেজর এম এল দত্ত বিশিষ্ট সেবা মেডেল পাওয়ায় আমি খুশি হলাম। অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি কমান্ডার টি এস বাওয়া পদক থেকে বাদ পড়াতে আমি দুঃখিত হলাম। তাঁর জন্য সুপারিশ দেরিতে দেওয়া হয়েছিল এবং আমার মনে হয় পদকের জন্য আমাদের কোটা শেষ হয়ে যাওয়াতে তিনি বাদ পড়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে লড়াই করেছিলেন কিন্তু তাঁর সাহসিক কাজগুলো নজরে এসেছিল দেরি করে।

আমি আমার সিভিলিয়ান ব্যক্তিগত সহকারী শ্রী এস ডি ক্যান্ড্রলি-'র কথা উলে-খ করা থেকে বিরত থাকতে পারি না। তিনি সবসময় কর্তব্যের চাহিদা থেকে বেশি পরিমাণে ও বেশি সময় কাজ করেছেন। অত্যন্ত পারদর্শী সাঁটলিপিকারদের মধ্যেও তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন। চরম দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে তিনি সাহস দেখিয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ কাজের জন্য তাঁর নামে একটা বিশিষ্ট সেবা মেডেল যোগ করে তাঁর জন্য আমার স্বীকৃতি স্পষ্টভাবে দেখাতে পারতাম। এই বই -এ তাঁর উলে-খ করে তাঁর জন্য আমি সবচেয়ে কম যা করতে পারতাম তাই করেছি।

এসএফএফ -এর ভারতে ফিরে যাওয়ার বিশদ ছক কলকাতার কমান্ড সদর দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা আবশ্যক ছিল। ২ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে আমি কোলকাতায় উড়ে চলে গেলাম। সাক্ষাৎ করলাম পুরনো বন্ধু জ্যাকবের সঙ্গে, যিনি জেনারেল অরোরার সমর্থ চীফ অব স্টাফ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কিছু তথ্য বিনিময়ের পর আমাদের ফিরে আসাটা বিশদভাবে নির্ধারণ করে ফেললাম।

আমি জানতে পারলাম আমার আধ্যাত্মিক গুরু বাবা ওংকারনাথ (বিখ্যাত বাঙালি সাধু) কোলকাতায় আছেন। সদ্যই তাঁর একটা চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলাম। সঙ্গে নিলাম শেখ মনি (মুজিবের ভাগ্নে) -কে। বাবার চোখে ব্যান্ডেজ, তিনি শুয়ে ছিলেন, কিন্তু আমার আসার কথা শুনে তিনি পুলকিত হলেন। আমাকে তাঁর প্রথম প্রশ্ন ছিল বিজয়ের পরে বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে। আমি বললাম– "সব কিছু খান খান হয়ে যাচ্ছে মুজিব না থাকায়। উনি এখনও পাকিস্তানে বন্দি হয়ে আছেন।" তারপর আমি তাঁর কাছে মনির পরিচয় দিলাম।

বাবা দু'হাত জোড় করলেন এবং বললেন–"মাগো (দেবীকে সম্বোধন করে), মুজিব বাংলাদেশের আত্মা। ঐ দেশটার জন্য যখন এত কিছু করলে, দয়া করে মুজিবকে এখনি মুক্ত করিয়ে দাও।" তারপর মনির দিকে ফিরে বাবা বললেন–"চিন্তা কোরো না।

মুজিব আসবে এবং সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।" এই আশীর্বাদের সঙ্গে উপহার হিশাবে বাবা মনিকে একটা শাল দিলেন। মনি অভিভূত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখে জল দেখা দিল। আমি এখন নিশ্চিত হলাম যে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

ঠিক ঐ দিনই অপরাহ্নে আমরা রেডিও শুনছিলাম, আমরা শুনলাম যে ভুট্টো প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছেন তিনি মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে যাচ্ছেন। এমন সব অবস্থায় এমনকি নাস্তিকরাও ঈশ্বর বিশ্বাসে ফিরে আসে। মনি সকালে বাবার দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণী এবং একই দিনে তার সত্যে পরিণত হওয়া নিয়ে কথা তুললেন। তিনি পরদিন সকালে আমাদের ঢাকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কিছু ফল ও ফুল নিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বাবার সঙ্গে আবার দেখা করার ও তাঁর আশীর্বাদ নেওয়ার সৌভাগ্য আমাদের হল।

৫ জানুয়ারি ১৯৭২ আমি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন ও রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার সঙ্গে নিজের ফটো তোলার ব্যাপারে ব্যগ্র হলেন কোলকাতায় আমাদের পুরনো যোগাযোগের কারণে, কিন্তু ফটোগ্রাফার আসতে লম্বা সময় নেওয়ায় তা আর হল না, আমাকে রাঙামাটি ফেরার জন্য উড়ে যেতে হল আমাদের ফেরত যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে। আমরা ডোগরা রেজিমেন্টের লেফটেন্যান্ট-কর্নেল চোপরার কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করলাম। উত্তর ও দক্ষিণ কলাম গুটিয়ে ফেলে তাদেরকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হল বিশ্ব বিজয় নামক জাহাজে চড়ার জন্য। এই জাহাজেই আমার সকল সৈন্যের কোলকাতায় যাওয়ার কথা।

আমি জানতে পারলাম শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি ও নতুন জাতির জনক হওয়ার জন্য ঢাকার পথে রয়েছেন। দিলি-তে তিনি গৃহীত হলেন শ্রীমতী গান্ধীর দ্বারা। তিনি নিজে তাঁর সম্মানে স্লোগান তুললেন এবং তাঁর হৃদয় অধিকার করে সারাজীবনে তাঁর যত বন্ধু ছিলেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধু হলেন।

চট্টগ্রামের চা সমিতির সেক্রেটারি কর্নেল জে এ হিউম যুদ্ধের কঠিন দিনগুলিতে তাঁর রাজকন্যা স্ত্রীকে যত সাহায্য দিয়েছিলাম তার জন্য ধন্যবাদ জানাতে এলেন। রাজমাতা আমার সঙ্গে সাক্ষাতে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তখন পর্যন্ত কাস্টডিতে থাকা তাঁর পুত্রদের ব্যাপারে শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি না। আমি প্রয়োজনীয় সব কিছু করার কথা দিলাম এবং আমি তা করেছিলাম।

শেখের সঙ্গে সাক্ষাৎ

বহু-প্রতীক্ষিত দিনটি এল। আমি ঢাকাতে। শেখের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দিনক্ষণ স্থির হয়েছে আমার বন্ধু যুবনেতাদের মাধ্যমে। আমি তাঁর বাসায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে

আমাকে তাঁর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি উঠে দাঁড়ালেন, আমাকে আলিঙ্গন করতে করতে বলতে লাগলেন–"আপনি আমার ভাই, আমার সত্যিকারের ভাই। আপনি আমার জাতি, আমার বন্ধুগণ ও আমার পরিবারের জন্য যা করেছেন তা আমি কখনও ভুলতে পারব না। আমার সঙ্গে কখনও ফর্মাল হবেন না। এ বাসাটা আপনার নিজের বলে মনে করবেন।

"আমি জানি আমাদের সাহায্য করার জন্য বহুবার আপনি আপনার জীবনবাজি রেখেছেন। আমি কোনও দিন তা ভুলব না...।" এইভাবে তিনি চালিয়ে গেলেন।

শত শত মানুষ তাঁর বাসার চারপাশে জড়ো হচ্ছিল শুধু তাঁকে একটু দেখে কৃতার্থ বোধ করতে। তাঁর একটা ক্যারিশমেটিক ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি আবেগপ্রবণ ছিলেন, সহজেই আত্মহারা হতেন। ভাল করে না ভেবেই মুহূর্তের উদ্দীপনায় তিনি সিদ্ধান্ত দিতেন এবং ইতিমধ্যে তিনি একজন স্বৈরাচারীর মতো আচরণ শুরু করেছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ করার মতো তিনি একাই ছিলেন। তাঁর ঢাকায় প্রত্যাবর্তনে প্রচুর আনন্দ উল-াস হয়েছিল। লাখ লাখ মানুষ বিমানবন্দরে এসেছিল তাঁকে স্বাগত জানাতে, তারপর তারা ঢাকায় থেকেও গিয়েছিল মুজিবের অধীনে স্বাধীনতা উপভোগ করতে। আশা ঊর্ধ্বপানে ধেয়ে যাচ্ছিল, সাধারণ মানুষ বোধ করছিল যেন-বা জাদুর কাঠির সাহায্যে অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সমাধান হয়ে যাবে। সারা দুনিয়ার গরিব মানুষই এরকম। আস্থা পোষণ, ভক্তি করা, সৎভাবে শ্রম দিয়ে যাওয়া আর সব সময় আরও ভাল দিনের আশা পোষণ করা, যা কখনও আসে না। বাঙালির আরেকটা বাড়তি গুণ আছে– ধৈর্যের সম্পূর্ণ অভাব এবং উচ্চমাত্রায় উত্তেজিত হওয়ার মতো মেজাজ।

এই যুদ্ধ বাংলাদেশকে ব্যাপক ধ্বংসের মধ্যে ফেলে রেখে গিয়েছিল। তার সকল শিল্প, যোগযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সম্পদ বিনষ্ট হয়েছিল। বিশ্বের সর্বোত্তম শুভেচ্ছাও যদি মেলে তবু বাংলাদেশের অর্থনীতির টলমলে অবস্থা ঠিক করে তুলতে এক দশক সময় লেগে যাওয়ার কথা ছিল।

এমনতরো পরিস্থিতির মধ্যে যদি একজন লোক ক্ষমতায় বসে এমন একটা দেশে যার জনগণ হচ্ছে বাঙালি জনগোষ্ঠীর মতো সহজে জ্বলে ওঠা বস্তু, তাহলে সেই লোকটির জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

সাদর অভ্যর্থনায় উৎফুল- মন নিয়ে আমি মুজিবের বাসা থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং ভাবলাম ঈশ্বর এমন করলেন যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে আমার মিশনের সুখকর সমাপ্তি দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হল।

আমি একটা বড় পে-ন (এএন ১২) -এ বোঝাই করে দখল করা অস্ত্রশস্ত্র-গোলাগুলি আর্মি কর্তৃপক্ষসমূহের কাছে জমা দেওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

ভারতে ফেরার জন্য ঢাকা ত্যাগের আগে আমার বন্ধু যুবনেতারা আমাকে শুভ বিদায় জানাতে আসলেন। আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বন্ধুত্ব ছিল অনাগত সকল সময়ের জন্য এবং আমাদের সাধারণ সাফল্য সেই বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। ঐ দেশটার মাটির জন্য আমার গভীর ভালবাসা এবং যে সাহসী পুরুষ ও মহিলাদের নিয়ে ঐ জাতিটা গঠিত তাদের জন্য গভীর সশ্রদ্ধভাব গড়ে উঠেছিল।

আমার পে-ন যখন পালামে অবতরণ করল, আমি লক্ষ করলাম ফুলের অনেক তোড়া নিয়ে মানুষ সমবেত হয়েছে, বুঝতে পারলাম না কাকে অভ্যর্থনা দিতে তারা এসেছে। যথাসময়ে দেখা গেল তারা আমার স্টাফ যারা আমাকে আগে একটা চমৎকার অভিনন্দন জ্ঞাপক সংকেত বার্তা পাঠিয়েছিল এবং এখন বিমানবন্দরে আমাকে অভ্যর্থনা দিতে এসেছে। আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমি আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমার বাসার দিকে ছুটলাম। তারা আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্বেগের সাথে অপেক্ষা করছিল। এ ছিল আমার সুখী পুনর্মিলন। আমার সাহসী যুবক ইঞ্জিনিয়ার ছেলে জগদীপ সিং উবান, পরে ভারতীয় বিমানবাহিনীর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, আমাকে দেখে পরম আনন্দিত হল। আমার অর্জনসমূহের জন্য তাকে গর্বিত বলে মনে হল। হায়! সে কর্তব্যরত অবস্থায় একটা বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করল এমন হঠাৎ করে এবং এত অল্প বয়সে যে, সে আমাদের জীবনে একটা গভীর অপূরণীয় শূন্যতা সৃষ্টি করে গেল। সে তার স্কোয়াড্রনে তার প্যারাশুট ঝাঁপগুলি সম্পন্ন করে যে প্যারা উইং অর্জন করেছিল তা গর্বের সাথে আমাকে দেখিয়েছিল। সে আমাদের যোদ্ধাঐতিহ্য সমৃদ্ধ করেছিল এবং তার মধুর স্মৃতির অম্-ান সুরভি আমাদের জন্য রেখে গিয়েছিল। ঈশ্বর তার আত্মাকে আশিসধন্য করুন। সে আমার ব্যাপারে আরও বেশি গর্ব অনুভব করেছিল যখন সে আমাকে লেখা এয়ার চীফ মার্শাল পি সি লাল ডিএফসি -এর চিঠিটি দেখেছিল। সেই চিঠিতে অনেক কিছুর সঙ্গে এই কথাগুলি বলা হয়েছিল:

আমার প্রিয় উবান

তোমার কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ কখনও ছাপা নাও হতে পারে কিন্তু আমি জানি পূর্বাঞ্চলে দ্রুত বিজয় আনয়নে তোমার ফোর্স একটা মস্ত ভূমিকা পালন করেছে...। ■

অধ্যায়–১৮

শেখ মুজিব আমাকে ডেকে পাঠালেন

একদিন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব শ্রী পি এন হাকসার আমাকে একটা বার্তা পাঠিয়ে জানালেন যে শেখ মুজিবর রহমানের অনুরোধে শেখের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিশাবে আমার ঢাকা যাওয়াতে প্রধানমন্ত্রী সম্মত হয়েছেন এবং আমাকে অবিলম্বে যেতে হবে।

ঐ সময় যিনি সারা বিশ্বে সবচেয়ে বড় খবর সৃষ্টি করেছেন সেই শেখ মুজিব তাঁর উপদেষ্টা হিশাবে আমাকে চেয়ে পাঠিয়েছেন এটা আমার পক্ষে বিরাট সম্মানের ব্যাপার ছিল। ঢাকায় পৌঁছতেই দেখি শেখের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব সামাদ বিমানবন্দরে আমাকে নিতে এসেছেন। শহরে যাওয়ার আগে তিনি আমাকে বিমানবন্দরে এক কাপ চা খাওয়ানোর জন্য বেশ জোর করলেন।

শেখ সাহেব আমাকে খুব ভালভাবে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি বললেন আমি যেন তাঁর সরকারি বাসভবনে থাকি। আমি ভদ্রভাবে সেটা অস্বীকার করলাম। তাঁর নিজের বাসায় খালি ঘর ছিল না। নইলে আমার সন্দেহ নেই তিনি চাইতেন আমি গোটা পরিবারটার সঙ্গে থাকি কারণ আমার সঙ্গে তাদের সবার খুব ভাল জানাশোনা হয়ে গিয়েছিল।

এই বারে আমি লক্ষ করলাম তাঁর বাসায় কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। সব রকমের মানুষ সময়-অসময় নেই যখন তখন এসে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার চাইত। তাঁর সাথে দেখা করতে আসা লোকেদের কোনও বাছবিচার নেই এ কথা তুলতেই তিনি বললেন– "আমি জাতির জনক। দিন বা রাতের যে কোনও সময়ে আমার কাছে আসার অধিকার প্রত্যেকের আছে। কেউ যদি কষ্টে থাকে, তার সামনে তো আমি আমার দরজা বন্ধ করে দিতে পারি না।" আমি তাঁকে বললাম আমি তাঁর এই অনুভূতিতে মুগ্ধ হচ্ছি কিন্তু তিনি নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাঁর জাতির প্রতি দায়বদ্ধ। জনাব তোফায়েলও, যিনি তখন শেখের রাজনৈতিক সচিব, এ ব্যাপারটায় হতাশ বোধ করতেন। আমার মনে হয় জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতারা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, কিন্তু মুজিব যতদূর পর্যন্ত গিয়েছিলেন ততদূর খুব কম সংখ্যকই গিয়েছেন।

আমাকে বিখ্যাত শিল্পপতি আদমজির বাসায় রাখা হল। আমাকে নিরামিষ খাবার দেওয়ার জন্য ভাল বন্দোবস্ত করা হল।

মুজিব ঐ সময় তিনটি ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। একটা হল, কতকগুলি মহল তখনও অস্ত্র সমর্পণ করেনি, তারা সুযোগ পেলে সেগুলি সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারত। বাংলাদেশের যুদ্ধের সময় তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের কতকে লুকানো অস্ত্রের

অনেক গুপ্ত ভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল। তিনি সে ব্যাপারে সচেতন ছিলেন।

দ্বিতীয়টা হল আমাদের সাধারণ সীমান্তের বিভিন্ন অংশ দিয়ে উভয় দিকে চোরাচালানের প্রশ্ন। এই চোরাচালান তাঁর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতে পারত।

তৃতীয়টা ছিল তাঁর দেশের প্রকৃত যুব ক্যাডারদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন। তাঁরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ভালভাবে প্রশিক্ষিত ও অস্ত্রসজ্জিত হয়েছিল এবং এখন তারা সবাই বেকার ছিল। এত বিরাট সংখ্যায় তাদেরকে আত্তীকরণ করার সাধ্য তাঁর ছোট্ট আর্মির ছিল না। তাদেরকে সবচেয়ে ভাল কিভাবে কাজে লাগানো যায় সেটুকু তিনি জানতেন না।

শেখ মনে মনে একটা ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন– একটা বাহিনী যা মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর সকল দেশপ্রেমিক যুবাদের ধারণ করতে পারবে এবং আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে, বিধ্বংস অর্থনীতির পুনর্গঠনেও সাহায্য করতে পারবে। তিনি চাচ্ছিলেন এ বাহিনী অস্ত্রের সকল গুপ্ত ভাণ্ডার খুঁজে বের করবে এবং যেসব লোক দেশের পলিসিসমূহের বিরুদ্ধে কাজ করছে তাদের বের করে কৈফিয়ত আদায় করবে। তিনি আশা করছিলেন তাদেরকে ভারত-বাংলাদেশের বিশাল সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী তৎপরতার জন্য কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষিতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে।

ঠিক এই মূল ভাবনা নিয়ে আমি বিস্তর মাথা ঘামিয়েছিলাম যখন এই ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ চলছিল এবং তাদের মনে এটা গেঁথে দেওয়া হচ্ছিল যে তাদের দেশের মুক্তি অর্জনের পর সকল দেশপ্রেমিক তরুণদের দেশের পুনর্গঠনে কাজ করাটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক ব্যাপার। কথাটা তরুণদের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করেছিল এবং সিরাজের মতো নেতারা তাতে বিপুল গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে এটা নিশ্চয়ই শেখের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং শেখের প্রত্যয় হয়েছিল যে এমন প্রকৃতির একটা বাহিনী বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা আনার ব্যাপারে বিপুলভাবে সাহায্য করবে।

তিনি আমার সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করলেন এবং আমাকে একমত দেখে এই বাহিনী গড়ে তোলার আদেশ দিলেন। তিনি বাহিনীর নাম দিলেন জাতীয় রক্ষী বাহিনী (জেআরবি) এবং আদেশ দিলেন শুরুতে এতে ১২ হাজার অফিসার ও জওয়ান থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য একে তিনি নিজ কমান্ডের অধীনে রাখলেন এবং ঢাকাকে এর গ্যারিসন করলেন। এক চূড়ান্ত রকমের দক্ষ অফিসার কর্নেল নূরুজ্জামানকে এই বাহিনী কমান্ড করার জন্য বাছাই করলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন এ বাহিনীকে সংগঠিত, প্রশিক্ষিত ও সজ্জিত করতে সাহায্য করার জন্য আমি যেন যথাসাধ্য চেষ্টা করি।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এরকম একটা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও সজ্জিত করার ব্যাপারে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে রাজি করতে আমার কিছুটা সময় লেগেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার সরকার বাংলাদেশ সরকারের এই অনুরোধ মেনে নিল এবং এই বাহিনীর লীডাররা আমাদের স্থাপনায় প্রশিক্ষণ লাভ করল।

এই জাতির স্বাধীনতার পরে গঠনমূলক সময়কালে এই বাহিনীটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, জনগণের সেবা করেছিল, তাদের আস্থা অর্জন করেছিল। খবরের কাগজের রিপোর্টে তাদের অটল সততা ও ন্যায়পরায়ণতা ছাড়া আর কিছু থাকত না। এমন একটা সন্ধিক্ষণে তাঁর এই পদক্ষেপের জন্য এমনকি শেখের সবচেয়ে গুরুতরো শত্রুও কখনও তাঁর কোনও বিরূপ সমালোচনা করেনি।

এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে জাতির স্বার্থে শেখের এমনকি সবচেয়ে গভীরভাবে উপকারী পদক্ষেপগুলিও তাঁর হত্যাকাণ্ডের পর সন্দেহের চোখে দেখা হল। বাংলাদেশের বিরাট দুর্ভাগ্য যে জাতীয় রক্ষী বাহিনী (জেআরবি) এই রকম পরিণতি ভোগ করল। বাঙালিদেরকে যে-ই জানে সে-ই সাক্ষ্য দেবে তাদের স্বাধীনতা-প্রিয় ও ভয়হীন চরিত্রের। তাদের দেশপ্রেমিক মন ও জাতীয় বোধ বহুলবিদিত। কোনও নতুন সেট আপ -এও জাতীয় রক্ষী বাহিনী একই রকম উপকারী ভূমিকায় কাজ করত কারণ তাদের আনুগত্য ছিল মূলত জাতির প্রতি, শান্তি ও উন্নয়নের প্রতি, যার জন্য তারা এমনকি তাদের জীবনও উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল।

শ্রীমতী গান্ধীর ঢাকা সফর

মুক্তির খুব অল্প পরেই যখন শ্রীমতী গান্ধী ঢাকা সফর করছিলেন, তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে শেখ মুজিবকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হল। আইন-শৃঙ্খলা তখন পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সব রকমের লোকের হাতে আধুনিক মারণাস্ত্র। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সাথে সংস্রবের কারণে পুলিশের মর্যাদাহীন অবস্থা। আর্মি কিছুটা অসংগঠিত। তিনি এই বিষয়টা আমার কাছে পাড়তে ইতস্তত করছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে মঞ্চে তাঁর উপস্থিতিই শ্রীমতী গান্ধীর মতো একজন গুরুত্বপূর্ণ সফরকারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়কারক নয়। তিনি বললেন—"আপনি কেন এই অংশের দায়িত্ব নেন না? যত সংখ্যক লোক চান আমি দেব; তার মধ্যে জাতীয় রক্ষী বাহিনী থেকেও লোক থাকবে, তারা আপনাকে খুব সম্ভ্রমের চোখে দেখে।" আমি বললাম—"বিদেশে বসে আমি এ ধরনের একটা কাজের জন্য সবচেয়ে কম উপযুক্ত ব্যক্তি।" তিনি বললেন—"আমি চাই না ঢাকায় এমন কোনও ঘটনা ঘটুক যা ভবিষ্যতে আমাদের সম্পর্ককে মেঘাচ্ছন্ন করবে। যা-ই হোক আমি অবশ্যই তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন

ব্যবস্থা গ্রহণ করব। আর তাঁকে স্বাগত জানাতে ও তাঁর কথা শুনতে আসা সমবেত জনতার মধ্যে জাতীয় রক্ষী বাহিনীর কিছু দেশপ্রেমিককে ছড়িয়ে দেব।" আমি বললাম– এটা খুব ভাল হবে।

এর কয়েকদিন বাদে আমার এমন এক ব্যাপার দর্শন করার সৌভাগ্য হল যা কারও পক্ষে কখনও ভোলা সম্ভব নয়। এই উপলক্ষে একটা ময়দানের মধ্যখানে নৌকার আকারের এক উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করা হয়েছিল। দুজনের মঞ্চ আরোহণে লক্ষ লক্ষ মানুষ তুমুল করতালি ও কণ্ঠ ধ্বনিতে ফেটে পড়ল। এশিয়ার দুজন সবচেয়ে ক্যারিশম্যাটিক জননায়ক, দুজনই নিজ নিজ জাতির অতি প্রিয় কিন্তু আজকের ঘটনায় দুজন একযোগে উপস্থিত হয়েছেন দক্ষিণ এশিয়ায় এক নতুন প্রপঞ্চের দুটি দুর্দান্ত স্তম্ভ হয়ে। যে জয়ধ্বনি উঠল তা হৃদয়কে উষ্ণ করে তোলে। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ চিৎকার তুলল– "জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় ইন্দিরা গান্ধী।" মানুষ আনন্দে পাগল হয়ে গেল যখন শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বক্তৃতার শুরুতে কতগুলি বাক্য বললেন বাংলায় যা তিনি রবি ঠাকুরের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখেছিলেন। এটা জনতাকে দেখিয়ে দিল ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের আত্মীয়তা। কোনও পাকিস্তানি কখনও তাদের প্রতি এভাবে কথা বলেনি, তাদের নিজেদের ভাষায়, যে ভাষার ব্যাপারে তারা এত গর্বিত ছিল। আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা ও অন্যরা শ্রোতৃমণ্ডলীকে ভালভাবে সামলেছিল। নিরাপত্তা কর্মীরা বিভিন্ন স্থান থেকে সাতজনকে ধরতে সক্ষম হল যারা পকেটে গ্রেনেড বহন করছিল এবং যাদের ধরনধারণ ছিল অস্বাভাবিক।

খানিক পরে শ্রীমতী গান্ধী ও শেখ একটা ঘিরে রাখা স্থানে গেলেন। সেখানে আওয়ামী লীগ নেতারা তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। শেখ শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এই নেতাদের পরিচয় করিয়ে দিতে শুরু করেই লক্ষ করলেন আমাকে কাছাকাছি দাঁড়ানো অবস্থায়। আমাকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন এবং আমাকে হাত দিয়ে ধরে শ্রীমতী গান্ধীকে আমার পরিচয় দিলেন এই বলে– "এই হচ্ছে আপনার জেনারেল উবান।"

আমি দুই হাত একত্র করে নমস্তে বললাম। এর আগে কখনও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। উত্তরে তিনি একটু মৃদু হাসলেন। তারপর তাঁর স্বাভাবিক মধুর ভঙ্গিতে হেঁটে এগিয়ে গেলেন। ভারতের জন্য তার আন্তরিকতম সম্মানবোধ প্রদর্শন করার জন্য কোনও কিছু করতে বাংলাদেশ বাকি রাখেনি। তখন দেখাচ্ছিল যেন অভিমানে বড় ভাই ভারত থেকে ১৯৪৭ সনে আলাদা হয়ে যাওয়া দু'ভাই -এর এক ভাই (বাংলাদেশ) ঘরে ফিরেছে; এখন সে বড় হয়েছে, নিজের ইচ্ছায় চলে, স্বাধীন, কিন্তু পুরনো পারিবারিক বন্ধনের ব্যাপারে ব্যথাতুর এবং সহমর্মিতা ও ভালবাসায় ভরপুর।

এর পরে খুব শ্রীঘ্রই শেখ মুজিব বললেন বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় আর্মি প্রত্যাহার করা হোক। ভারত সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার শুরু করল। আমি মনে করি ভারতীয় আর্মির এই প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত খুব বিজ্ঞের মতো কাজ হয়েছিল। আরও দীর্ঘ সময় ধরে থাকলে বাংলাদেশের ভিতরে-বাইরে এই ধারণার সৃষ্টি হত যে তারা একটা দখলদার আর্মি। শান্তির সময় আর্মি একটা আপদ ছাড়া আর তো কিছু নয়। তার এই ঝটপট প্রত্যাহার সারা বিশ্বের সব মানুষ আমাদের অনাগ্রাসী ও শান্তিপ্রিয় চরিত্রের প্রমাণ হিশাবে স্বাগত জানাল।

আর্মি চলে যাওয়ার পর আমি দেখলাম আমিই সরকারি মহলে চলাফেরা করা একমাত্র শিখ। অনেক লোকই আমাকে একজন ভারতীয় জেনারেল বলে জানত। যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হওয়া উচ্চমাত্রায় আবেগপ্রবণ এই জাতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় কামনা।

বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার কাজটা করে আমি আমার দেশের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছিলাম। ভারতীয় আর্মির অন্য কোনও জেনারেলকে না চেয়ে শেখ মুজিব আমাকে চেয়েছিলেন কারণ আমার ন্যায়পরায়ণতা ও আন্তরিকতায় তাঁর প্রচুর আস্থা, যেমন আস্থা ছিল সামরিক ব্যাপারে অপ্রচলিত ধারায় আমার বিশেষজ্ঞতার ওপর।

আমার সিভিলিয়ান উর্ধ্বতনরা আমার ওপর যে বিপুল পরিমাণ বিশ্বাস পোষণ করতেন সে সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। বিদেশ মন্ত্রক বা আমার নিজের সচিব আমাকে কিছু বলে দেননি, ফলে শেখ মুজিবর রহমানের উপদেষ্টা হিশাবে আমার ভূমিকার ব্যাপারে আমার কাঁধে অত্যন্ত ভারী দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয়েছিল। শেখের উপদেষ্টা হিশাবে আমার কাজ চালিয়ে যেতে আমি নিম্নলিখিত দিকনির্দেশগুলি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছিলাম।

ক) ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নিটোল পারস্পরিক বোঝাপড়া অর্জন যাতে আমরা পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কসমূহ গড়ে তুলতে পারি। মূলত এ কাজটা ছিল ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার -এর যিনি একজন সর্বোচ্চ পারদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর অতিরিক্ত সুবিধা ছিল শুধু এই নয় যে তিনি বাংলা ভাষা জানতেন বরং উপরন্তু তাঁর জন্মস্থানও ছিল বাংলাদেশে। আমি এ প্রক্রিয়ায় কেবল সাহায্যই করতে পারতাম, আমার নিজ সামরিক ক্ষেত্রে বা অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রেই শেখ আমার উপদেশ পেতে চাইতেন।

খ) আমাকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্বার্থসমূহ অগ্রসর করার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে ঐক্য আনয়নের চেষ্টা করতে হবে কারণ সাম্প্রতিক যুদ্ধে আনুগত্যসমূহ প্রচণ্ড রকম ধাক্কা খেয়েছে। ভারতের প্রতি

তাদের শুভেচ্ছা অর্জন করতে হবে। কেবল বাংলাদেশের এবং তার নির্বাচিত নেতাদের প্রতি অনুগত নিরেট ঐক্যসম্পন্ন একটি আর্মিই স্থিতিশীলতা আনতে পারবে।

গ) মাফ করো ও ভুলে যাও নীতির অধিবক্তা হওয়া। পাকিস্তান এমন এক পরাজয় ভোগ করেছে যার থেকে সম্ভবত সে কমপক্ষে বিশ বছরের মধ্যে ওঠে আসতে পারবে না। আর সে যা-ই হোক পাকিস্তান আবার কখনও সেই আগের পাকিস্তান হবে না। পাকিস্তানের প্রতি বাংলাদেশের প্রতিকূল ভাব চলতে থাকলে তাতে অসংখ্য সমস্যার সৃষ্টি হবে। আমার আশা, বাংলাদেশ একদিন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের শান্তি প্রচেষ্টায়ও অগ্রগামী ভূমিকা পালন করবে এবং বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এই তিনটি দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পারস্পরিক বোঝাপড়া নিয়ে আসবে যা তিনটি রাষ্ট্রকেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে আমাদের চারদিকে যে নতুন হুমকি ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে তাকে মোকাবেলায় সমর্থ করে তুলবে।

বাংলাদেশের বিহারিগণ এবং জনাব ভুট্টো, এই দুটি নাম শেখ মুজিব সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন। তারা তাঁর জাতির অনেক ক্ষতি সাধন করেছিল, তিনি প্রতিশোধ নিতে এবং তাদেরকে একটা শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। আমি শেখের কাছে বিহারিদের প্রতি মানবিক আচরণ করার আবেদন জানালাম। তিনি তাই করলেন কিন্তু ভুট্টোকে তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রু হিশাবে বিবেচনা করার ব্যাপারে অনমনীয় রইলেন। আমি তাঁকে বোঝাতেই লাগলাম যে ভুট্টোর সাথে একটা সংলাপ শুরু করা বাঞ্ছনীয়, তাতে করে এমন কিছু সমস্যা যা দুটি দেশের জন্যই উপদ্রব স্বরূপ এবং তার প্রভাব গোটা দক্ষিণ এশিয়াতেই পড়ছে সেসবের একটা সমাধান হয়ে যেতে পারে। তিনি আমার কথা শুনতেন কিন্তু কখনও হ্যাঁ সূচক উত্তর দিতেন না। অতঃপর একদিন হঠাৎ আমি একটা ফোন পেলাম লাহোর থেকে। লাইনে ছিলেন শেখ মুজিব। তিনি জিজ্ঞেস করলেন–"আপনি কি জানেন আমি আজকে কী করেছি?" আমি বললাম–"আপনি বলুন তো আপনি এখন কিসের ধান্ধায় আছেন।" তিনি যা বললেন তা শুনে আমি থ' হয়ে গেলাম। তিনি বললেন–"একটা প্রকাশ্য মঞ্চের ওপর আমি জনাব ভুট্টোর সঙ্গে কোলাকুলি করেছি। আমি জানি আপনি এটা পছন্দ করবেন তাই আপনাকেই প্রথমে জানাচ্ছি।" এতে আমার চোখে পানি এসে গেল। আমি তাঁর দূরদর্শিতা ও রাষ্ট্রনায়কতার প্রশংসা করলাম।

পাছে আমার উপস্থিতি শেখের শত্রুদেরকে একজন শিখ জেনারেলকে ঢাকায় রেখে দেওয়ার বদনাম দেওয়ার সুযোগ করে দেয়, তাই আমি তাঁর কাছে দিলি- ফেরার অনুমতি

চাইলাম। প্রথমে তাঁকে অনিচ্ছুক দেখা গেল। কিন্তু শেষটায় সম্মত হলেন এই শর্তে যে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা যখন যেমন আবশ্যক হবে তিনি সে অনুযায়ী তা করতে পারবেন।

আমার একটা চিঠির উত্তরে তিনি নিম্নরূপ চিঠি লিখেছিলেন:

আমার প্রিয় জেনারেল,

আপনার লেখা চিঠিটি পড়ে পরমানন্দ লাভ করা গেল। 'সো নাইস অব ইউ।' আসলে যিনি আমাদের হৃদয়ের এত প্রিয় ও এত কাছের তার কাছ থেকে কিছু শোনা অত্যন্ত মনোরম এবং ইন্টারেস্টিংও বটে। আমার স্বাস্থ্য ও সুখ নিয়ে আপনার ব্যক্তিগত উৎকণ্ঠা, আমার সন্তানদের জন্য আপনার ভালবাসা ও সপ্রশংস মনোভাব এবং সর্বোপরি আমাদের মুক্তির সংগ্রামে আপনার অবদান আমাদের সবার কাছে আপনাকে এমন প্রিয় করে তুলেছে যে আমরা আপনাকে কিছুতেই ভুলতে পারি না। তাড়াতাড়িই আপনাকে আবার এখানে দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি। আমার সন্তানরা শ্রদ্ধার সাথে সব সময় আপনার কথা স্মরণ করে। আপনি ও আপনার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমার এবং সেই সঙ্গে আমার স্ত্রীর হৃদয়ের উষ্ণতম শ্রদ্ধা পাঠানো হল।

সহৃদয় ভাবনাসহ,
আন্তরিকভাবে আপনার,
স্বা. (মুজিব)

এর পরে শিগগিরই আমি শেখের কাছ থেকে একটা 'কল' পেলাম। তিনি বললেন– "আমার ছেলে জামাল আমার বা তার মা -এর কথা শোনে না। একমাত্র আপনি তাকে গড়ে তুলতে পারেন কারণ আপনার জন্য তার রয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান। আমি তাকে আরও পড়াশুনার জন্য আপনার কাছে পাঠানোর প্রস্তাব করছি। তাকে যে কোনও প্রতিষ্ঠানে দিন কিন্তু তাকে আপনার বাড়িতে রাখুন এবং তার চরিত্র গড়ে তুলুন। আমি আশা করি এটা আপনার বা আপনার স্ত্রীর জন্য খুব বেশি অসুবিধাজনক হবে না।"

আমি বললাম– "জামাল অবশ্যই আসতে পারে। তাকে এখানে পাঠান এবং তার সম্বন্ধে সকল উদ্বেগ ঝেড়ে ফেলুন। সে একটা সাহসী ছেলে এবং সে জীবনে ভাল করবে। আমি মিলিটারি একাডেমিতে তার ভর্তির জন্য চেষ্টা করব। এবং তাকে বাংলাদেশ আর্মির একজন অফিসার হিশাবে আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।"

তিনি বললেন– "সেটা ভাল হবে।"

সংশি-ষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমি জানতে পারলাম যে কেবলমাত্র বিশেষ কতগুলি শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা থাকলেই জামালকে আইএমএ-তে ভর্তি করানো যেত।

আমলাতন্ত্র কোনও ব্যতিক্রম মানে না। আমি খুব হতাশ হলাম। এখানেই একজন ক্ষমতাবান নেতার কৃতজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ ছিল এবং আমি এমনই ক্ষুদ্র মনের যে আমি সুযোগটা গ্রহণ করতে পারছি না!

এমন সময় মার্শাল টিটো বাংলাদেশ সফর করলেন। আমার এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে আমাকে বাঁচালেন তিনি। সফর শেষে শেখকে তিনি বললেন জামালকে যুগোস্-াভ একাডেমিতে কমিশনিং -এর জন্য পাঠাতে। শেখ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলেন। জামাল যুগোস্-াভ একাডেমিতে যোগ দিল। যুগোস্-াভিয়ার পথে সে দিলি-তে আমার আশীর্বাদ নিতে এসেছিল। তখন অত্যন্ত আবেগপূর্ণ হয়ে পড়েছিল সে।

ভাষার সমস্যার কারণে তাকে যুগোস্-াভ একাডেমি ত্যাগ করতে হল। ব্রিটিশরা তাকে স্যান্ডহার্স্ট একাডেমিতে গ্রহণ করল। তারপর শিগগিরই সে বাংলাদেশ আর্মিতে কমিশনড অফিসার হিশাবে যোগদান করল।

হায়, এই সাহসী, নিরপরাধ ও সম্ভাবনাময় বালককে আততায়ীদের হাতে শেখ মুজিবসহ তার গোটা পরিবারের সঙ্গে প্রাণ দিতে হল।

বন্ধুদের বিদায়

বার্ধক্যের কারণে আমার বিদায়ের ঘণ্টা বেজে গেল ১৯৭৩ -এ ২ জানুয়ারিতে আমার অবসর গ্রহণ ধার্য হল। সেটা একটা বিষাদময় দিন। ৬২ বছর বয়সে আমি মানসিক ও শারীরিকভাবে সমর্থ ছিলাম। একটা ব্যতিক্রম হিশাবে এ বয়স পর্যন্ত আমাকে চাকরি করতে দেওয়া হয়েছিল। আমার পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ লোকদের অবসর গ্রহণের বয়স ছিল ৫৪।

সেই কঠিন মুহূর্তে ভারত সরকারের সর্বোচ্চ শক্তিশালী সচিবের একটা দল ছিল। তাঁরা বিপুলভাবে আমাদের ঐতিহাসিক বিজয়ে অবদান রেখেছিলেন। আমাদের বিদেশ সচিব শ্রী টিএন কাউল তার যোগ্যতা ও কুটনৈতিক ঋজুতায় অন্য যে কারও চেয়ে বেশি উজ্জ্বল ছিলেন। তাঁর লাইনে তিনি বিশ্বের যে কোনও স্থানের সর্বশ্রেষ্ঠগণের সমকক্ষ ছিলেন। কাউলের মতো জাতি-গঠনকারীগণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহে তাঁদের নিজ নিজ জাতির গৌরবে দীপ্তি বাড়িয়ে থাকেন। অতঃপর ছিলেন শ্রী পিএন ধর। আমি একে একে এই সব জমকালো মানুষগুলির কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম।

আমার সহকর্মীরা ও বন্ধুরা একটা বিদায়ি ভোজের আয়োজন করলেন। উচ্চতম কর্মকর্তাদের মধ্যে কয়েকজন যেমন মন্ত্রিপরিষদ সচিব শ্রী টিএন কাউল তাতে যোগ দিলেন। শ্রী আর এন কাও তাঁর চমৎকার ইংরেজিতে আমার চাকরি জীবনের অনেক

প্রশস্তি করলেন, আমাকে একজন জীবন্ত কিংবদন্তি বলে অভিহিত করলেন এবং বললেন যে সরকার অন্য কোনও রূপে আমার সেবা পেতে থাকবে। ঠিক তাই হল। সরকার আমাকে আমার অবসর গ্রহণের পর পরই মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের একজন উপদেষ্টা হিশাবে নিযুক্ত করল। আমি ঐ হিশাবে দুই বছর কাজ করলাম। তারপর আমার সহকর্মীদেরকে চূড়ান্ত বিদায় জানালাম।

আগে আমার সম্মানে এসএসবি -এর শ্রী বিবি সাভারওয়াল -এর লেখা একটি সুন্দর মর্মস্পর্শী কবিতা আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। আমার অবসর গ্রহণে আমার সহকর্মী ও স্টাফদের অনুভূতি একটা কবিতার মাধ্যমে জানতে পারা দারুণ একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল।

তারপর আমাকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুরোধ করেছিলাম।

তিনি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। আমার চাকরিজীবনে আমি যা কিছু করেছি সেসবের জন্য তিনি উচ্চ প্রশংসা করলেন। বিশেষত বাংলাদেশে আমার কাজের ব্যাপারে তিনি বললেন–"বাংলাদেশে আমাদের সকল সাফল্যের মেরুদণ্ড ছিলেন আপনি।" আমার চাকরির সমাপ্তিতে এসব কথার দ্বারা আমি নিজেকে ভাল রকম পুরস্কৃত বলে অনুভব করলাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসতে আসতে আমি তাঁর প্রতি মাথা নত করলাম। উত্তরে তিনিও মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে মাথা নিচু করলেন। এবং এর সঙ্গে আমার সামরিক চাকরির সম্পূর্ণ সমাপ্তি হয়ে গেল। ■

শেষ কথা

শেখ মুজিবের হত্যা বিশ্বকে শোকাভিভূত করল

আমি তখন আমেরিকাতে একটা ধর্মীয় শুভেচ্ছা মিশনে। সেখানে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে আমি জানতে পারলাম যে শেখ মুজিবকে তাঁর গোটা পরিবারসহ হত্যা করা হয়েছে যার মধ্যে আছে তাঁর দুই পুত্র কামাল ও জামাল ও তাঁদের স্ত্রীগণ, এবং আট বছরের পুত্র রাসেলও, যারা সকলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে লড়াই করেছে এবং গভীর দুঃখ-কষ্ট ভুগেছে। এ খবর আমাকে এমনভাবে মর্মাহত করল যে আমি সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ফিরে আসলাম।

এটা ছিল একটা অভ্যুত্থান। বাংলাদেশ আর্মির পাঁচজন বিপথগামী মেজর গুলি করে শেষ করে দিলেন শেখ মুজিবের গোটা পরিবারকে যারা আগে থেকে কিছু সন্দেহ করতে পারেনি। তাঁদের সমর্থন দিয়েছিলেন ট্যাংক ইউনিটের কমান্ডার; তিনি তাঁর ট্যাংকগুলি বের করেছিলেন কোনও গোলা ছাড়াই মিথ্যা ভয় দেখাতে। ট্যাংকগুলি প্রথমত বের করা হয়েছিল একটা আশঙ্কিত বিক্ষোভ প্রদর্শনকে দমন করার অজুহাতে, কিন্তু আসলে মুজিবের সমর্থকদের সন্ত্রস্ত করতে। গোলাশূন্য ট্যাংকের ফাঁকিটা কাজে দিয়েছিল।

প্রতিটা অভ্যুত্থানের পর একটা সমপ্রতিক্রিয়াধারা ঘটে থাকে। এই আর্মি ভাড়াটেদেরকে সিংহপুরুষ বানিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তিনি শিগগিরই নিজে স্থানচ্যুত হলেন। তাঁর মুজিবপন্থী উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। একটা স্বার্থপর সহিংস কাজের শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ইতিহাসে কখনও হয়নি।

মুজিব শুধুমাত্র একটা পচনশীল দেহ ছিলেন না। উপমহাদেশে চলি-শের বেশি বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতে দাঁড়ানো একটা চিন্তাধারার তিনি প্রতিনিধি ছিলেন। বাংলার মুসলিম লীগের এক শক্তিশালী নেতা ছিলেন তিনি। পরে তিনি এইচ এস সোহরাওয়ার্দির ও ফজলুল হকের সহকারী হলেন। তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার কোনও ভবিষ্যৎ নেই বলে পুরাপুরি অনুধাবন করে ধর্মনিরপেক্ষ পার্টিসমূহ গড়ে তুলেছিলেন।

মুজিবের এই চিন্তাধারা গণতন্ত্রকে দেখেছিলেন সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষাতার ভিত্তিতে। এসব ধারণা বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত হলেও তাঁর ভক্তরা এগুলিকে একযোগে নাম দিল মুজিববাদ এবং নামটা রয়ে গিয়েছে। এই চিন্তাধারার জন্যই বাংলাদেশের হাজার হাজার হিন্দু ও মুসলমান তাদের জীবনসহ সবকিছু বিসর্জন দিয়েছে। বাংলাদেশের এক কোটি হিন্দু ৭ কোটি মানুষের ইসলামি রাষ্ট্রে সুখী হতে পারে না। ঠিক তেমনি ভারতের সাড়ে ৬ কোটি মুসলমান অস্বস্তি বোধ করবে যদি ৬৫ কোটি হিন্দুর দেশ ভারত একটা

হিন্দুধর্মশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ধর্মের উচিত সম্পর্ক মজবুত করা এবং সবগুলি ধর্মের উচিত রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ প্রচার করা। আমরা এখন প্রায় একবিংশ শতাব্দিতে প্রবেশের পথে। দুর্ভাগ্যবশত সঠিক শিক্ষা এবং শিক্ষার বহুল বিস্তারের অভাবে এখনও কিছু ক্ষমতাশালী মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে সরল এবং ধর্মীয় ব্যাপারে আবেগপ্রবণ মানুষের আধিক্যের সুযোগ নিয়ে তাদের ওপর তথাকথিত ধর্মীয় সরকার কৌশলে বসিয়ে দেওয়া। কিন্তু তাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। মানুষ তাদের জন্য কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সে ব্যাপারে সচেতন হচ্ছে।

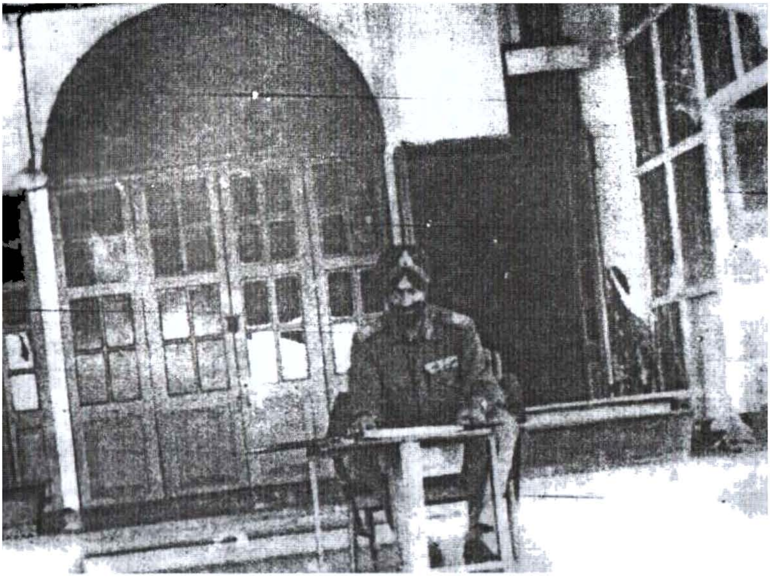
আমি একটা উন্নত বাংলাদেশের ছবি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। এর পরিশ্রমী এবং সমরূপ জনগণ, তার সাথে এর বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রতুলভাবে তার এই ভবিষ্যৎ দাবি করে। সেদিন বেশি দূরে নয় যখন উচ্চ সংস্কৃতিবান ও রাজনৈতিকভাবে পরিপক্ব বাংলাদেশের বুদ্ধিশালী সম্প্রদায় ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন ধারালো করে তুলবে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যরা তাদেরকে অনুসরণ করবে। মনশ্চক্ষে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শেখ মুজিব ও তার পরিবারের নিহত সদস্যদের কবরের জন্য ঢাকায় একটা প্রকাণ্ড মহিমান্বিত সমাধিসৌধ, তার প্রতি মানুষের ঠিক সেই সম্ভ্রম যেমন সভ্য দেশগুলিতে মহান নেতাদের ব্যাপারে দেখানো হয়।

মানবাধিকারের এই মহান যোদ্ধার কাজগুলির কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। বাংলাদেশ তার প্রতিষ্ঠাতা ও তার ইতিহাসের মহত্তম শহীদের প্রতি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা না দেখানো পর্যন্ত সে তার বিবিধ দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাবে না। সেজন্য বাংলাদেশকে তার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে ও তাঁকে যারা হত্যা করেছিল তাদেরকে শাস্তি দিতে হবে।

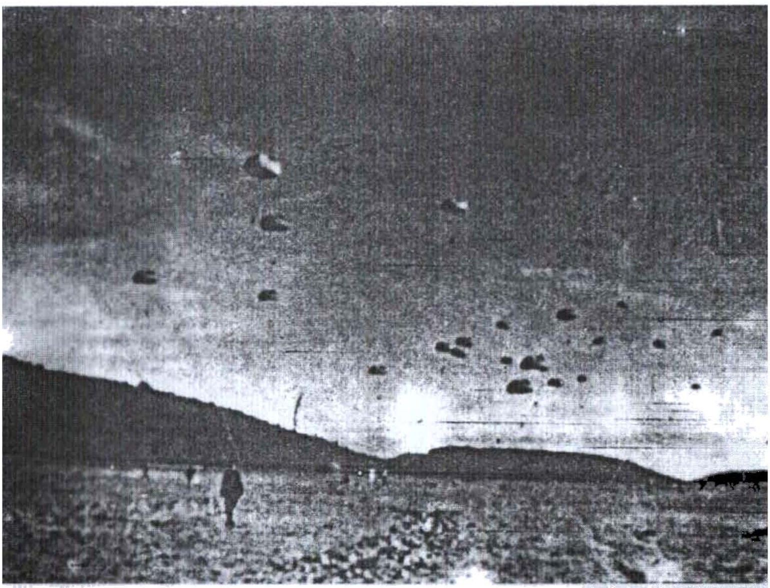
আমি যখন শেখ মুজিবের কাছে তার দুর্বল ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা তুলেছিলাম তখন তিনি কী জবাব দিয়েছিলেন তা আগেই উলে-খ করেছি। তিনি তাঁর দেশবাসীকে এত ভালবেসেছিলেন এবং তাদের স্বাধীনতার জন্য এত বিপুল আত্মত্যাগ করেছিলেন যে তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতেন না কোনও বাংলাদেশি তাঁর সম্বন্ধে ক্ষতিকর কিছু ভাবতে পারে, তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা তো দূরের কথা। তিনি খুব বেশি বিশ্বাস করার শাস্তি পেলেন কিন্তু তাঁর দেশ সেই ক্যারিশম্যাটিক নেতাকে হারাল যেমন নেতা ইতিহাস অনেকগুলি দশকে মাত্র একজন সৃষ্টি করে, সুতরাং দেশকে ফল ভুগতে হবে দীর্ঘকাল ধরে। শক্তিশালী প্রশাসকদের ও দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদদের অভাব না-ও হতে পারে যাঁরা হয়তো নতুন জাতিকে আবার পায়ের ওপর দাঁড় করানোর জন্য তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, কিন্তু মানুষ তাঁদের বিশ্বস্ত পারিবারিক চিকিৎসকের তিক্ততম বড়ি খেতেই প্রস্তুত থাকে, তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের

বহুল-প্রচারিত অষুধ নয়। মানুষ তাদের রাজনৈতিক নেতাদের মাথা ঘিরে একটা জ্যোতিশ্চক্র দেখতে পছন্দ করে। সে জ্যোতিশ্চক্র গড়ে তুলতে সাহায্য করে শুধুমাত্র ঐ নেতাদের আত্মত্যাগের পর আত্মত্যাগ -এর এক লম্বা ঘটনামালা।

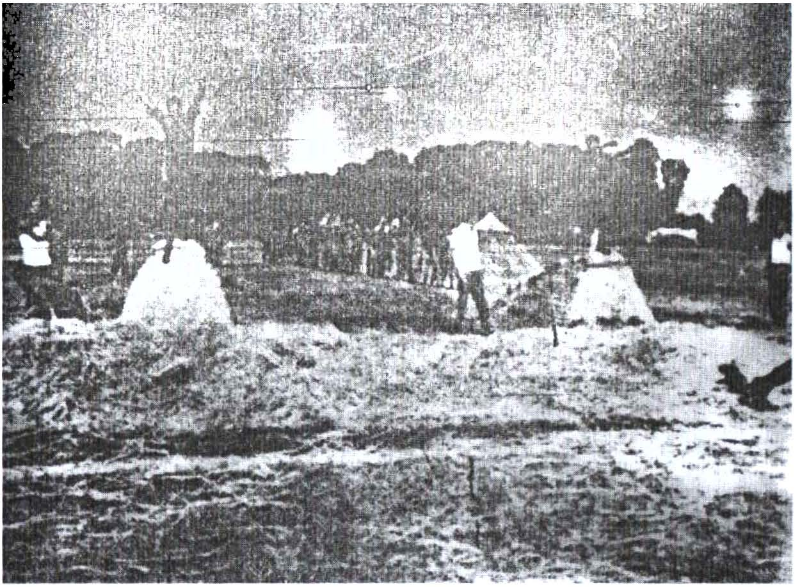
যারা এই নতুন জাতির প্রতিষ্ঠা ও স্থিতির জন্য এত কিছু করল সেই ভারতীয় নেতৃত্ব ও জনগণের এই বিয়োগাত্মক ঘটনায় নীরবে যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। ভারতের অবস্থায় থাকলে অন্য অনেক জাতিই হস্তক্ষেপ করাটা ন্যায়সংগত বলে মনে করত যেখানে পরিস্থিতিটা এমন যে মুষ্টিমেয় আততায়ী একটা গোটা জাতিকে জিম্মি করে ফেলেছিল। এটা ভুক্তভোগী প্রজন্মগুলির বলার কথা যে বন্ধু ও প্রতিবেশীদের দ্বারা এ ধরনের অ-প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি জাতির অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বিবেচিত হওয়া উচিত কি না। বিভিন্ন বিশ্ব ফোরামে সন্ত্রাসবাদ সম্মানের আসন এবং স্বীকৃতি অর্জন করছে। এটা আমাদের সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্য ভাল আভাস দেয় না। কিছু চরম ক্ষেত্রে একথা সংগত হতে পারে কিন্তু পাঠক স্বীকার করবেন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমন নয়। ■



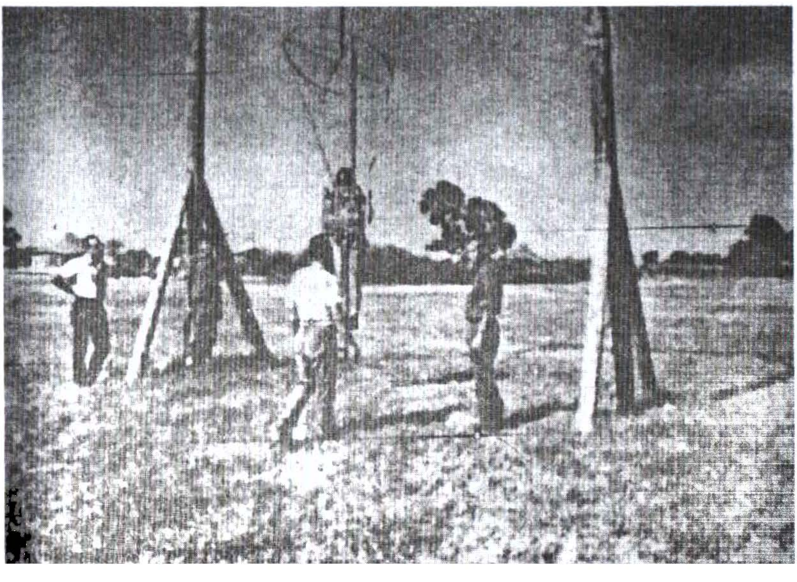
রাংগামাটি দখলে নেওয়ার পর লেখক কালেক্টরের (জেলা প্রশাসকের) বাসভবনের সামনে বসে।
ঐ সময় এ বাড়িটিই তাঁর অফিস হিশাবে ব্যবহৃত হত।



এসএফএফ সদস্যরা প্যারাশুট ঝাঁপের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

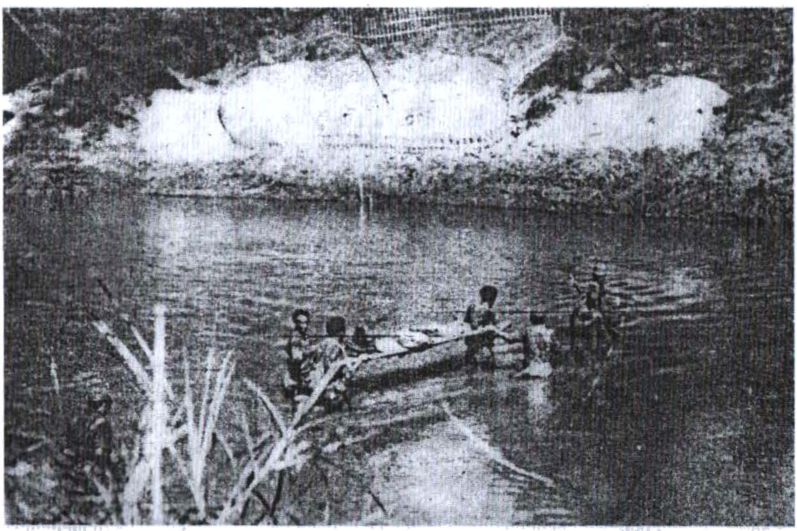


এসএফএফ সদস্যদের প্রশিক্ষণ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ভূমিতে অনুশীলনে
প্যারাট্রুপারদের ব্যবহারের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভাবিত কাঠামো।

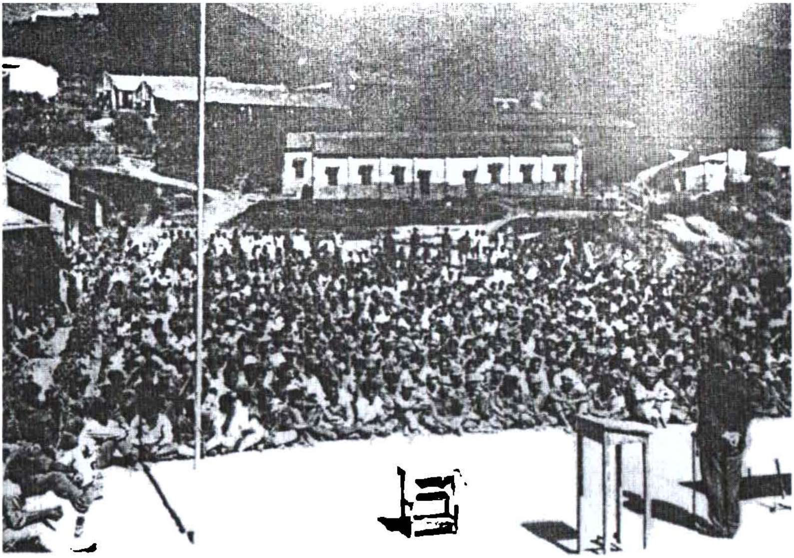




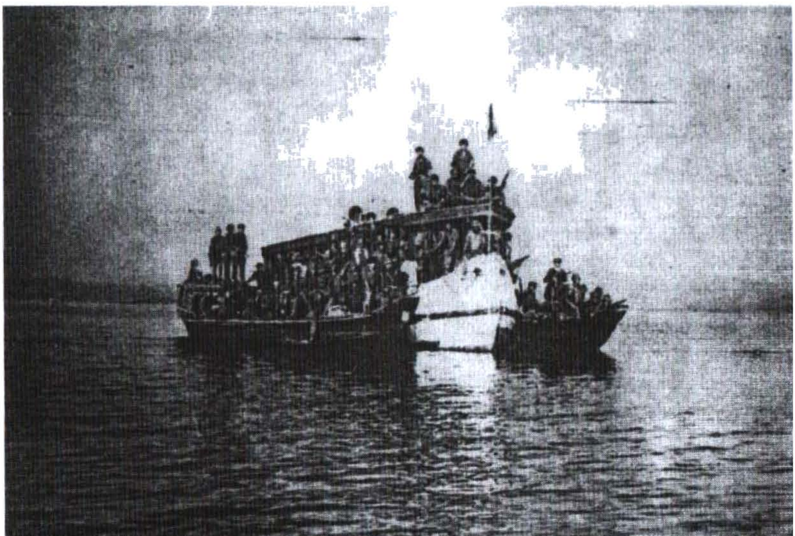
রাংগামাটি দখলে নেওয়ার পর লেখক স্থানীয় জনগণ দ্বারা বরিত হচ্ছেন।



স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স কর্তৃক হতাহতদের সরিয়ে নেওয়ার দৃশ্য।
ভূপ্রকৃতির কারণে এ কাজটি বেজায় কঠিন ছিল।



ভারতের কোনও এক স্থানে এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন লেখক।



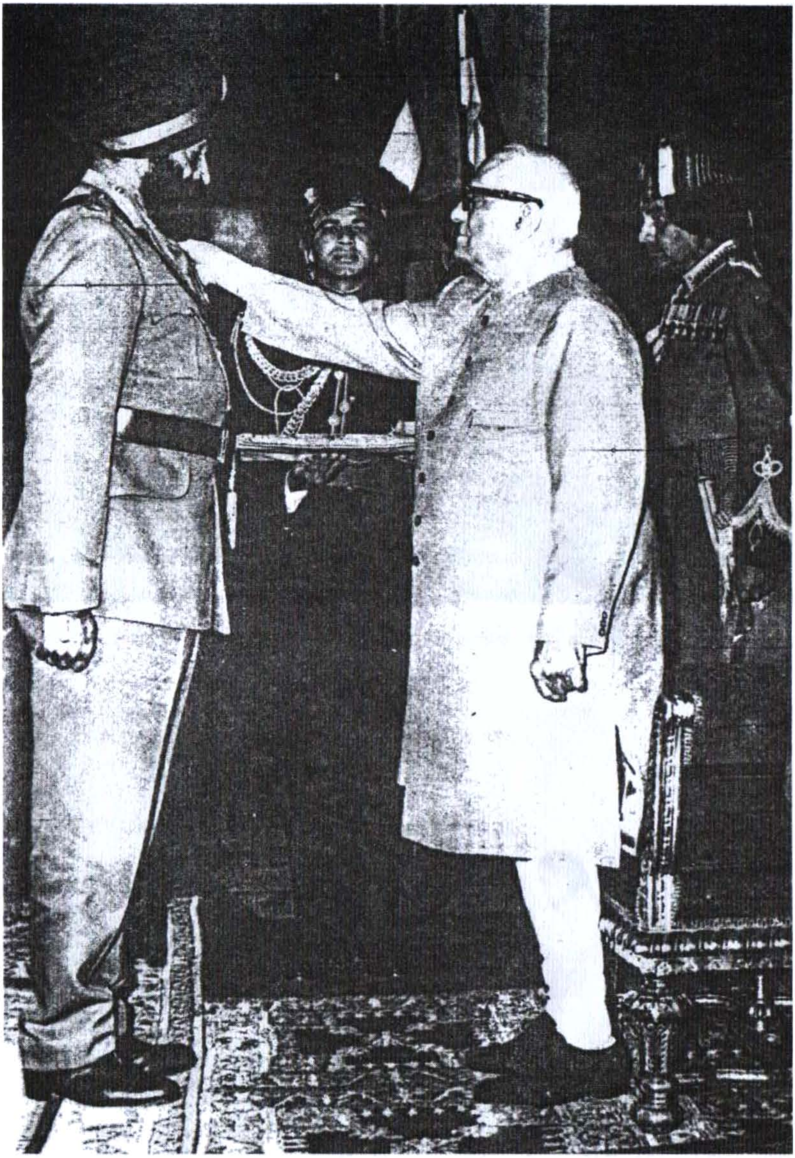
রাংগামাটি আক্রমণে ব্যবহৃত তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত এক ফ্লোটিলা।



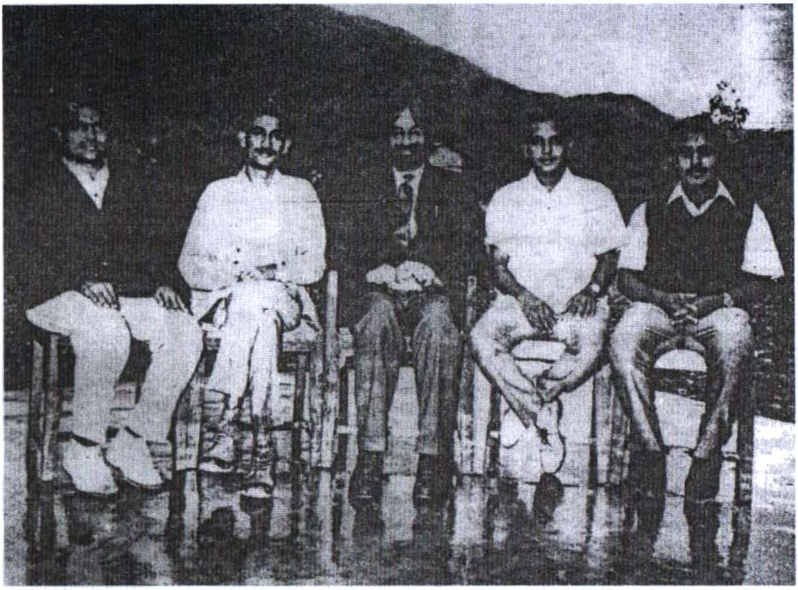
দুই আধ্যাত্মিক নেতা বাবা ওংকারনাথ এবং দালাই লামার সঙ্গে লেখক।



শেখ মুজিবের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বাসায় লেখক।



জেনারেল উবানকে 'পরম বিশিষ্ট সেবা' পদক প্রদান করছেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি।



গেরিলা যুদ্ধের চার নেতার সঙ্গে লেখক। বামদিক থেকে সিরাজুল আলম খান,
শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ এবং আব্দুর রাজ্জাক।



গেরিলা যুদ্ধের নেতাদের সাথে লেখক।



বাংলাদেশের মুক্তির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণাধীন 'ব্যাঘ্রশাবকদ্বয়'। বামে শেখ মুজিবের পুত্র জামাল এবং ডানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র আশরাফ।



দুই যুবনেতার সাথে লেখক।